সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

একডজন কর্নেল

৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র
৮ বি, কলেজ রো,
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল— ১৯৬১

মুদ্রণে
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০৭৩

কর্নেলের একডজন রহস্যভেদ

লেখকের অন্যান্য বই

হিকড়ি ডিকরি ডক রহস্য

কর্নেলের চার রহস্য

কর্নেলের আরো ২

অদ্বিতীয় কর্নেল

কর্নেলের ৫ রহস্য

আফগান হাউন্ড রহস্য

॥ এক ॥

এবার অক্টোবর মাসে কর্নেলের সঙ্গে ধরমপুর রিজার্ভ ফরেস্ট বেড়াতে গিয়েছিলাম। অবশ্য কর্নেলের উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ এক প্রজাতির অর্কিড সংগ্রহ। দিন তিনেক পরে কি হল কে জানে, কর্নেল বললেন,—অর্কিডের যে খবর আমার এক বন্ধুর কাছে পেয়েছিলাম, সম্ভবত তা ঠিক নয়। কারণ এ বনাঞ্চলে আদৌ দুর্লভ কোনও প্রজাতির অর্কিড গজায় কিনা সন্দেহ।

আমি বললাম,—এমনও হতে পারে, অর্কিডের বদলে আপনি এখানে কোনও রহস্যের দেখা পেয়ে গেলেন!

কর্নেল তাঁর প্রখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন,—জয়ন্ত, অনেক রহস্যের পেছনেই এতদিন ধরে ছোটাছুটি করেছি, কাজেই রহস্য আমাকে আর তত টানে না। অবশ্য দৈবাৎ যদি কিছু পেয়ে যাই অর্কিড খুঁজে না পাওয়ার দুঃখটা ঘুচে যাবে।

—তাহলে আর এখানে থাকতে চাইছেন না?

—ঠিক তাই। কাল সকালে আমরা বেরিয়ে পড়ব। বরং রাজগড়ের ওদিকে পাহাড়ি জঙ্গলে দু-একটা বিরল প্রজাতির অর্কিড পেলেও পেতে পারি। কারণ রাজগড় ছোটনাগপুর পর্বতমালার খুব কাছাকাছি।

আমরা যখন এইসব কথা আলোচনা করছিলাম, তখন বিকেল। বাংলোর চৌকিদার রামভগত আমাদের জন্য সবে কফি এনে দিয়েছে। বনবাংলোটা একটা টিলা পাহাড়ের গায়ে। চারদিকে অন্তত ছফুট উঁচু পাঁচিল। তার ওপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল দুজন তাগড়াই চেহারার ভদ্রলোক নিচের রাস্তা থেকে বাংলার গেটের দিকে উঠে আসছেন।

চৌকিদার রামভগত তাঁদের দেখামাত্র হনহন করে এগিয়ে গিয়ে সেলাম ঠুকল। তার মানে, ওঁরা তার পরিচিত। আস্তে বললাম,—কর্নেল, কাল চৌকিদার বলছিল, ধরমপুর ফরেস্টে দেখার মতো কিছু নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে তবুও এখানে মানুষ আসে। কী দেখতে আসে কে জানে!

কর্নেল বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে সবে কফি শেষ করেছেন, চুরুট ধরিয়ে আমেজে টানছেন। আমার কথায় তিনি চোখ খুলে আগন্তুকদের একবার দেখে নিলেন মাত্র। কোনও মন্তব্য করলেন না।

আগন্তুকদের একজন বয়েসে প্রৌঢ়, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, হাতে একটা পুরু ব্যাগ। অন্যজন বয়েসে তাঁর চেয়ে একটু ছোট। কারণ তার গোঁফ এবং চুল দুটোই কুচকুচে কালো। তাঁর হাতে একটা সুটকেস। রামভগত দুজনের হাত থেকে ব্যাগ এবং সুটকেসটা নিয়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে এল। তারপর বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে উত্তরপ্রান্তের শেষ ঘরটার তালা খুলল।

বাংলোয় তিনটে ঘর। আমরা আছি দক্ষিণ প্রান্তের ঘরে।

আগন্তুক দুজনেই আমাদের দিকে কেমন দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে রামভগতকে

অনুসরণ করছিলেন। কেন কে জানে তাঁদের দৃষ্টিটা আমার কাছে অস্বস্তিকর মনে হল। কর্নেলের দিকে তাকালাম। তিনি তেমনি চোখ বুজে চুরুট টানছেন।

এরপর স্বভাবতই রামভগত তার নতুন অতিথিদের সেবায় কিছুক্ষণের জন্য ব্যস্ত হয়ে রইল। তারপর যখন সে আমাদের টেবিল থেকে কফির ট্রে নিতে এল তখন তাকে চুপি-চুপি জিগ্যেস করলাম,—ওঁরা তোমার চেনা নাকি?

রামভগত আস্তে বলল,—হ্যাঁ স্যার। ওই যে বড়াসাব আছেন, তাঁর নাম বিক্রমজিৎ সিনহা, আর ছোটাসাবের নাম রাকেশ শর্মা। ওঁরা থাকেন রামপুর টাউনে।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ল, আমরা তো রামপুর রেলস্টেশন হয়েই এসেছি। স্টেশনে রেঞ্জার সুরজিৎ নায়েকের জিপ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি জিগ্যেস করলাম,—ওঁরা দুজন পায়ে হেঁটে এতদূর আসতে পারলেন?

রামভগত একটু হেসে বলল,—এখান থেকে সামান্য দূরে একটা আদিবাসী বসতি আছে। যেখানে সিনহা সাব আর শর্মা সাবের একটা রেস্ট হাউস আছে। রেস্ট হাউসে গাড়ি রেখে ওঁরা পায়ে হেঁটেই চলে আসেন।

—আচ্ছা রামভগত, তুমি তো বলছিলে ধরমপুর ফরেস্টে দেখার মতো কিছু নেই। তা রেস্ট হাউস থেকে ওঁরা এই বাংলোয় কেন আসেন?

আমার চোখ এড়াল না, রামভগতের মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। সে এবার আরও আস্তে বলল,—আমি স্যার, গরিব লোক। বড়লোকরা কী খেয়ালে এখানে ঘুরতে আসেন, আমি বুঝি না।

—এই জঙ্গলে তো হাতি, ভালুক বা বাঘও আছে শুনেছি। কিন্তু ওঁরা সঙ্গে বন্দুক আনেন না?

কখনও-সখনও আনেন। —বলে রামভগত বাংলোর উত্তরদিকে তার ডেরায় চলে গেল। সেখানে তার বউ মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিল। এই মেয়েটিকে আজ তিন দিন ধরে দেখে মনে হয়েছিল, সে বোবা কালা। কিন্তু শেষ বিকেলের আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখলাম ভ্রূ কুঁচকে স্বামীকে কিছু বলল। তার উত্তরে রামভগত যেন তাকে ধমক দিল।

এই কথাটা কর্নেলকে বললাম। কর্নেল চোখ না খুলেই বললেন,—তুমি আমি দুজনেই অবিবাহিত। কাজেই রামভগত আর তার বৌ-এর মধ্যে কী নিয়ে কথা হল তা আমরা বুঝব না।

বললাম,—আমার মনে হল মেয়েটি কোনও কারণে হঠাৎ একটু চটে গেছে। নতুন অতিথিরা কি তার অবাঞ্ছিত লোক?

কর্নেল চোখ খুলে একটু হেসে বললেন,—বাঃ, বাঃ! এই তো তুমি রহস্যের লেজ দেখতে পেয়েছ।

তখনও সন্ধ্যা নামতে কিছু দেরি আছে। চারদিকের গাছপালা থেকে পাখিদের তুমুল কলরব শোনা যাচ্ছে। কর্নেলের কথা শুনে আমি বললাম,—কে জানে কেন, ওই লোকদুটোকে দেখে আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।

কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না। ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন,—বরং এক কাজ করা যাক। নদীর ব্রিজ অবধি একটু ঘুরে আসি চলো।

বলে তিনি আমাদের ঘরের দরজায় তালা এঁটে দিলেন। দুজনে লনের সুদৃশ্য ফুলবাগিচা পেরিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম রামভগতের কোয়ার্টারের বারান্দায় বাংলোর মালি নবচন্দ্র রামভগতের বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

গেট খুলে আমরা ঢালু পথে নেমে নিচের রাস্তায় পৌঁছুলাম। রাস্তাটা বেজায় এবড়ো-খেবড়ো। দুধারে ঝোপঝাড় আর কদাচিৎ কয়েকটা উঁচু গাছ। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর আমরা নদীটার দেখা পেলাম। নদীটার নাম ধারিয়া।

এর উপর যে ব্রিজটা আছে তা সঙ্কীর্ণ। সম্ভবত ব্রিটিশ আমলে তৈরি। নদী এখন পুরোটাই ঘোলাটে জলে ভরা এবং স্রোতও খুব তীব্র। জলের ভেতর পাথর থাকায় নদীটা বড্ড বেশি গর্জন করছে যেন। কর্নেল ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে চারদিকটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। আমি ব্রিজের রেলিংয়ে ঝুঁকে স্রোতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

একটু পরে যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকে নদীতীরের ঝোপঝাড়ের ভিতর একটা লম্বা লাল জিভ বের করা কালো কুকুরের মাথা কয়েকমুহূর্তের জন্য চোখে পড়ল। উত্তেজিত ভাবে ডাকলাম,—কর্নেল, কর্নেল, ওটা কী কুকুর?

কর্নেল ঘুরে দাঁড়াতেই কুকুরটা ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্নেল বললেন,—কোথায় কুকুর?

—ওই ঝোপটার ভেতর মুখ বের করেছিল। লাল জিভ। যেটুকু দেখেছি, তাতে আমার ধারণা ওটা একটা অ্যালসেশিয়ান।

কর্নেল সেইদিকে বাইনোকুলার তাক করে খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন,—তোমার দেখার ভুল হয়নি তো?

—না। আমি স্পষ্ট দেখেছি কুকুরটা হিংস্র চোখে যেন আমাদেরই দেখছিল।

এবার কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! গতকাল আমরা যখন এই নদীর জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আমিও কয়েক সেকেন্ডের জন্য এমনি একটা কুকুরের মুখ দেখেছিলাম। কথাটা তোমাকে বলিনি, কারণ তাহলে তুমি ভয় পেতে।

আমি একটু চটে গিয়ে বললাম,—অদ্ভুত কথা বলছেন তো! আমি ভয় পাব বলে এমন একটা কথা বলবেন না আপনি?

কর্নেল একটু আমতা-আমতা করে বললেন,—না, আসলে আমি ভেবেছিলাম আদিবাসীরা অনেকে শিকারি কুকুর পোষে। সেইসব শিকারি কুকুরকে বলা হয় আফগান হাউন্ড। কারণ এইজাতের কুকুর শেরশাহের আমলেই এদেশে আনা হয়েছিল। আর শেরশাহ ছিলেন একজন আফগান।

আদিবাসীদের শিকারি কুকুর হোক আর যাই হোক, আমার মনে আবার একটা অস্বস্তি জেগে উঠল। বললাম,—চলুন, বরং সন্ধ্যার আগেই বাংলোয় ফেরা যাক।

কর্নেল কোনও কথা বললেন না কিন্তু। আমাকে অনুসরণ করলেন। লক্ষ করলাম, তাঁর মুখে এখন গাম্ভীর্যের ছাপ পড়েছে।

এবার দুজনে একটু দ্রুত হাঁটছিলাম। বাংলোর নিচে পৌঁছে হঠাৎ কর্নেল হেসে উঠলেন।

জিগ্যেস করলাম,—কী ব্যাপার! হঠাৎ হাসছেন যে?

—যাই বলো জয়ন্ত, একটা কুকুরের জন্যে ধারিয়া নদীর ব্রিজে দাঁড়িয়ে আমাদের চাঁদ ওঠা এবং জ্যোৎস্না দেখা হল না। কাল সন্ধ্যাতেই তো আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না উপভোগ করেছি। জ্যোৎস্নায় পাহাড়ি নদীর স্রোত কী সুন্দর দেখায়। সেই সৌন্দর্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করল একটা তুচ্ছ কুকুর!

—কুকুরটার মুখ দেখে আমার কিছু তুচ্ছ মনে হয়নি। সাংঘাতিক হিংস্র মুখ।

কথা বলতে-বলতে বাংলোর লনে পৌঁছে দেখি, নতুন অতিথিরা বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে বসে কথা বলছেন। আমরা গিয়ে বারান্দায় উঠতেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এলেন। বললেন,—রামভগতের কাছে শুনলাম, আপনারা নাকি কলকাতা থেকে এসেছেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আপনারা?

—আমরা থাকি রামপুর টাউনে। ধরমপুর আদিবাসী বসতিতে আমাদের একটা রেস্ট হাউস আছে। সেখানে মাঝে-মাঝে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাই। তারপর যদি হঠাৎ খেয়াল হয় তো চলে আসি এই বনবাংলোতে। এখান থেকে ধারিয়া নদী খুব কাছেই। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। বিশেষ করে এই অক্টোবরে আমরা আসি ছিপ ফেলে মাছ ধরতে।

আমি বলে ফেললাম,—আপনাদের সঙ্গে তো কোনও ছিপ দেখলাম না।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন,—ছিপ রামভগতের ঘরে আছে। তারও ছিপ ফেলে মাছ ধরার খুব নেশা। যাই হোক—

বলে তিনি কর্নেলের দিকে ঘুরলেন,—রামভগতের কাছে শুনলাম, আপনি নাকি একজন কর্নেল সাহেব?

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর একটা নেম কার্ড বের করে ভদ্রলোককে দিলেন। তিনি সেটা দেখার পর জিগ্যেস করলেন,—এখানে নেচারোলজিস্ট লেখা আছে। এটা কী?

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—আসলে আমি দুর্লভ প্রজাতির পাখি প্রজাপতি অর্কিড ক্যাকটাস ইত্যাদির খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। এখানে এসেছিলাম বিশেষ একজাতের অর্কিডের খোঁজে। দুঃখের বিষয় আজ দুপুর অবধি তা খুঁজে পাইনি।

ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীকে ডাকলেন,—রাকেশ, এখানে এসো। আলাপ করিয়ে দিই। উনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, তোমার মতো এই কর্নেল সাহেবেরও অর্কিডের নেশা আছে।

কর্নেল বললেন,— এখনও আপনাদের নাম জানতে পারিনি।

—দুঃখিত! আগেই আমাদের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। আমার নাম বিক্রমজিৎ সিনহা, আর এ হল আমার ব্যবসার পার্টনার রাকেশ শর্মা।

কর্নেল বললেন,—আমার পরিচয় তো পেয়েছেন। আমার এই তরুণ বন্ধুর নাম, জয়ন্ত চৌধুরি। পশ্চিমবঙ্গের বহুল প্রচারিত দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার একজন সাংবাদিক।

মিস্টার সিনহা বললেন,—আসুন, আমাদের ঘরের সামনে বসে একটু আড্ডা দেওয়া যাক। বুঝতেই পারছেন, ব্যবসা নিয়ে জীবনটা বড্ড একঘেয়ে লাগে। রাকেশের তো আপনার মতো কিছু-কিছু হবি আছে, আমার হবি বলতে শুধু ফিশিং।

মিস্টার সিনহার আদেশে রামভগত আরও দুটো চেয়ার ওঁদের ঘরের সামনে বারান্দায় নিয়ে এল।

ওঁদের এই ব্যবহারে আমার অস্বস্তিটা কেটে গেল। লোকদুটোকে কেন যে ভিলেন-মার্কা ভেবেছিলাম কে জানে।

কর্নেল বললেন,—মিঃ শর্মা আপনি এই জঙ্গলে কি কোনও বিরল প্রজাতির অর্কিডের খোঁজ পেয়েছেন?

রাকেশ শর্মা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন,—অর্কিড! হিমালয় ছাড়া আর কোথাও দেখার মতো অর্কিড আছে নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—হিমালয়, সে তো বিশাল ব্যাপার। একজন মানুষের পক্ষে হিমালয় পর্বতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতে হয়তো জীবন ফুরিয়ে যাবে।

—কেন? সোজা গ্যাংটকে গিয়ে আশেপাশে ঘোরাফেরা করলেই তো কত সব আশ্চর্য অর্কিড!

—আপনি সিকিমে প্রায়ই যান, তাই না?

—তা যাই। কারণ আমাদের ব্যবসার কাজে সেখানে যেতে হয়।

—আপনাদের ব্যবসা কীসের?

মিস্টার সিনহা বলে উঠলেন,—লাক্ষা। আমরা লাক্ষার কারবার করি। ধরমপুরের পশ্চিম এলাকায় বুনো ফুলের বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে। সেখান থেকে আদিবাসীরা লাক্ষা সংগ্রহ করে আমাদের বিক্রি করে। রামপুরে সরকার একটা ল্যাক রিসার্চ সেন্টার খুলেছেন। এতে আমাদের খুব সুবিধা হয়েছে।

কর্নেল বললেন,—আপনারা কদিন থাকছেন?

—দু-তিনটে দিন থাকব। এখন ধারিয়া নদীতে খুব মাছ হয়। আপনারা আর কদিন আছেন?

আমাকে অবাক করে কর্নেল বললেন,—আছি। যতদিন না আমি সেই বিশেষ প্রজাতির অর্কিড খুঁজে পাচ্ছি।

রাকেশ শর্মা কথার ওপর বললেন,—বৃথা চেষ্টা। আর তাছাড়া শুনে এলাম

কী একটা ভয়ংকর কুকুর জাতীয় প্রাণী এই জঙ্গলে এসে জুটেছে। ধরমপুর আদিবাসী বস্তির তিন-তিনটে লোককে সেই জন্তুটা তুলে নিয়ে গেছে। পরে তাদের হাড়গোড় ওরা খুঁজে পায়।

আমি সেই কুকুরটার কথা বলতে সবে ঠোঁট ফাঁক করেছিলাম, কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—আপনারা তাহলে কোন্ সাহসে এখানে নদীতে মাছ ধরতে এসেছেন?

লক্ষ করলাম মিস্টার সিনহা তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। তিনিই বললেন,—কর্নেল সাহেব, আমরা এখানে নিরস্ত্র হয়ে আসিনি। আপনারা কি সঙ্গে অস্ত্র-টস্ত্র এনেছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আমরাও অবশ্য নিরস্ত্র হয়ে জঙ্গলে আসিনি।

—রাইফেল এনেছেন নাকি?

—নাঃ! পিস্তল-টিস্তল আছে।

রাকেশ শর্মা বাঁকা হেসে বললেন,—যদি সেই হিংস্র জন্তুটা আক্রমণ করে তাহলে পিস্তল দিয়ে আত্মরক্ষা করা যাবে না।

মিস্টার সিনহা বললেন,—এসব কথা থাক। রামভগতকে চা আনতে বলি।

কর্নেল বললেন,—ধন্যবাদ। আপনারা চা খান, আমরা কিছুক্ষণ আগে কফি খেয়েছি।

মিস্টার সিনহা ডাকলেন,—রামভগত, এখানে এসো।

ততক্ষণে সন্ধ্যার ধূসরতা মুছে গিয়ে হালকা জ্যোৎস্নার ছটা দেখা দিয়েছে। চারদিকে গাছপালার আলোছায়াই আজ আমার চোখে পড়ছে। সেই সঙ্গে ভেসে উঠছে লকলকে লাল জিভ বের করা একটা কালো কুকুরের মুখ এবং সাদা হিংস্র দাঁত।

কর্নেল বললেন,—নমস্কার মিস্টার সিনহা। নমস্কার মিস্টার শর্মা। আমরা এবার উঠি।

মিস্টার সিনহা রামভগতকে চায়ের হুকুম দিচ্ছিলেন। রাকেশ শর্মা প্রতি-নমস্কার করে চাপা স্বরে বললেন,—কর্নেল সাহেব, একটু সাবধানে থাকবেন।

নিশ্চয়ই থাকব। —বলে কর্নেল আমাদের ঘরে সামনে এসে চাপাস্বরে বললেন : জয়ন্ত তোমার অস্বস্তিটা দেখছি ঠিকই ছিল।

এই বনবাংলোয় বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। আমরা চেয়ারে বসার পর রামভগতের বদলে আজ সন্ধ্যায় তার বউ একটা হ্যারিকেন এনে টেবিলে রাখল। তার মাথায় ঘোমটা ছিল। কর্নেল খুব চাপাস্বরে তাকে দেহাতি হিন্দিতে জিগ্যেস করলেন,—তোমার নাম কী?

সে বলল,—সুশীলা।

—ওই সাহেব দুজন প্রায়ই এখানে আসেন—তাই না?

সুশীলা ফিসফিস করে বলল,—হুজুর, ওরা লোক ভালো নয়।

কথাটা বলেই সে হনহন করে চলে গেল।

রাত নটার সময়েই রামভগত আমাদের খাবার দিয়ে গিয়েছিল। খাওয়ার পর হ্যারিকেনের আলোয় কর্নেল একটা বই পড়ছিলেন। তিনদিকের তিনটে জানলাই খুলে দিয়েছিলাম। পর্দাও সরিয়ে দিয়েছিলাম। দক্ষিণের ঘর বলে এই ঘরটা মোটামুটি আরামদায়ক। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে জ্যোৎস্না ঢুকেছে। কর্নেলের নাক ডাকছে। কেন ঘুম ভাঙল ভাবছি, হঠাৎ আমাদের পাশের ঘরটায় ঝনঝন শব্দ করে কে যেন থালাবাসন ছুঁড়ে ফেলল। তারপরই ক্রমাগত কাঁচ ভাঙার শব্দ। সেইসঙ্গে অদ্ভুত জান্তব গর্‌র-গর্‌র গর্জন। ব্যস্তভাবে ডাকলাম,—কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের নাক ডাকা থেমে গেল। জড়ানো গলায় বললেন,—কী হয়েছে?

বললাম,—শুনতে পাচ্ছেন না, পাশের ঘরে কী হচ্ছে?

কর্নেল নির্লিপ্তভাবে বললেন,—ও কিছু না। চুপচাপ শুয়ে থাকো।

কর্নেলের কথায় খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ততক্ষণে সব শব্দ থেমে গেছে। শুধু জ্যোৎস্নামাখা গাছপালা আর বাতাসের এলোমেলো শব্দ। আমার লাইসেন্সড রিভলবারটা বালিশের পাশেই ছিল। এসময় জানলায় কোনও মুখ দেখলে নিশ্চয়ই তাকে গুলি করতাম।

॥ দুই ॥

ঘুম ভেঙে দেখি কর্নেল যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। অন্যদিনের মতো কপাটে কেউ টোকা দিচ্ছিল। উঠে বসে বললাম,—রামভগত নাকি?

রামভগত ভেজানো দরজার কপাট ঠেলে বেড-টি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বললাম,—আচ্ছা রামভগত, তোমার ওই গেস্ট দুজন কি মদ খান?

রামভগত বলল,—না স্যার।

—তাহলে কাল রাতে কারা পাশের ঘরে জিনিসপত্র ভাঙচুর করছিল? তাছাড়া কুকুরের ডাকও শুনেছি। ব্যাপারটা কী?

রামভগত নিজের কপালে থাপ্পড় মেরে ভয়ার্ত মুখে বলল,—মাপ করবেন স্যার, আমারই বলা উচিত ছিল। কোনও-কোনও রাতে পাশের ঘরে ওইরকম আজগুবি সব আওয়াজ শোনা যায়।

—বলো কী?

—হ্যাঁ স্যার। ওই ঘরে পুরনো আসবাবপত্র আর নানারকম জিনিস আছে। আমার আপনাদের বলে দেওয়া উচিত ছিল।

—তাহলে তুমি বলতে চাও ওঘরে ভূত আছে? কোনও-কোনও রাতে তারা হানা দেয়?

—হ্যাঁ স্যার। সিনহা সাব আর শর্মা সাব বছরে অনেকবার করে এখানে আসেন তো, তাই তাঁরা ও নিয়ে মাথা ঘামান না। তা স্যার, আজ সকালেই তো আপনাদের চলে যাওয়ার কথা ছিল। কর্নেল সাহেব বলেছিলেন সকালেই রেঞ্জার সাহেবের জিপ গাড়ি আসবে আপনাদের নিতে।

—হ্যাঁ তাই কথা ছিল। তবে কর্নেল সাহেব বলেছেন আরও দু-চার দিন থাকতেও পারেন। এ জঙ্গল তাঁর খুব ভালো লেগেছে।

আপনাদের ইচ্ছা স্যার। —বলে সে চলে গেল।

কর্নেল ফিরে এলেন, তখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। অভ্যাসমতো কর্নেল টুপি খুলে সম্ভাষণ করলেন,—মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

বললাম,—মাঝখানের ঘরটায় ভূতেরা যা উপদ্রব করল, তাতে সুনিদ্রা আশা করা যায় না।

কর্নেল হাসতে-হাসতে পিঠের কিটব্যাগ খুলে টেবিলে রাখলেন। গলা থেকে ঝুলন্ত বাইনোকুলার ও ক্যামেরাও খুলে রাখলেন। রামভগত তাঁকে ফিরতে দেখেছিল। ট্রেতে কফি এবং স্ন্যাক্স নিয়ে এল। কর্নেল বললেন,—রামভগত, রেঞ্জার সাহেব জিপ পাঠিয়েছিলেন কথামতো। পথে আমার সঙ্গে ড্রাইভার ইসমাইলের দেখা হয়েছে। তাকে বলে দিয়েছি, আমরা এখনও দু-তিনটে দিন হয়তো থাকব। কবে ফিরব সে খবর যথাসময়েই তোমার সাহেবকে জানিয়ে দেব।

রামভগত সেলাম ঠুকে চলে গেল। আমি জিগ্যেস করলাম,—আপনি তো নদীর দিক থেকেই এলেন। লাক্ষা ব্যবসায়ীদের নদীতে ছিপ ফেলে বসে থাকতে দেখেছেন নিশ্চয়ই?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ দেখেছি। তবে বাইনোকুলারে, দূর থেকে। ওঁরা দুজনে ধারিয়া জলপ্রপাতের নিচে যে জলাশয় আছে, সেখানে ছিপ ফেলে বসে আছেন।

বললাম,—কাল রাতের ঘটনাটা রামভগত ভুতুড়ে উপদ্রব বলে ব্যাখ্যা করল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—এই ভুতুড়ে উৎপাতের কথা আমাকে রেঞ্জারসাহেব বলেছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম,—কী আশ্চর্য! কথাটা আপনি আমাকে বলেননি?

—বলিনি। তার কারণ আমার সঙ্গে তুমি এতকাল ঘুরছ, তোমার কতখানি সাহস বেড়েছে তা মেপে নিতে চেয়েছিলাম।

হাসতে-হাসতে বললাম,—তা সাহস কিছুটা বেড়েছে বইকি! না বাড়লে জানলাগুলো বন্ধ করে দিতাম। আপনি কতদূর ঘুরলেন?

—হরপার্বতীর সেই মন্দিরে আজ উঠতে পেরেছি। চিন্তা করো জয়ন্ত। এই বুড়ো বয়েসে প্রায় তিনশ ফুট পর্বতারোহণ কম কথা নয়!

—ওখানে কেন উঠেছিলেন? মন্দির তো নেই, ভেঙে গেছে।

—হ্যাঁ। মন্দির নেই, হরপার্বতীও নেই, কিন্তু ওখানে একটা ছোট গুহা আবিষ্কার

করেছি। তুমি শুনলে অবাক হবে, গুহাতে কোনও মানুষ বাস করে। যদিও তার দেখা পাইনি। একটা ভাঁজ করা ক্যাম্বিসের খাটিয়া আছে। তার মানে কেউ ওখানে শুয়ে রাত কাটায়। অনেকগুলো সিগারেটের ফিলটার টিপ পড়ে থাকতে দেখেছি। তাহলে বোঝো সে যেই হোক, প্রচুর সিগারেট খায়।

—ফিলটার টিপ সিগারেট যে খায়, নিশ্চয়ই তার পয়সাকড়ি ভালোই আছে। কিন্তু সে ওখানে কী করে তা কি টের পেয়েছেন?

কর্নেল থামলেন,—আর যাই করুক, তপস্যা করে না।

—অদ্ভুত লোক তো! কর্নেল, নিশ্চয়ই লোকটার কোনও অভিসন্ধি আছে। নাহলে অমন জায়গায় কেন সে রাত কাটাবে?

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন। এক রাশ ধোঁয়ার সঙ্গে বললেন,—জয়ন্ত, তুমি কাল বলছিলে, আমি যেখানেই যাই রহস্য খুঁজে পাই। কিন্তু সমস্যা কী জানো? বরাবর দেখে আসছি রহস্যের আড়াল থেকে কোনও চিরন্তন খুনি আমার সামনে একটা করে রক্তাক্ত মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

চমকে উঠে বললাম,—কী সর্বনাশ! ওই অলুক্ষুণে কথা আর বলবেন না কর্নেল। এই বনবাদাড়ে ওইসব লাশ-টাশ নিয়ে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। ধরুন এমনও তো হতে পারে, যে কুকুরটাকে আপনি আফগান হাউন্ড বলেছেন, তার আক্রমণে কেউ রক্তাক্ত লাশ হয়ে গেল। তখন কি আপনি কুকুরটাকে মারতে এই বিশাল জঙ্গল এলাকায় ছোটাছুটি করে বেড়াবেন?

কর্নেল আমার কথার উত্তর দিলেন না। চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে রামভগত কফির ট্রে নিতে এল। সে বলল,—ব্রেকফাস্ট কি নটায় খাবেন স্যার?

কর্নেল শুধু বললেন,—হ্যাঁ।

ব্রেকফাস্টের পর কর্নেলের সঙ্গী হতে হল আমাকে। নিচের পিচ রাস্তায় অবশ্য গাছপালার গাঢ় ছায়া পড়েছে। আমরা নদীর ব্রিজের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে এবার দুধারে ঘন জঙ্গল। কোথাও-কোথাও নিবিড় ঝোপঝাড়। শরৎকালের জঙ্গলে এটা স্বাভাবিক। কিছুটা চলার পর জিগ্যেস করলাম,—আজও কি আপনার লক্ষ্য সেই বিরল প্রজাতির অর্কিড?

কর্নেল বললেন,—দৈবাৎ তার দেখা পেতেও তো পারি। তবে আপাতত তোমাকে সেই হরপার্বতীর মন্দিরের নিচের গুহা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

বললাম,—সর্বনাশ! তিনশ ফুট পাহাড়ে চড়াবেন আমাকে? এই রোদ্দুরে?

—ডার্লিং! এক সময়ে তুমি মাউন্টেনিয়ারিংয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলে। মাঝে-মাঝে তোমাকে পাহাড়ে চড়াই বলেই তোমার শক্তি বাড়ে।

কথা না বাড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম। একফালি লাল মাটির পথ। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই হয়ে বাঁক নিতে-নিতে জঙ্গলে উধাও হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা খোলা ঘাসে ঢাকা মাঠ দেখতে পেলাম। আমাদের ডান দিকে একটা

খাড়াই টিলা দেখে চিনতে পারলাম, এটাই সেই হর-পার্বতীর মন্দির। আগের দিন টিলাটা পশ্চিমদিকের নদীর ধার থেকে দেখেছিলাম। কর্নেল বাইনোকুলারে হরপার্বতীর টিলা এবং চারদিক খুঁটিয়ে দেখার পর এগিয়ে গেলেন।

এদিকটায় টিলার নিচে একটা শালবন। শালবনের নিচে তত বেশি বাড়ি নেই। এলোমেলো বাতাস বইছিল। এতক্ষণে নীল আকাশে সাদা মেঘের টুকরো চোখে পড়ল। শালবন পেরিয়ে কোনও পুরোনো আমলের পাথরের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের পাহাড়ে চড়া শুরু হল। বলছি পাহাড় বা টিলা, কিন্তু এটা অনেকটা মিশরের পিরামিডের মতোই দেখতে। মাঝে-মাঝে মেঘের ছায়া ছাড়া এদিকটায় কোনও গাছের ছায়া পাওয়ার আশা নেই।

কর্নেল মাঝে-মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পাথরের সিঁড়ি কোথাও-কোথাও পিছল হয়ে আছে। তাই আধঘণ্টা পরে যখন চুড়োয় পৌঁছুলাম তখন আমি হাঁফাচ্ছি। একটা কোনে বটগাছ হরপার্বতীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাথা তুলেছে। তার ছায়ায় একটা পাথরে কর্নেল বসলেন। আমি তাঁর পাশাপাশি আর একটা পাথরে বসলাম। সত্যি, আমার এই বৃদ্ধ বন্ধুর কোনও তুলনা হয় না। তিনি যে ক্লান্ত তাও বোঝা যাচ্ছে না। বাইনোকুলারে চোখ রেখে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে কিছু দেখছিলেন।

জিগ্যেস করলাম,—জলপ্রপাতটা ওইদিকেই আছে, তাই না?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তবে মৎস্যশিকারি দুই লাক্ষা ব্যবসায়ীকে দেখতে পেলাম না। ওঁরা হয়তো ইচ্ছেমতো মাছ ধরে বাংলোয় ফিরে গেছেন।

—সেই গুহাটা কোথায়?

—আমাদের নিচে। চলো, গুহায় বসে চুরুট টানা যাবে।

তাঁকে অনুসরণ করে দেখলাম ঝোপঝাড়ের ফাঁকে পাথরের সিঁড়ির মতো কয়েকটা ধাপ। সাবধানে কর্নেলের পিছনে নেমে গেলাম। গুহার সামনে একটা পাথরের চাতাল। গুহার দরজাটা প্রায় ফুট ছয়েক উঁচু, ফুট তিনেক চওড়া। চাতালে দাঁড়িয়ে বললাম,—কর্নেল, গুহাবাসী এখন নেই রক্ষে! থাকলে এতক্ষণ লড়াই বেধে যেত।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—লোকটা দিনে থাকে না।

—কেমন করে জানলেন আপনি?

কর্নেল বললেন,—আজ ভোরে ওই পিচ রাস্তায় সম্ভবত তারই সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

—কী আশ্চর্য! আপনি আগে বলেননি কেন?

—এই তো বললাম। তুমি জানতে চাইলে, তাই বললাম।

—কী করে বুঝলেন, সেই এই গুহায় রাত কাটায়?

—তার হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার ছিল। নাঃ—সে কোনও সাধু-সন্ন্যাসী নয়। দস্তুরমতো ভদ্রলোক।

—কিন্তু সে-ই যে এই গুহায় থাকে, তার কী প্রমাণ পেয়েছেন?

—তার মুখে ফিলটার টিপ্‌ড সিগারেট ছিল। পিঠে আঁটা ছিল একটা বন্দুক।

—আপনি তাকে কিছু জিগ্যেস করলেন না?

—না। কারণ সে নিজেই বলল, এভাবে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের জঙ্গলে একটা অজানা মানুষখেকো জন্তুর উৎপাত আছে। সাবধান! আমি তাকে বললাম, আপনি কি ওই জন্তুটাকে মারবার জন্যেই বন্দুক নিয়ে গিয়েছিলেন? সে আমার কথার কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেল। এবার জয়ন্ত, তাহলে অঙ্ক কষে দেখো।

অবাক হয়ে কর্নেলের কথা শুনছিলাম। বললাম,—লোকটা তাহলে এলাকার কোনও বড়লোক। ওই বন্দুক তার প্রমাণ। আর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লোকটা বদ্ধ পাগল।

কর্নেল গুহায় ঢুকে গুটিয়ে রাখা ক্যাম্বিসের খাট খুললেন। অবাক হয়ে দেখলাম, বিছানার উপর হিন্দিতে ছাপানো খানচারেক পুরোনো বই। জিগ্যেস করলাম,—ওগুলো কিসের বই? গল্প উপন্যাস নাকি?

কর্নেল বললেন,—না। এগুলো মন্ত্রতন্ত্রের বই। ওই কোণে দেখো একটা হ্যারিকেন আছে। হ্যারিকেনটা রাখার জন্যে ওই দেখো, একটা উঁচু টুল।

হাসতে-হাসতে বললাম,—যা বলেছি তাই! বদ্ধ পাগল!

কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। তিনি বইগুলোর পাতা একটা-একটা করে ওলটাতে থাকলেন। তারপর একটা ভাঁজ করা কাগজ খুঁজে বের করে সেটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিলেন। জিগ্যেস করলাম,—ওটা কী?

কর্নেল ভাঁজ করা কাগজটা বুক পকেটে ঢুকিয়ে ক্যাম্বিসের খাটটা আগের মতো গুটিয়ে রাখলেন। বললেন,—চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।

কিছুক্ষণ পরে যখন হরপার্বতীর চূড়া থেকে নেমে আসছি, তখন বললাম,—আপনি কি জানতেন ওই ভাঁজ করা কাগজটা এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে? তাই এখানে এসেছিলেন?

কর্নেল বললেন,—গুহাটা তো আজ সকালেই আবিষ্কার করেছি।

—তাহলে আবার এলেন কেন?

—তোমাকে দেখানোর জন্য।

—না কর্নেল, আপনি যেভাবেই হোক, খুব সম্ভবত জানতেন ওই ভাঁজ করা কাগজটা এখানে পাওয়া যাবে।

—কাগজে কী আছে বলে তুমি ভাবছ?

একটু হেসে বললাম,—কোনও গুপ্তধনের ঠিকানা।

কর্নেলও হাসলেন,—ঠিক বলেছ ডার্লিং। তবে এখন কোনও কথা নয়। চলো, এখান থেকে জলপ্রপাতের কাছে যাওয়া যাক।

চূড়া থেকে নেমে আবার একটা শালবন পেরিয়ে ধারিয়া নদীর দেখা পেলাম এক ঝলক। এতক্ষণে জলপ্রপাতের গর্জন শোনা গেল। নদীর ধারে ধারে হাঁটতে-হাঁটতে একসময় জলপ্রপাতের দেখা পাওয়া গেল। এই জলপ্রপাতটা আমি আগেই দেখেছি। তবে নদীর পশ্চিম পাড় থেকে। জলপ্রপাতের নিচে বিস্তীর্ণ একটা জলাশয়। কর্নেল বাইনোকুলারে জলাশয়টা দেখে নিয়ে বললেন,—কিছু জলচর পাখি সবসময়েই হয়তো এখানে থাকে। তাদের বন্দুকে শিকার করা হয়তো সোজা কিন্তু শিকারকে করতলগত করা কঠিন। কারণ দৈবাৎ এই জলাশয়ের শেষ প্রান্তে গেলেই আর একটা ছোট্ট প্রপাতের পাল্লায় পড়ে নৌকো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে! তাই দেখছ না, এখানে কোনও জেলে নৌকা নেই।

কর্নেল জলাশয়ের অন্য পাড়ে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। জিগ্যেস করলাম,—অর্কিড দেখতে পাচ্ছেন নাকি?

—এসব জায়গায় অর্কিড জন্মায় না।

—তাহলে কী দেখছিলেন?

কর্নেল উত্তর না দিয়ে, উত্তরে নদীর ওপর সেই ব্রিজের দিকে, অর্থাৎ উজানের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। মনে হল উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছু দেখেছেন। তাঁকে চুপচাপ অনুসরণ করলাম।

ব্রিজ পেরিয়ে নদীর পশ্চিম পাড়ে অসমতল মাটিতে পাথর আর উঁচুনিচু গাছপালার ভেতর দিয়ে কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিলেন। আমি হতবাক হয়ে তাঁকে অনুসরণ করছিলাম। জলপ্রপাতের ডান দিকে নদীর পাড় খানিকটা ঢালু। আর ওই ঢালু মাটি পুরোটাই ঘাসে ঢাকা। জলাশয়ের কিনারায় বড়-বড় পাথরের টুকরো পড়ে আছে। সেখানে নেমে গিয়ে কর্নেল একটা মাছধরা ছিপের গোড়ার দিকটা পাথরের ফাঁক থেকে তুলে নিলেন। দেখলাম ছিপটার গোড়ায় পেতলের হুইল বাঁধা আছে। কিন্তু সুতো ছিঁড়ে গেছে। কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন,—এই হুইলটা রোদে চকচক করছিল। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, ছিপের গোড়ার দিক ভেঙে ফেলে রেখে লাক্ষা ব্যবসায়ীরা উধাও হলেন কেন? চলো, বাংলোয় ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

বাংলোয় ফিরে গিয়ে রামভগতের মুখে যা শুনলাম, তা সাংঘাতিক ঘটনা। সেই হিংস্র জন্তুটা নাকি ছোট সাহেব, অর্থাৎ রাকেশ শর্মার গলা কামড়ে ধরে জঙ্গলে উধাও হয়েছে। বড় সাহেব তাই ধরমপুরে চলে গেছেন। রামপুর টাউন থেকে পুলিশ নিয়ে আসবেন।

॥ তিন ॥

ঘটনাটা শোনার পর কর্নেল গম্ভীর মুখে আমাদের ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। তারপর পিঠ থেকে কিটব্যাগ বাইনোকুলার ক্যামেরা টেবিলে রেখে চুরুট ধরালেন।

আমি হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। প্রপাতের জলাশয়ের ধারে মাছধরা ছিপটা ভাঙা অবস্থায় দেখে এসেছি। আফগান হাউন্ডের অতর্কিত আক্রমণের সময় রাকেশ শর্মা কি ছিপের গোড়ার দিকটা দিয়ে জন্তুটাকে আঘাত করেছিলেন? কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করেছে। ওখানে তো কোনও রক্তের চিহ্ন দেখিনি। একটু পরে কর্নেলকে বললাম,—আচ্ছা কর্নেল, হিংস্র কুকুরটা যদি মিস্টার শর্মার গলা কামড়ে বাঘের মতোই জঙ্গলে উধাও হয়ে থাকে তাহলে ঢালু ঘাসের জমিতে প্রচুর রক্ত পড়ার কথা। কিন্তু আমরা রক্ত দেখিনি।

কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন,—রক্ত আমারও চোখে পড়েনি। অবশ্য অনেক সময়েই কোনও হিংস্র জন্তু গলা কামড়ে টেনে নিয়ে গেলে গলা থেকে কামড় না খোলা অবধি রক্ত ঝরে না। একথা আমি বিখ্যাত বাঘশিকারিদের কাছে শুনেছি। এখন আক্ষেপ হচ্ছে জলাশয়ের ওপরের পাড়ে ঝোপ-জঙ্গলগুলো খুঁজে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমি কেমন করে জানব, এমন কিছু ঘটেছে।

আমি একটু চুপ করে থাকার পর বললাম,—হরপার্বতীর টিলার গুহা থেকে যে ভাঁজ করা কাগজটা নিয়ে এলেন, ওতে কী আছে? তাছাড়া আপনি কি আগে থেকেই জানতেন যে ওটা ওখানে পাওয়া যাবে?

কর্নেল বললেন,—তোমাকে তো বলেছি, আজই ওই পাহাড়ের গুহা আবিষ্কার করে এলাম। আবিষ্কারের কথাটা ঠিকই। আসলে কাল দুপুরে তুমি যখন গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছিলে আমি বাইনোকুলারে দেখতে পেয়েছিলাম হরপার্বতী মন্দিরের টিলা বেয়ে বাংলোর মালি নবচন্দ্র উঠে গেল। তারপর আর তাকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম ভক্তিমান নব হয়তো পুজো দিতে যাচ্ছে। কারণ তখনও আমি ওই টিলার চূড়ায় মন্দিরটা আস্ত আছে কিনা জানতাম না। তাই আজ প্রাতঃভ্রমণের সময় নিছক খেয়ালে টিলার চূড়ায় উঠেছিলাম।

দেখলাম কোনও মন্দির নেই। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে একটা বেঁটে বটগাছ গজিয়েছে। তখন মনে প্রশ্ন জাগল, নবচন্দ্র এখানে কেন এসেছিল। তারপর খুঁজতে-খুঁজতে কয়েক মিটার নিচে ওই গুহাটা দেখতে পেয়েছিলাম।

বললাম,—কিন্তু তখন আপনি গুহার ভিতর কিছু খোঁজেননি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তারপর খুঁজে ওই ভাঁজ করা কাগজটা পেলেন। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না।

কর্নেল ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন,—তখন ভেবেছিলাম গুহাবাসী লোকটার জন্য নব হয়তো খাবার নিয়ে গিয়েছিল। আমার এ ভুল কেন হল তা বুঝতেই পারছ। ভোরবেলা পিচরাস্তার মোড়ে বন্দুকওলা লোকটার হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার দেখেছিলাম।

এই সময়েই রামভগত বারান্দা থেকে বললেন,—এখন কি কফি খাবেন স্যার?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তুমি কফি আনো।

বাইরে রামভগতের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে বললাম,—প্লিজ কর্নেল, ওই কাগজটাতে কী লেখা আছে আমায় খুলে বলুন।

কর্নেল বললেন,—ওতে হিন্দিতে লেখা আছে, "যোগিন্দর, ধরমপুর থেকে সিনহা সাব খবর পাঠিয়েছে কাল বিকেলের মধ্যে বাংলোয় আসছে। তোমার কথামতো আগাম জানিয়ে রাখলাম।" চিঠির নিচে শুধু 'নব' লেখা আছে।

—নব হিন্দি লিখতে জানে?

—কী আশ্চর্য! সে এতকাল বিহার মুলুকে বাস করছে, একটু-আধটু হিন্দি লেখাপড়া জানা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

—ভারি গোলমেলে ব্যাপার। কিছু বোঝাই যাচ্ছে না।

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, বড় জটিল রহস্য।

কথাটা বলে তিনি জ্বলন্ত চুরুট ঠোঁটে কামড়ে ধরে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। মাথার টুপিটা সম্ভবত খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন। মুখ উঁচু করায় টুপিটাই খুলে পড়ে গেল। তবু তিনি ধ্যানস্থ। অগত্যা খালি টুপিটা কুড়িয়ে টেবিলে রাখলাম।

একটু পরে রামভগত কফি নিয়ে এল। তাকে বললাম,—সিনহা সাহেব বলছিলেন, অস্ত্র ছাড়া জঙ্গলে কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয়। তাহলে সেই জন্তুটা কী করে তোমাদের ছোটসাবকে তুলে নিয়ে গেল?

রামভগত করুণ মুখে বলল,—সিনহা সাব আর শর্মা সাবের কাছে রিভলবার আছে।

—তুমি কি কখনও দেখেছ?

—হ্যাঁ স্যার, কতবার দেখেছি। সিনহা সাব বলে গেলেন, আচমকা জানোয়ারটা ঝাঁপ দিয়েছিল। সিনহা সাব মাথার ঠিক রাখতে পারেননি। ছিপ দিয়ে নাকি জানোয়ারটাকে মেরেছিলেন। তারপর খেয়াল হতেই রিভলবার থেকে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু জানোয়ারটা তখনই একলাফে নাকি উপরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। স্যার, ওই জানোয়ার কোনও খারাপ আত্মা। এই মুলুকের লোকে বিশ্বাস করে, ওটা ভূত-প্রেত ছাড়া কিছু নয়।

ততক্ষণে কর্নেল সোজা হয়ে বসে কফিতে মন দিয়েছেন। গম্ভীর মুখে বললেন,—বুঝলে রামভগত, এবার বোঝা যাচ্ছে ওই হিংস্র ভূতটাই গত রাতে পাশের ঘরে অদ্ভুত সব শব্দ করছিল। শব্দ শুনে কেউ বেরুলেই সে নির্ঘাৎ তার গলা কামড়ে ধরে জঙ্গলে উধাও হয়ে যেত।

রামভগত ভয়ার্তমুখে চাপা স্বরে বলল,—সেইজন্যই তো আমরা ওই ঘর থেকে শব্দ শুনেও রাতে বেরোই না।

—ও ঘরের তালার চাবি কার কাছে থাকে?

—চাবি একটা আমার কাছে ছিল। আর একটা রেঞ্জারসাবের কাছে।

—তোমার কাছে ছিল মানে! এখন নেই?

—না স্যার, চাবিটা হারিয়ে গেছে। কী করে যে হারিয়ে গেল কে জানে! রেঞ্জার সাহেব ওই চাবিটা আমাকে আলাদা করে রাখতে বলেছিলেন। তাই আমি ওটা আমার ঘরের কুলুঙ্গিতে রুদ্রদেবের তলায় রেখেছিলাম। আমার বউকে পর্যন্ত একথা জানাইনি। কিছুদিন আগে রেঞ্জার সাহেব এসে ওই ঘরটা খুলতে বলেছিলেন। তিনি চাবিটা আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমি রুদ্রদেবের মূর্তির তলায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও চাবিটা পাইনি। রেঞ্জার সাহেব আমাকে খুব বকাবকি করে বলেছিলেন, একটা নতুন তালার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত করেননি।

বাইরে কেউ ডাকছিল,—রামভগত! রামভগত!

রামভগত তখনি বেরিয়ে গেল। দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, দুজন মেটে রঙের উর্দি পরা লোক। তাদের কাঁধে বন্দুক। বললাম,—কর্নেল, আপনি বলছিলেন এই রিজার্ভ ফরেস্টের গার্ডরা নিজের-নিজের বাড়িতে বসে ডিউটি করে। এখন দেখছি তাদের টনক নড়েছে।

কর্নেল বললেন,—ওদের দোষ নেই। রেঞ্জার সাহেবকে তো বলতে শুনেছ এই জঙ্গলটা সবে মাসচারেক আগে সরকার রিজার্ভ ঘোষণা করেছে। এই বাংলোটা ছিল ইংরেজ আমলের কোনও প্রকৃতিপ্রেমিক ইংরেজের বাংলো বাড়ি। দেওয়ালের অবস্থা দেখে তা বুঝতে পারছ না? এখানে শিগগিরই নাকি বিদ্যুতের লাইন এসে যাবে। তারপর বাংলোটা মেরামত করা হবে।

কফি শেষ করে বললাম,—বাংলোতে তিনটে মোটে ঘর। মধ্যের ঘরটা পুরনো আসবাবপত্রে নাকি ভর্তি। আর ওই ঘরেই মাঝে-মাঝে কোনও প্রেতাত্মা হিংস্র আফগান হাউন্ডের বেশে দখল করে নেয়। গতরাতে সে এসেছিল। ঘরটা খুলে দেখতে পেলে ব্যাপারটা বোঝা যেত।

কর্নেল অ্যাসট্রেতে রাখা চুরুটটা টেনে নিজেকে চাঙ্গা করলেন। তারপর বললেন,—জয়ন্ত, ওই ঘরে গত রাতে সত্যিই যে একটা আফগান হাউন্ড ঢুকেছিল এবং তার মালিকও সঙ্গে ছিল, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অবাক হয়ে বললাম,—মালিক! মানে আফগান হাউন্ডটার কোনও মালিক আছে? তা যদি থাকে, তাহলে সে তার পোষা জন্তুটাকে ওভাবে জঙ্গলে ছেড়ে দেয় কেন? সে নিশ্চয়ই জানে এই কুকুরটা বাঘের চেয়েও হিংস্র। বিশেষ করে বনে-জঙ্গলে ছেড়ে দিলে কুকুরটা তো ক্রমশ বন্য হয়ে উঠবে। তখন কারও বশ মানবে না।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাংলোর নিচের রাস্তায় গাড়ির শব্দ শোনা গেল। জানলার পর্দা তুলে দেখলাম, একটা পুলিশ জিপ, একটা পুলিশ ভ্যান এবং তার পেছনে রেঞ্জার সাহেবের সেই জিপটা এসে থামল। গাড়ি তিনটে থেকে দুজন পুলিশ অফিসার এবং কয়েকজন সশস্ত্র কনস্টেবল বেরিয়ে এল। পেছনের জিপ থেকে রেঞ্জার সুরজিৎ নায়েক এবং লাক্ষা ব্যবসায়ী সেই সিনহা সাহেব বেরিয়ে এলেন। সবাই এসে বাংলোর বারান্দায় ভিড় করলেন। এবার দরজার পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে

দেখলাম, বারান্দার চেয়ারগুলো দখল করে পুলিশ অফিসার আর মিস্টার সিনহা এবং আরও দুজন পুলিশ অফিসার বসে পড়লেন। শুধু রেঞ্জার সাহেব আমাদের ঘরের সামনে এসে আমায় দেখে নমস্কার করে বললেন,—মিস্টার চৌধুরি, কর্নেল সাহেব কি আবার অর্কিডের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন?

ভিতর থেকে কর্নেল সাড়া দিলেন,—না মিস্টার নায়েক, ঘরে বসে ঈশ্বরের নাম জপ করছি। আপনি আসুন, ভেতরে আসুন।

মিস্টার নায়েক ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর বললেন, —মিস্টার সিনহাকে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম। ওভাবে যখন তখন-জঙ্গল এলাকায় যাবেন না। জানোয়ারটাকে এলাকার আদিবাসীরাও দেখেছে। তারা ভয়ে আর কাঠ সংগ্রহের জন্য জঙ্গলের বেশি ভেতরে ঢোকে না। এর আগেও কয়েকটা প্রাণ গেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, খোঁজাখুঁজি করে শুধু রক্ত আর হাড় ছাড়া ডেড বডির এতটুকু মাংসও দেখতে পাওয়া যায়নি! এমনকী মাথাটাও কে যেন ধারাল দাঁতে কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছে!

কর্নেল বললেন,—আপনি এই বাংলোর ভূতের কথা বলেছিলেন। গত রাতে সে তালাবন্ধ ঘরের ভেতর খুব লম্ফঝম্ফ করে গেছে।

আমি বলে উঠলাম,—আর ওই গর্‌র-গর্‌র গর্জনের কথা বলুন।

মিস্টার নায়েক যেন চমকে উঠলেন,—কোনও জন্তুর গর্জন?

—হ্যাঁ। হিংস্র জন্তুর গর্জন বলেই মনে হল।

কর্নেল বললেন,—আমি কিন্তু গর্জন শুনিনি।

বললাম,—শুনবেন কী করে? আপনি তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন! আমি জাগিয়ে দিতে বললেন, ও কিছু নয়। তারপর আবার আপনার নাক ডাকা শুরু হল।

মিস্টার নায়েক হঠাৎ চাপাস্বরে জিগ্যেস করলেন,—কর্নেল সাহেবের আজ সকালে চলে যাওয়ার কথা ছিল। গতরাতের ওই ভুতুড়ে উৎপাতের রহস্য সমাধান করবার জন্যই কি আপনি থেকে গেলেন?

কর্নেল তেমনি চাপাস্বরে উত্তর দিলেন,—মিস্টার নায়েক, রামপুর থানার অফিসার ইন-চার্জকে কি আমাদের কথা বলেছেন?

—হ্যাঁ, বলেছি।

—আপাতত পুলিশের কী প্ল্যান?

—ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে নিয়ে রাকেশ শর্মার মৃতদেহ উদ্ধার। অবশ্য আমি ওঁদের বলেছি পুরো লাশ খুঁজে পাবেন না। হাড়গোড় আর রক্ত খুঁজে পাবেন।

এই সময়েই আমাদের ঘরের দরজার সামনে একজন পুলিশ অফিসার এসে বললেন,—আসতে পারি?

মিস্টার নায়েক বললেন,—আসুন মিস্টার প্রসাদ। কর্নেল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আলাপ-পরিচয়ে জানা গেল তিনিই অফিসার ইনচার্জ মিস্টার হরিহর প্রসাদ।

উনি বললেন,—পুলিশ ফোর্স ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে এখনই বেরিয়ে গেল। আমাদের দুজন অফিসারও তাদের দলে আছেন।

—মিস্টার সিনহা ওঁদের সঙ্গে যাননি?

—হ্যাঁ। উনিও গেছেন। জলপ্রপাতের নিচে যেখানে ওঁরা মাছ ধরছিলেন, সেখান থেকেই খোঁজা শুরু হবে। আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম। আপনার সব পরিচয়ই আমাকে মিস্টার নায়েক দিয়েছেন, তাছাড়া আসতে-আসতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল হাথিয়াগড়ে আমার এক কলিগ সম্প্রতি ও.সি. হয়ে গেছেন। তাঁর কাছে আপনার নাম শুনেছিলাম।

কর্নেল বললেন,—বলুন আমি কী করতে পারি?

—বিশ্বস্তসূত্রে আমাদের কাছে খবর আছে, ধরমপুর ফরেস্ট এলাকায় নিষিদ্ধ মাদকের একটা চোরা ঘাঁটি আছে। কিন্তু সেটা কোথায় তা আমাদের সূত্রও জানে না। সে শুধু কোনও-কোনও রাত্রে এই জঙ্গলের ভেতর মোটরগাড়ির আলো দেখতে পেয়েছে। যাই হোক, এর সত্যিমিথ্যে যে যাচাই করব, তার সুযোগ পাইনি। প্রথমত কিছুকাল যাবৎ এই জঙ্গলে একটা অজানা হিংস্র জানোয়ারের উৎপাত, দ্বিতীয়ত আমাদের হাতে তত বেশি ফোর্সও নেই যে জঙ্গলটাকে ঘিরে রাখব।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—মিস্টার সিনহার কাছে তো বটেই, মিস্টার শর্মার কাছেও রিভলবার ছিল। মিস্টার সিনহা শুনলাম দু-রাউন্ড গুলিও ছুঁড়েছেন।

প্রসাদ বললেন,—পিছন থেকে জানোয়ারটা নাকি নিঃশব্দে মিস্টার শর্মার ওপর ঝাঁপ দিয়েছিল। তারপর—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন,—জানোয়ারটার চেহারা কেমন তা কি মিস্টার সিনহা আপনাকে জানিয়েছেন?

—হ্যাঁ। কালো রঙের একটা প্রকাণ্ড কুকুরের মতো জন্তু। তিনি নাকি এত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন যে সময়মতো গুলি ছোঁড়ার বদলে ছিপের গোড়ার দিকটা দিয়ে জন্তুটাকে আঘাত করেন।

কর্নেল রেঞ্জার নায়েককে বললেন,—আপনার সঙ্গে কি মাঝখানের ওই ঘরের তালার চাবি আছে?

নায়েক বললেন,—আছে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মিস্টার প্রসাদ, মাঝখানের ঘরটাতে রাত্রে মাঝে-মাঝে ভূতের উপদ্রব হয়।

প্রসাদ একটু থেমে বললেন,—হ্যাঁ, মিস্টার নায়েকের কাছে শুনেছি।

কর্নেল বললেন,—চলুন, ওই ঘরটার তালা খুলে ভিতরে একটু খোঁজখবর নেওয়া যাক। ভূত কোন পথে আসে এবং পালায় তা জানা দরকার।

নায়েক আগে বেরিয়ে গিয়ে তালা খুলে কপাটে চাপ দিলেন। কিন্তু কপাট খুলল না। তিনি এবার সজোরে ধাক্কা দিলেন। দরজা একটু ফাঁক হল। তারপর দেখা

গেল একটা ভাঙাচোরা কাঠের আলমারি দরজার সামনে দাঁড় করানো আছে। সুরজিৎ নায়েক খুব অবাক হয়ে বললেন,—আলমারিটা এখানে কে এনে রাখল? রামভগত! রামভগত!

রামভগত দৌড়ে এসে বলল,—কী হয়েছে স্যার?

—এই আলমারিটা এখানে কেন?

রামভগত আমতা-আমতা করে বলল,—আমার চাবি তো হারিয়ে গেছে। আপনি নতুন তালাচাবি দেবেন বলেছিলেন, এখনও দেননি।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে আলমারিটাকে টেনে সরিয়ে দিলেন। তারপরই দেখতে পেলাম ঘরের ভেতর ভাঙাচোরা একটা খাটে অনেকগুলো হাড়গোড় আর চাপচাপ রক্ত।

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর ছোট্ট টর্চটা বের করে ভিতরে ঢুকে খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন,—হাড়গুলো দেখে বোঝাই যাচ্ছে, এটা কোনও ছোট্ট প্রাণীর হাড়। ...হ্যাঁ, ওই দেখুন মিস্টার প্রসাদ, এগুলো ভেড়ার লোম বলে মনে হয় না আপনার?

ও.সি. মিস্টার প্রসাদ পরীক্ষা করে দেখে বললেন,—ও মাই গড! ঘরে কেউ কি ভেড়া পুষে রেখেছিল?

মিস্টার নায়েক হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গম্ভীর মুখে রামভগতকে বললেন,—তোমার চাবি হারিয়ে গেছে। তাহলে এখানে একটা ভেড়া ঘুমোচ্ছিল কী করে?

রামভগত কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল,—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না স্যার।

ভিতর থেকে কর্নেল বললেন,—রামভগতের চাবিটা যে চুরি করেছে, সে কাল রাতে চুপি-চুপি এখানে একটা ভেড়া এনে এই খাটে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ভেড়া কি সাধে বলে! ভেড়া মানেই নির্বোধ। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকে চাবিচোর দরজা খুলে রেখেছিল।

মিস্টার প্রসাদ বললেন,—কেন?

—আমার অনুমান। কিন্তু যুক্তিপূর্ণ অনুমান। হিংস্র জানোয়ারটা কাছাকাছি কোথাও তার মালিকের সঙ্গে এসে অপেক্ষা করছিল। চাবিচোর সম্ভবত কোনও সঙ্কেত দিয়েই সরে পড়ে, আর মালিক তার পোষ্য জানোয়ারটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।

মিস্টার নায়েক বললেন,—কিন্তু আলমারিটা কে রেখেছিল এখানে?

—এবার খুলেই বলি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্তুটা একটা আফগান হাউন্ড। তার মালিক কোনও উদ্দেশ্যে তাকে দিয়ে মানুষ হত্যা করায়। গতরাত্রে আফগান হাউন্ডটা ক্ষুধার্ত ছিল। অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত রাখা হয়েছিল।

মিস্টার প্রসাদ বললেন,—অদ্ভুত ব্যাপার!

—হ্যাঁ আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত। কিন্তু আপনি আমার থিয়োরির কাঠামোটা শক্ত করে দিয়েছেন।

—কীভাবে?

কর্নেল তাঁর কথার জবাব না দিয়ে খাটের তলায় এবং মেঝের সবখানে ভাঙা আসবাবপত্রের ভেতর আলো ফেলে দেখছিলেন। দেখা শেষ হলে তিনি বললেন,—হ্যাঁ, আফগান হাউন্ডটাকে এঘরে ঢুকিয়ে ভৌতিক উপদ্রব করানোর জন্য আরও কয়েকটা নির্বোধ ভেড়াকে এঘরে রাখা হয়েছিল।

এতক্ষণে রামভগত চাপাস্বরে বলে উঠল,—বুঝেছি, বুঝেছি। দেখি সেই চাবিচোর এখন কোথায় আছে! তাকে ধরে নিয়ে আসি।

বলেই সে দৌড়ে চলে গেল।

॥ চার ॥

রেঞ্জার মিস্টার নায়েক অবাক হয়ে বললেন,—ভেড়ার কথা শুনে রামভগতের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—মাথা খারাপ হওয়ারই কথা। আপনাদের মালি নবচন্দ্রের যে ভেড়া পোষার শখ ছিল তার কারণ জেনে এবার রামভগত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

—নব ভেড়া পুষত? আপনি কী করে জানলেন?

—দরকার হলে পুষত। অর্থাৎ যে রাতে ভৌতিক উৎপাত ঘটবে সেদিনই সে একটা কচি ভেড়া নিয়ে আসত। কাল দুপুরে জঙ্গল থেকে ফেরার সময় বাইনোকুলারে দেখছিলাম, নব একটা কচি ভেড়াকে কোয়ার্টারের পেছনে বেঁধে রেখেছে। এদিকে এই ঘরের ভেতর প্রচুর ভেড়ার লোম এবং হাড় দেখলাম। দুটো মিলিয়ে আমার এই সিদ্ধান্ত।

ও.সি. মিস্টার প্রসাদ সায় দিয়ে বললেন,—আপনি ঠিকই ধরেছেন। যাই হোক, এবার জলপ্রপাতের নিচে যেখানে মিস্টার সিনহারা মাছ ধরছিলেন সেখানে যাওয়া যাক। কর্নেল সাহেব কি যাবেন আমার সঙ্গে?

কর্নেল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন ফরেস্ট গার্ডকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। সে লনে পৌঁছে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—শর্মা সাহেবের বডি পাওয়া গেছে স্যার। কিন্তু সে জন্তুটাকে দেখতে পাইনি। বডি ক্ষতবিক্ষত। হয়তো তার খাওয়ার সময় আমরা গিয়ে পড়ায় জন্তুটা গা ঢাকা দিয়েছে।

কর্নেল বললেন,—গত রাতে জন্তুটা একটা আস্ত ভেড়া খেয়েছে, তাই মিস্টার শর্মার ডেডবডি বেশি খেতে পারেনি। পরে খাবে বলে চলে গেছে।

কর্নেলের রসিকতায় মিস্টার প্রসাদ হেসে উঠলেন। মিস্টার নায়েক ফরেস্ট গার্ডকে বললেন,—ডেডবডি কি ওঁরা এখানে নিয়ে আসবেন?

ফরেস্ট গার্ড বলল,—বডি নিয়ে আসার জন্যে পুলিশ অফিসাররা আমাকে বললেন বাংলো থেকে একটা বাঁশ আর তেরপল নিয়ে আসতে।

নায়েক ডাকলেন,—রামভগত, রামভগত, শিগগির এখানে এসো।

রামভগত এসে রুষ্টমুখে বলল,—ওই নব আমার ঘর থেকে তালা চুরি করেছে স্যার। আমার বউ একদিন বলছিল, আমি যখন ধরমপুর বাজারে গেছি, তখন নব চুপি-চুপি এই ঘরটা খুলেছিল।

নায়েক বললেন,—নবর কথা পরে। একটুকরো শক্ত বাঁশ আর তেরপল চাই। আছে তো?

—তা আছে স্যার। তেরপলটা একটু ছেঁড়া হবে।

—তা হোক। শিগগিরই নিয়ে এসো।

রামভগত একটা শুকনো লম্বা বাঁশ আর ভাঁজ করা তেরপল নিয়ে এল। ফরেস্ট গার্ড সেদুটো কাঁধে নিয়ে পা বাড়াল।

এবার কর্নেল বললেন,—চলো, আমরাও যাব।

প্রসাদ, নায়েক, কর্নেল এবং আমি ফরেস্ট গার্ডকে অনুসরণ করলাম। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, তুমি আমার কিটব্যাগ, ক্যামেরা আর বাইনোকুলারটা এনে দাও। ঘরে তালা দিতে ভুলো না।

তাঁর নির্দেশ পালন করে আমিও দলটার সঙ্গ ধরলাম।

ফরেস্ট গার্ড পিচরাস্তা ধরে পূর্বে অর্থাৎ ব্রিজের দিকে হাঁটছিল। এই সময় কর্নেলকে বলতে শুনলাম,—আচ্ছা মিস্টার প্রসাদ, এই এলাকায় আপনি যোগিন্দর নামে কোনও লোককে চেনেন?

মিস্টার প্রসাদ দাঁড়িয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন,—যোগিন্দর সাউ?

—হ্যাঁ, লোকটার একটা বন্দুক আছে। রোদে পোড়া, কিন্তু স্বাস্থ্যবান চেহারা। মাথায় একটু ছিট আছে বলে মনে হল।

—হ্যাঁ, আপনি তাহলে ঠিকই দেখেছেন। যোগিন্দরকে কোথায় দেখলেন?

—ব্রিজের ওপারে কিছুটা এগিয়ে হরপার্বতী মন্দিরের দিক থেকে তাকে আসতে দেখেছিলাম। তখন ভোর ছটা। আমি মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলাম।

নায়েক এবার বলে উঠলেন,—সর্বনাশ! আপনি খুব বেঁচে গেছেন কর্নেল সাহেব। লোকটা সাংঘাতিক ডাকাত! শুনেছি, তার সামনে অচেনা লোক পড়লে সে তাকে গুলি করে মারে।

মিস্টার প্রসাদ বললেন,—হ্যাঁ ডাকু যোগিন্দার। একসময় সে অনেক খুন-খারাপি এবং ডাকাতি করেছে। তার দলের সবাইকে আমরা ধরতে পেরেছিলাম। তারা এখন জেলে। কিন্তু যোগিন্দরকে ধরতে পারিনি।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—ব্যবসায়ী মিস্টার সিনহা এবং মিস্টার শর্মার সঙ্গে কি কোনওসময় যোগিন্দরের যোগাযোগ ছিল?

হরিহর প্রসাদের অভ্যাস কথা বললেই দাঁড়িয়ে পড়া। তিনি বললেন,—ওই দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কথা একটি সূত্রে জেনেছিলাম। ওরা লাক্ষা ব্যবসায়ী।

কিন্তু লাক্ষার প্যাকেটের তলায় নাকি যোগিন্দরের চোরাই মাল ওঁরা পাচার করেন। কিন্তু বারদুয়েক হানা দিয়েও ব্যর্থ হয়েছিলাম। মিস্টার সিনহা তাই আমার ওপর কিছুদিন ক্ষুব্ধ ছিলেন।

কথা বলতে-বলতে ফরেস্ট গার্ডকে অনুসরণ করে আমরা জঙ্গলে ঢুকলাম। প্রায় কুড়ি মিনিট হেঁটে যাওয়ার পর জলপ্রপাতের গর্জন কানে এল। ফরেস্ট গার্ড এবার বাঁদিকের ঢালু একটা জঙ্গলে ঢুকল। তারপরই চোখে পড়ল প্রকাণ্ড কয়েকটা পাথরের উপর কনস্টেবলরা রাইফেল হাতে বসে আছে। এখানটা একটা খাদের মতো জায়গা। এখনও জল জমে আছে। সেই জলের মধ্যে পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত একটা মৃতদেহ।

একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মিস্টার সিনহা সিগারেট টানছেন। তাঁর দুটো চোখই লাল। কর্নেল সোজা তার কাছে গিয়ে বললেন,—জন্তুটাকে কি আপনি দেখতে পেয়েছিলেন?

কর্নেলের কথার ভঙ্গিতে আমার অবাক লাগল। এ কিরকম প্রশ্ন করছেন উনি?

মিস্টার সিনহা ধমকের সুরে বললেন,—দেখতে পাব না মানে? আমি তো রাকেশের কাছ থেকে প্রায় হাত তিরিশের দূরে ছিপ ফেলেছিলাম। কালো প্রকাণ্ড জন্তুটা পা টিপে-টিপে পেছন থেকে এসে রাকেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাকেশের আর্তনাদ শুনেই আমি চোখ ফিরিয়ে ছিলাম। ওই অবস্থাতেই হতবুদ্ধি হয়ে আমি ছিপের গোড়ায় হুইল বাঁধা অংশটা দিয়ে জন্তুটার মাথায় আঘাত করতে গেলাম। ছিপটা ভেঙে গেল। জন্তুটা গ্রাহ্যও করল না। বড় আশ্চর্য ব্যাপার! রাকেশকে সে গলায় কামড়ে ধরে এক লাফে ঘাসের জমি পেরিয়ে জঙ্গলে উধাও হয়ে গেল। ততক্ষণে আমার মনে পড়ে গেছে আমার কাছে রিভলবার আছে। পরপর দু-রাউন্ড গুলি ছুঁড়লাম।

ওদিকে ফরেস্ট গার্ড এবং কনস্টেবলরা মিস্টার শর্মার মৃতদেহটা খাদ থেকে তুলে ত্রিপলে ঘুড়ছিল। একজন ফরেস্ট গার্ড উঁচু গাছ থেকে ঝুলন্ত লতা টেনে নামিয়ে বলল,—দড়ি আনা উচিত ছিল। কী করা যাবে, এ লতাগুলো খুব শক্ত। এই দিয়ে বাঁশের সঙ্গে তেরপলে জড়ানো যেতে পারে।

একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর বললেন,—বডিটা বাংলোয় নিয়ে যেতে হবে। এতক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছনোর কথা।

তিনি কয়েকজন কন্সস্টেবল এবং ফরেস্ট গার্ডদের নির্দেশ দিলেন। তারা তেরপলে ঢাকা লাশটা বাঁশের দুই প্রান্ত কাঁধ লাগিয়ে বাংলোয় দিকে চলে গেল।

হরিহর প্রসাদ মিস্টার সিনহার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি লক্ষ রেখেছিলাম কর্নেলের দিকে। দেখি তিনি সেই গাছের ধারে হাঁটু মুড়ে বসে কিছু দেখছিলেন। দেখার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—জন্তুটা কুকুরজাতীয় প্রাণী। তবে নেকড়ে নয়। মিস্টার

প্রসাদ এই এলাকায় কি আদিবাসীরা শিকার করার জন্য আফগান হাউন্ড পোষে?

মিস্টার প্রসাদ উত্তেজিতভাবে বললেন,—আফগান হাউন্ড? হ্যাঁ। আমার এক কলিগ পুলিশের ডগ স্কোয়াডে ছিল। তার মুখে আফগান হাউন্ডদের ইতিহাস শুনেছি। ধরমপুর এলাকায় আদিবাসীরা কেন, অন্যেরাও এই জাতীয় কুকুর পোষেন বলে শুনেছি। তাঁরা অবশ্য বাড়ি পাহারা দেবার জন্যই এই প্রজাতির কুকুর পোষেন।

কর্নেল বললেন,—আপনি কখনও আফগান হাউন্ড দেখেছেন?

—না। শুনেছি মাত্র।

মিস্টার সিনহা বললেন,—আমার নিজেরই একটা আফগান হাউন্ড ছিল। সেটা রোগে ভুগে মারা যায়।

কর্নেল বললেন,—তাহলে তো আফগান হাউন্ড আপনি দেখেছেন। যে জন্তুটা মিস্টার শর্মাকে আক্রমণ করেছিল, সেটা দেখে কি আপনার মনে হয়নি যে ওটা আফগান হাউন্ড?

—না। ওটা নিছক কুকুর নয়। সম্ভবত কালো নেকড়ে।

ও.সি. মিস্টার প্রসাদ একটু হেসে বললেন, —নেকড়ে কি কালো হয়?

—হতেই পারে। কালো চিতার কথা শুনেছি। কোনও দেশে নাকি কালো বাঘ আছে। কাজেই কালো নেকড়ে থাকতেই পারে।

কর্নেল হঠাৎ বলে উঠলেন,—মিস্টার সিনহা, কুখ্যাত যোগিন্দারের সঙ্গে আপনার কখনও আলাপ হয়েছে?

মুহূর্তে লাক্ষা ব্যবসায়ীর মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। কর্কশ কণ্ঠে বললেন,—দেখুন, আপনি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল। মিস্টার প্রসাদ এখানে উপস্থিত না থাকলে আপনার এই ধৃষ্টতার ঠিক জবাব দিতাম।

মিস্টার প্রসাদ তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন,—প্লিজ, শান্ত হোন মিস্টার সিনহা। উনি আপনাকে নিছক একটা প্রশ্ন করেছেন। স্রেফ কৌতূহল। কারণ যোগিন্দরের নামে এ অঞ্চলে অনেক গল্প চালু আছে। সব ব্যবসায়ীই নাকি তাকে ভেট দিতে বাধ্য হয়। যাই হোক, এখানে আর আমাদের কিছু করার নেই। বাংলোয় ফেরা যাক।

এরপর আমরা বাংলোয় ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে রাকেশ শর্মার মৃতদেহ স্ট্রেচারে চাপিয়ে নিয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্স অনুসরণ করে পুলিশ ভ্যানে দুজন অফিসার এবং আর্মড কনস্টেবলও চলে গেল।

রামভগত আমাদের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা করছিল। দেখলাম তাকে রান্নায় সাহায্য করছে তার বউ আর অচেনা একটা লোক। রেঞ্জার এবং নায়েক খোঁজ নিয়ে এসে বললেন,—নবচন্দ্রের পাত্তা নেই।

মিস্টার সিনহা তাঁর ঘর খুলে ভেতরে ঢুকে ছিলেন। আমরা আমাদের ঘরে

বসেছিলাম। বারান্দায় একজন পুলিশ অফিসার আর চারজন আর্মড কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল। আমাদের ঘরে ঢুকে ও.সি. প্রসাদ বললেন,—সিনহা সাহেব তাঁর পার্টনারের ডেডবডির সঙ্গে গেলেন না দেখছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—উনি ধরমপুরে ওঁর রেস্টহাউস থেকে পায়ে হেঁটেই বাংলোয় যাতায়াত করেন শুনেছি। হয়তো পায়ে হেঁটেই যাবেন।

মিস্টার নায়েক বললেন,—উনি আমার সঙ্গে গেলে আমি ওঁকে পৌঁছে দিতে পারি।

কর্নেল বললেন,—তাহলে আমাদের রামপুরে পৌঁছে দিতে আপনাকে আবার জিপ পাঠাতে হবে।

—পাঠাব। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আফগান হাউন্ডটাকে কোতল না করে এখান থেকে যাবেন না।

মিস্টার প্রসাদ বললেন,—আমার মাথায় একটা সন্দেহ জাগছে। এখানে ধরমপুর থানায় বদলি হয়ে এসেই শুনেছিলাম ডাকু যোগিন্দরের নাকি একটা শিকারি কুকুর ছিল। কর্নেল যাকে বলছেন আফগান হাউন্ড। যোগিন্দর নিপাত্তা। সে কি কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল আস্তে বললেন,—আপনি আজ রাত্তিরটা আপনার ফোর্স নিয়ে এখানে থেকে যান। আমার আশা, আমি ডাকু যোগিন্দরকে ধরিয়ে দিতে পারব। কিন্তু না—এখন আর প্রশ্ন করবেন না।

এরপর যা ঘটেছিল তা একেবারে অভাবিত। সেই ঘটনা এবার সংক্ষেপে বলছি...

মিস্টার সিনহা ও.সি-র কাছে বিদায় নিয়ে লাঞ্চের পরই পায়ে হেঁটে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এবং মিস্টার শর্মার ব্যাগ ও স্যুটকেসটা মিস্টার নায়েকের কথায় দুজন ফরেস্ট গার্ড তাঁর সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল ও.সি. মিস্টার প্রসাদকে একান্তে ডেকে কী সব আলোচনা করছিলেন। আমি তা জানতে চাইনি। কারণ জানতে চাইলেও কর্নেল আমাকে বলবেন কিনা সন্দেহ।

রাত আটটার পর কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছিল। এই সময় কর্নেল, মিস্টার নায়েক, মিস্টার প্রসাদ আর তাঁর পুলিশবাহিনী পায়ে হেঁটে রওয়ানা হয়েছিল। ব্রিজ পেরিয়ে যাবার পর বুঝতে পেরেছিলাম আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি সেই হরপার্বতীর মন্দিরের টিলার দিকে। সবাই কর্নেলের নির্দেশে নিঃশব্দে গাছের ছায়ার আড়ালে সেঁটে গিয়ে টিলার নিচে বসেছিলাম। এরপর টিলার চারদিকে চারজন আর্মড কনস্টেবল রাইফেল তাক করে গুঁড়ি মেরে বসেছিল। ইতিমধ্যে শিশির পড়ে চূড়ায় ওঠার সেই পাথরের সিঁড়ি কিছুটা পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। আমরা গুঁড়ি মেরে সাবধানে টিলার বটগাছটার তলায় যখন পৌঁছুলাম তখন চারদিকে কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। প্রতিমুহূর্তে আমার ভয় হচ্ছে সেই আফগান হাউন্ডটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো?

বনে-বনে ঘুরে কুকুরটার তো বুনো হয়ে যাবার কথা। তার হিংসাও বেড়ে যাবার কথা।

মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম নেবার পর সেই গুহার দিকে গুঁড়ি মেরে আমরা নেমে গেলাম। সেই সময়েই কানে এল চাপা গলায় সুর করে কেউ কিছু আবৃত্তি করছে। নিচের চাতালে কর্নেল এবং ও.সি. প্রসাদ এক হাতে টর্চ অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে সশব্দে যেন ঝাঁপ দিলেন। পরপরই মিস্টার প্রসাদের গর্জন শোনা গেল,—যোগিন্দর! বন্দুকের দিকে হাত বাড়িও না। হাত গুঁড়ো হয়ে যাবে।

অন্য পুলিশ অফিসার, আমি এবং নায়েক পরক্ষণেই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের হাতেও গুলি ভরা রিভলবাব। দেখলাম, সেই ক্যাম্বিসের খাটে বসে একটা রুক্ষ এবং বলিষ্ঠ চেহারার লোক নিস্পলক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপরেই কর্নেল টর্চের আলো তার খাটিয়ার নিচে ফেলে বললেন, —আরে নবচন্দর যে! ওখানে ঢুকে কী করছ? বেরিয়ে এসো।

পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর এবং ও.সি. এগিয়ে গিয়ে যোগিন্দরের জামার কলার ধরে টেনে তাকে নিচে নামালেন। তার বন্দুকটা খাটে পড়ে রইল। মিস্টার নায়েক নবচন্দ্রকে ঠেলে তুলে বললেন,—এই যে যোগিন্দরের চ্যালা! কতগুলো ভেড়া এ পর্যন্ত কুকুরটাকে খাইয়েছ?

পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের ব্যাগে হ্যান্ডকাফ ছিল। যোগিন্দরের দুটো হাত পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে তিনি হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। সেইসময়েই হঠাৎ ঘুরে কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন,—সাবধান!

ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় দেখলাম কখন চুপি-চুপি একটা কালো রঙের জন্তু চাতালে ওঠার চেষ্টা করছিল। কর্নেল পরপর দুটো গুলি করলেন। ও.সি. মিস্টার প্রসাদও তাকে লক্ষ করে তিনবার গুলি ছুঁড়লেন। অবশ্য তার আগেই হিংস্র আফগান হাউন্ডটা কর্নেলের পায়ের কাছে নেতিয়ে পড়েছে। টর্চের আলোয় দেখলাম তার মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে। কালো রঙের ওপর রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার ধারাল দাঁত এবং লকলকে জিভ নিস্পন্দ।

ডাকু যোগিন্দর এবং নবকে নিয়ে গুহার উপরে উঠে মিস্টার প্রসাদ চিৎকার করে ডাকলেন,—পান্ডেজি, রোঘুয়া, হাসিন, তোমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে এসো।

চারজন আর্মড কনস্টেবলের পৌঁছতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগল। ওদের দোষ নেই, তিনশ ফুট ওঠা সামান্য ব্যাপার নয়। তাছাড়া সিঁড়িগুলো শিশিরে পিছল হয়ে আছে।

কর্নেল তাঁর পিঠে আঁটা কিটব্যাগ থেকে নাইলনের একটা শক্ত দড়ি বের করলেন। তাঁর কিটব্যাগে দরকারি সবরকমের জিনিসই থাকে। তিনি নেমে গিয়ে মৃত কুকুরটার গলায় ফাঁস বেঁধে একা টানতে-টানতে চূড়ায় উঠছিলেন। মিস্টার প্রসাদের

হুকুমে একজন কনস্টেবল কর্নেলকে এই শ্রমসাধ্য কাজ থেকে অব্যাহতি দিল। সে তাগড়াই চেহারার লোক। ডাকু যোগিন্দরের প্রিয় আফগান হাউন্ডটিকে সে অক্লেশে টানতে-টানতে চূড়ায় ওঠাল। এবার আমাদের বাংলোয় ফেরার পালা।

কিন্তু তখনও জানতাম না, আরও একটা বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কর্নেল নবচন্দ্রকে বললেন,—তোমার ঘরে আর কতগুলো ভেড়া আছে, গুণে দেখতে চাই।

মিস্টার প্রসাদ হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কর্নেলের চাপে পড়ে নবকে তার ঘরের তালা খুলতে হল। তারপর কর্নেল ঘরের ভেতর টর্চের আলো ফেলে বললেন,—মিস্টার প্রসাদ! ওই দেখুন খাটিয়ার তলায় অনেকগুলো প্যাকেট রাখা হয়েছে। ওগুলোই সম্ভবত নিষিদ্ধ মাদক।

মিস্টার প্রসাদ একটা প্যাকেট টেনে বের করে খুললেন। ভেতরের পলিথিনের আবরণ ছিঁড়ে তিনি বলে উঠলেন,—মাই গড! এ তো হেরোইন!

মিস্টার নায়েক থাপ্পড় তুলে গর্জন করলেন, —শয়তান! তুমি মালিগিরির চাকরি নিয়ে ওই ডাকুর সঙ্গে এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছ?

পিছন থেকে রামভগতের বউ বলে উঠল,—হুজুর, এই সব জিনিসের মালিক বড় সাহেব আর ছোট সাহেব।

কর্নেল বললেন,—তুমি কি মিস্টার সিনহা আর শর্মার কথা বলছো?

—হ্যাঁ হুজুর।

কর্নেল বললেন,—আমার সন্দেহ, রাকেশ শর্মা কোনও কারণে তার পার্টনার মিস্টার সিনহার উপর চটে গিয়েছিলেন। টাকাকড়ি নিয়ে বিবাদও এর কারণ হতে পারে। তাই মিস্টার সিনহার হুকুমে ডাকু যোগিন্দর তার আফগান হাউন্ডকে রাকেশ শর্মার দিকে লেলিয়ে দিয়েছিল।

রামভগতের বউ বলে উঠল,—হ্যাঁ হুজুর। আমি কাল রাতে নব আর ওই ডাকুর সঙ্গে বড় সাহেবকে চুপি-চুপি কথা বলতে দেখেছিলাম।

কর্নেল বললেন,—মিস্টার প্রসাদকে নবর লেখা একটা চিঠি এবার দেব। তবে তার আগে আফগান হাউন্ডকে একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

বাংলোর লনে জ্যোৎস্নায় কালো রঙের ভয়ংকর একটা আফগান হাউন্ডের মৃতদেহ দেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। বারান্দায় চুপচাপ বসে পড়লাম।

কোদণ্ড পাহাড়ের বা-রহস্য

হাথিয়াগড় বনবাংলো চৌকিদার ঘণ্টারাম সাবধান করে দিয়েছিল, সম্প্রতি তল্লাটে একটা মানুষখেকো বাঘের খুব উপদ্রব। কাজেই আমরা যেন সবসময় হুঁশিয়ার থাকি।

কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের পাল্লায় পড়ে বরাবর যা হয়, এবারও তাই হল। হাথিয়াগড় জঙ্গলে কোদণ্ড নামে একটা হাজার দশেক ফুট উঁচু পাহাড় আছে এবং সেই পাহাড় থেকে একটা জলপ্রপাত নেমে প্রকাণ্ড জলাশয় সৃষ্টি করে নদী হয়ে বয়ে গেছে। জলাশয়ে নাকি প্রচুর মাছ। কর্নেল ছিপ ফেলে সেই মাছ ধরবেন এবং আমাকে অসংখ্য দিব্যি কেটে বলেছিলেন, 'না ডার্লিং! পাখি-প্রজাপতি আর নয়। এবার মাছ—স্রেফ মাছই আমার লক্ষ্য। ছিপে গাঁথতে পারি বা না পারি, সেটা কোনও কথা নয়। ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। জলটাও খুব স্বচ্ছ। কাজেই বঁড়শির টোপের কাছে মাছের আনাগোনা স্পষ্ট দেখা যাবে। আসলে আমি মাছের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ইদানিং একটু মাথা ঘামাচ্ছি। কাজেই ডার্লিং...'

বিশেষ করে মনস্তত্ত্বের কচকচি শোনার চেয়ে তক্ষুনি রাজি হওয়াই ভালো। তা ছাড়া বক্তৃতা শোনার চেয়ে মানুষখেকো বাঘ-টাঘের পেটে গিয়ে লুকনো আরও ভালো।

জলাশয়টি এবং পারিপার্শ্বিক অবশ্য সত্যিই সুন্দর। যেন ছবিতে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ। অক্টোবরের বিকেলের রোদ্দুরটিও খাসা। কর্নেল ছিপ ফেলে বসে আছেন। স্বচ্ছ জলের তলায় ছোট-বড় নানা জাতের মাছের আনাগোনাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মাছগুলো বড় সেয়ানা। টোপের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু টোপে মুখ দিচ্ছে না। এদিকে আমার বাঘের ভয়। বারবার পেছনটা এবং এদিক-ওদিক দেখে নিচ্ছি। বাতাস বন্ধ। কোথাও একটুখানি শব্দ হলেই চমকে উঠছি। কর্নেলের দৃষ্টি কিন্তু ফাতনার দিকে। প্রপাতটা বেশ খানিকটা দূরে বলে জল পড়ার শব্দ অত প্রচণ্ড নয়, আবছা।

একটু পরেই গণ্ডগোল বাধাল হতচ্ছাড়া বাউন্ডুলে একটা রঙবেরঙের প্রজাপতি। কোত্থেকে উড়ে এসে ফাতনার ওপর বসল। অমনি যথারীতি প্রকৃতিবিদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। ক্যামেরাটি তাক করলেন। কিন্তু ধূর্ত প্রজাপতি বেগতিক বুঝে উড়ে গেল। তখন বাইনোকুলারে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! ছিপটা...' বলে উধাও হয়ে গেলেন। আমি ডাকতে গিয়ে চুপ করলুম। রাগে, ক্ষোভে মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না। একেই বলে, স্বভাব যায় না মলে!

কিন্তু কর্নেলের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষখেকো বাঘটার আতঙ্ক এসে আমাকে কাঠ করে ফেলল।

এমনই কাঠ সেই মুহূর্তে ছিপের হুইলে ঘর-ঘর শব্দ হল এবং শেষে বঁড়শিগেলা

শক্তিমান একটা মাছ হ্যাঁচকা টান দিল, ছিপটা আমার হাত ফসকে জলে গিয়ে পড়ল। শুধু বললুম, 'ওই যাঃ!'

অমনি বাঁদিকে ঝোপের আড়াল থেকে প্রকৃতিবিদের গলা শুনতে পেলুম। 'তোমাকে ছিপটার দায়িত্ব দিয়েছিলুম জয়ন্ত!'

ছিপটা তখন জলার মাঝখানে একবার খাড়া হচ্ছে, একবার কাত হচ্ছে। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললুম, 'সরি! কিন্তু আপনি দিব্যি করেছিলেন, পাখি-প্রজাপতির পেছনে দৌড়বেন না।'

কর্নেল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'অভ্যাস, ডার্লিং! যাই হোক, ঘণ্টারামই এখন ভরসা। তাকে ডেকে এনে দামি ছিপটা উদ্ধার করা দরকার। আশা করি, মাছটার লোভে সে....'

হঠাৎ কোথাও পরপর দুবার গুলির শব্দ শোনা গেল। কর্নেল থেমে গিয়ে কান খাঁড়া করে শুনলেন। ব্যস্তভাবে বললুম, 'কোনও শিকারি নিশ্চয় মানুষখেকো বাঘটাকে গুলি করল।'

কর্নেল বললেন, 'হুঁ', রাইফেলের গুলির শব্দ। এসো তো, ব্যাপারটা দেখা যাক।'

উনি পা বাড়ালে বললুম, 'জঙ্গলে কোথায় কোন শিকারি গুলি করল, খুঁজে বের করবেন কীভাবে?'

'কান, জয়ন্ত, কান।' কর্নেল নিজের একটা কান দেখালেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মার জঙ্গলে গেরিলাযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলুম। কোন শব্দ কোনদিকে কতদূরে হল, সেটা আঁচ করতে পারি। চলে এসো।'

ঘন জঙ্গল আর পাথরের চাঁই ছড়ানো। যেতে-যেতে প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছি, বাঘটা না মরে জখম হয়ে থাকলে দৈবাৎ তার সামনে গিয়ে পড়ি তো অবস্থা শোচনীয় হবে। তবে কর্নেল আমার আগে যাচ্ছেন, সেটাই ভরসা। জখমি বাঘ তাঁর ওপরই ঝাঁপ দেবে। ঝাঁপ দিলে আমি 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' করে পিঠটান দেবই। কোনও মানে হয়?

ক্রমশ জঙ্গল ঘন হচ্ছিল। একে তো বিকেলবেলা, তার ওপর ঘন এবং উঁচু-নিচু গাছের ছায়া আবছা আধার করে রেখেছে। কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটছেন। আমি বারবার হোঁচট খাচ্ছি। একখানে একটু খোলামেলা জায়গা, ঘাসে ঢাকা জমি। জমিটার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পাথর। পাথরের নিচের ঘাসগুলো বেশ উঁচু। তার ভেতর কী-একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। তখন কর্নেল দৌড়ে গেলেন। আমিও।

গিয়ে দেখলুম এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

রক্তাক্ত দেহে একজন মানুষ পড়ে রয়েছে। পরনে আটোসাটো শিকারির পোশাক। পায়ে হান্টিং জুতো। একপাশে রাইফেলটা ছিটকে পড়ে আছে। ফালাফালা পোশাক আর চাপচাপ রক্ত। কর্নেল তাঁর মুখের কাছে ঝুকে গেলে অতিকষ্টে বললেন, 'বা...' এবং তারপর শরীরটা বেঁকে স্থির হয়ে গেল।

কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মুখটা গম্ভীর।

উত্তেজিতভাবে বললুম, 'বা বললেন! মানে বাঘটা, কর্নেল! মানুষখেকো বাঘটা ওকে আক্রমণ করেছিল।'

কর্নেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখছিলেন। তারপর রাইফেলটা কুড়িয়ে নিলেন। চেম্বার খুলে পরীক্ষা করে দেখে আস্তে বললেন, 'অটোমেটিক রাইফেল! কিন্তু...'

কর্নেল ঘাসে-ঢাকা জমিটার ওপর হুমড়ি খেয়ে কিছুক্ষণ কী-সব দেখলেন-টেখলেন। জিগ্যেস করলুম, 'কিন্তু কী, কর্নেল?'

কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি বডি পাহারা দাও। এই রাইফেলটা নাও। সাবধান, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা অটোমেটিক। এই পাথরটা যথেষ্ট উঁচু আর নিরাপদ। তুমি পাথরটায় বসে বডি পাহারা দেবে। আমি আসছি।'

বলে রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে ব্যস্তভাবে জঙ্গলে ঢুকলেন এবং নিপাত্তা হয়ে গেলেন। কোনও আপত্তি করার সুযোগই পেলুম না। হাতে রাইফেল। তাতে কী? এই ভদ্রলোকের অবস্থাটা কী হয়েছে? শিকারের বইয়ে পড়েছি, মানুষখেকো বাঘ অতিশয় ধূর্ত।

সাবধানে উঁচু পাথরটার মাথায় চড়ে বসলুম। অদূরে পাহাড়টার কাঁধ ছুঁয়েছে সূর্য। রোদ্দুর ফিকে হয়ে আসছে। এতক্ষণে পাখ-পাখালির তুমুল কলরব শুরু হল। কর্নেল কখন ফিরবেন কে জানে! কাছাকাছি জঙ্গলের ভেতর মানুষখেকোটা কোথাও নিশ্চয় ওত পেতে আছে। শিকারটিকে কড়মড়িয়ে খেতে আসবে। তখন ধরা যাক, গুলি করলুম। কিন্তু যদি ফস্কে যায় গুলি? বাঘটা লাফ দিয়ে আমাকে...সর্বনাশ!

দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকল। জীবনে এমন সাংঘাতিক অবস্থায় কখনও পড়িনি। পাথরটার সবচেয়ে উঁচু অংশে বসে আছি। তাই নিচের রক্তাক্ত মৃতদেহ চোখে পড়ছে না। পড়লে ওই ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে আরও ভয় পেতুম।

কিন্তু কর্নেল আমাকে মড়ার পাহারায় বসিয়ে রেখে কোথায় গেলেন? বাংলো এখান থেকে অন্তত এক কিলোমিটার দূরে। চৌকিদার ঘণ্টারামকে দিয়ে হাথিয়াগড় টাউনশিপে খবর পাঠাবেন কী? কার কাছে খবর পাঠাবেন। হয়তো থানায়। তা হলে এখানে কর্নেল এবং পুলিশ এসে পৌঁছুতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে! এদিকে সঙ্গে টর্চ নেই।

এইসব দুর্ভাবনায় অস্থির হচ্ছি, এমন সময়ে সামনেকার জঙ্গল ফুঁড়ে দুজন লোক বেরুল। তারা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। একজন হিন্দিতে বলল, 'হায় রাম! বাবুজির বরাতে এই ছিল?' তারপর রক্তাক্ত দেহটির দিকে ঝুঁকে কান্নাকাটি শুরু করল।

অন্যজন বলল, 'অত করে বারণ করলুম! বাবুজি শুনলেন না। হায় হায়! এ কী হল?'

জিগ্যেস করলুম, 'আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

প্রথমজন চোখ মুছে বলল, 'হাথিয়াগড় থেকে, বাবুজি! একজন বুড়োসায়েব খবর দিলেন, আমাদের বাবুজি বাঘের পাল্লায় পড়ে মারা গেছেন।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'দেরি কোরো না! হাত লাগাও। এখানে বডি পড়ে থাকলে মানুষখেকো বাঘটা বডি খেতে আসবে। ওঠাও ওঠাও!'

প্রথমজন বলল, 'বাবুজির বন্দুক?'

বললুম, 'এই যে!'

রাইফেলটা আমার হাতে দেখামাত্র সে হাত বাড়াল। 'দিন স্যার! বাবুজির খুব শখের বন্দুক ওটা।'

এই সময় কাছাকাছি কোথাও জঙ্গলের ভেতর বাঘটা ডাকল, আ-উ-ম। তারপর চাপা গরগর গজরানিও শোনা গেল। আমি পাথর থেকে নামতেই রাইফেলটা প্রায় ছিনিয়ে নিল প্রথম লোকটা। আবার বাঘের গরগর গর্জন শুনতে পেলুম। রাইফেল বগলদাবা করে প্রথম লোকটি তাড়া দিল, বাঘটা এসে পড়েছে। বডি ওঠাও।'

দুজনেই তাগড়াই চেহারার লোক। গায়ে জোর আছে বোঝা গেল। শিকারি ভদ্রলোকের রক্তাক্ত মৃতদেহ কাঁধে তুলে ওরা ব্যস্তভাবে হাটতে শুরু করল।

আমি ওদের অনুসরণ করলুম। জঙ্গলের ভেতর ততক্ষণে আবছা আঁধার ঘনিয়েছে। ওরা লম্বা পায়ে দৌড়চ্ছে। নাগাল পাচ্ছি না। খানিকটা এগিয়ে গেছি, ডানদিকে আবার বাঘের গরগর গজরানি শুনতে পেলুম। একখানে গাছপালার ফাঁক গলিয়ে একটু ফিকে আলো এসে পড়েছে। সেখানে একটা ঝোপের ফাঁকে বাঘের মাথা দেখতে পেলুম।

অমনি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। হ্যাঁ, মাথা খারাপই বটে। নইলে কী করে গাছে চড়ে বসলুম এর ব্যাখ্যা হয় না।

গাছটা অবশ্য তত উঁচু নয় এবং কয়েকটা ডাল নিচুতে নাগালের মধ্যেই ছিল। যতটা উঁচুতে পারা যায়, উঠে গেলুম। হাত ছড়ে গেল। জামাও একটু-আধটু ফর্দাফাঁই হল। ডালে বসে নিচের দিকে লক্ষ রাখলুম, বাঘটা মড়া হাতছাড়া হওয়ার রাগে এবার আমাকেই খাওয়ার জন্য ফন্দিফিকির করছে কি না। শিকারের বইয়ে বাঘের গাছে চড়ার কথাও পড়েছি। সেটাই দুর্ভাবনার ব্যাপার।

কিন্তু বাঘটা আর গজরাচ্ছে না। হয়তো মড়াবাহী লোকদুটোকেই চুপি-চুপি অনুসরণ করেছে। এখন কথা হল, কর্নেলের কাছেই ওরা ওদের বাবুজির খবর শুনেছে, অথচ, কর্নেল ওদের সঙ্গে এলেন না কেন? সম্ভবত ওরা দৌড়ে এসেছে এবং কর্নেল তাই ওদের নাগাল পাননি। এবার যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বেন। কান খাড়া করে বসে রইলুম।

কতক্ষণ কেটে গেল। জঙ্গল অন্ধকারে ছমছম করতে থাকল। চারদিকে

নানারকমের ভুতুড়ে শব্দ। কাঠ হয়ে বসে আছি, হঠাৎ নিচের দিকে টর্চের আলোর ঝলক্‌ এবং কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম। 'এই যে! এদিকে।'

সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া দিলুম, 'কর্নেল! কর্নেল!'

নিচে থেকে আমার ওপর আলো এসে পড়ল। কর্নেল বললেন, 'তুমি গাছের ডগায় কী করছ, জয়ন্ত?' তারপর ওঁর স্বভাবসিদ্ধ হা-হা অট্টহাসি।

রাগ চেপে অতি কষ্টে গাছ থেকে নেমে বললুম, 'কোনও মানে হয়? লোকদের খবর দিয়ে এতক্ষণে এসে জিগ্যেস করছেন, গাছের ডগায় কী করছি!'

কর্নেলের সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার আর জনা-দুই কনস্টেবল এসেছেন। কর্নেল আমার কথা শুনে বললেন, 'লোকদের খবর দিয়ে মানে? যাঁদের খবর দিতে গিয়েছিলুম, তাঁরা তো আমার সঙ্গে।'

অবাক হয়ে বললুম, 'দুজন লোক বডি তুলে নিয়ে গেল! তারাই বলল...'

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বলে উঠলেন, 'মাই গুডনেস! আমারই বুদ্ধির ভুল! আমাকে নির্ঘাত বাহাত্তুরে ধরেছে, আগাগোড়া খুলে বলো তো জয়ন্ত!'

সব শোনার পর কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত এমন বোকামি করে বসবে, ভাবিনি, যাই হোক, চলুন মিঃ সিনহা। আগে ঘটনাস্থলটা দেখাই।'

পুলিশ অফিসারটির নাম মিঃ সিনহা। তিনি পা বাড়িয়ে বললেন, 'জয়ন্তবাবু বললেন, সত্যিই বাঘটাকে দেখেছেন। গজরানিও শুনেছেন! কাজেই ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে হয়ে গেল দেখছি।'

কর্নেল এদিকে-ওদিকে টর্চের আলো ফেলেছিলেন। একখানে আলো পড়তেই বাঘের মাথাটা ঝোপের ফাঁকে দেখা গেল। সবাই থমকে দাঁড়ালেন। কনস্টেবলরা বন্দুক তাক করল। কর্নেল তাদের বললেন, 'সবুর! খামোকা গুলি খরচ করে লাভ নেই।'

তারপর নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন ঝোপটার দিকে। বাঘটা আর একটুও গর্জন করছিল না। কর্নেল সোজা গিয়ে বাঘের মাথাটা খামচে ধরলেন এবং হা-হা করে হেসে উঠলেন।

মিঃ সিনহা বললেন, 'এ কী কর্নেল!'

'হ্যাঁ—একটা নিছক ডামি মুন্ডু। নকল মুন্ডু।' কর্নেল বাঘের মুন্ডুটা উপড়ে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। 'আসলে জয়ন্তকে ভয় দেখাতেই এই চালাকি করেছিল।'

বললুম, 'কিন্তু বাঘের ডাক?'

'ওটাও নকল।' কর্নেল সেই খোলা ঘাসজমিটায় পৌঁছে ফের বললেন, 'অনেক শিকারি অবিকল বাঘের ডাকের নকল করে বাঘকে আকৃষ্ট করেন। জিম করবেট বা অ্যান্ডারসনের শিকার-কাহিনিতে পড়েছি। তা ছাড়া জয়ন্ত যে অবস্থায় পড়েছিল, শেয়ালের ডাককে বাঘের ডাক বলে ভুল হতো ওর।'

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, 'আমি অত বোকা নই।'

কর্নেল বললেন, 'মজাটা এই যে নিজের বোকামি নিজেই টের পাওয়া যায় না। ডার্লিং, কেউ এসে মড়াটা দাবি করলে সেটা না হয় দেওয়া চলে, হাতের সাংঘাতিক অস্ত্র—মানে, রাইফেলটা দেওয়া যায় না।'

খোলা জায়গাটায় কিছু আলো আছে তখনও। মিঃ সিনহা ঘাসের ওপর রক্তের ছাপ টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। বললেন, 'হুঁ তলার মাটিটা নরম। কিন্তু সত্যিই বাঘের পায়ের ছাপ নেই।'

'নেই।' কর্নেল বললেন। 'সেটাই আমার সন্দেহের কারণ।'

মিঃ সিনহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বডিটা কোথায় পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলবে—এখনই ব্যবস্থা করা দরকার।'

এতক্ষণে লক্ষ করলুম, তাঁর হাতে একটা ওয়াকি-টকি রয়েছে। বেতারে চাপা গলায় থানায় মেসেজ পাঠালেন। তারপর বললেন, 'চলুন কর্নেল ফেরা যাক। আপনাদের বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে যাব।'

সামান্য দূরে জঙ্গলের একটেরে পিচের রাস্তা। সেখানে পুলিশের জিপ অপেক্ষা করছিল।...

বনবাংলোর বারান্দায় বসে কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, 'ছিপটা আর মাছটার কথা ভেবে এ রাতে আমার ঘুমের বারোটা বেজে যাবে ডার্লিং! সকালে...'

কথা কেড়ে বললুম, 'কিন্তু ওই শিকারি ভদ্রলোক পাণ্ডেজির ব্যাপারটা আমার ঘুমেরও বারোটা বাজাবে।' কর্নেল হাসলেন। 'হুঁ, ব্যাপারটা অবশ্য রহস্যময়। তবে স্রেফ তোমার বোকামির জন্যই রহস্যটা ঘনীভূত হল। তোমার হাতে একটা রাইফেল ছিল জয়ন্ত। পাঁচটা গুলির তিনটে ভরা ছিল। তুমি ওদের বডি তুলে নিয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারতে—যতক্ষণ না আমি পৌঁছুচ্ছি!'

'কিন্তু আপনি কোনও আভাস দিয়ে যাননি!'

'ঘটনার আকস্মিকতায়, ডার্লিং!' কর্নেল সাদা দাড়ি চুলকে বললেন। 'দুবার গুলির শব্দ। তারপর পান্ডেজি বা বলেই শেষ-নিশ্বাস ফেললেন। বাঘের কথাই ভাবা সে-মুহূর্তে স্বাভাবিক। তারপর মনে হল, গুলি-খাওয়া বাঘ শিকারির ওপর ঝাঁপ দিলেও গর্জন করবে ক্রমাগত। অথচ গর্জনের শব্দ শুনিনি তো! তখনই প্রথম সন্দেহ জাগল। এটা কোনও হত্যাকাণ্ড নয় তো? সম্ভবত আমাদের হঠাৎ গিয়ে পড়ায় খুনিরা গা ঢাকা দিয়েছে। তা ছাড়া ঘাসের তলায় বাঘের পায়ের ছাপ নেই!'

'পাণ্ডেজি ভদ্রলোক কে?'

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন! তারপর অভ্যাসমতো চোখ বুজে বললেন, 'শিবচরণ পাণ্ডে হাথিয়াগড়ের বনেদি বংশের মানুষ। শিকারে প্রচণ্ড নেশা ছিল। আমার একজন পুরোনো বন্ধুও বলতে পার ওঁকে।' তারপর চোখ খুলে চাপাস্বরে বললেন ফের, আসলে পাণ্ডেজির চিঠি পেয়েই এবার আমার এখানে আসা এবং প্রপাতের জলায় মাছ ধরতে যাওয়া।'

চমকে উঠে বললুম, 'কী চিঠি?'

. গোয়েন্দাপ্রবর জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করে দিলেন। চিঠিটা পড়ে আরও অবাক হয়ে গেলুম। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটার বাংলা করলে এই দাঁড়ায় ঃ

'প্রিয় কর্নেল,

সম্প্রতি হাথিয়াগড় এলাকায় একটা ধূর্ত মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। মানুষখেকো বাঘ ধূর্ত হয়। কিন্তু এ বাঘটা এমনই ধূর্ত যে, তার মানুষ মারার খবরই শুধু শুনি। কিন্তু মড়ার পাত্তা পাই না। খুব খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এটা কোনও ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপারটা হল ঃ কোদণ্ড পাহাড়ের জলপ্রপাতের নিচে যে জলটা আছে, সেখানে বাঘটা জল খেতে আসবে ভেবে পরপর তিনটে রাত ওত পেতে ছিলুম। প্রতি রাতেই একটা অদ্ভুত জিনিস দেখছি। প্রপাতের দিকটাতে একটা উঁচু পাথর জল থেকে মাথা তুলেছে সেটা দেখতে কাছিমের খোলের মতো। ওখানে হঠাৎ একটা আলো জ্বলে ওঠে। আলোটা কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে। তারপর নিভে যায়। এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় সব দেখতে পাই। প্রথমে আলোটা জ্বলে তারপর দেখি, একটি ছোট্ট নৌকো এগিয়ে চলেছে আলোটার দিকে। প্রথম দুটো রাত ভেবেছিলুম জেলে-নৌকো মাছ ধরছে। কিন্তু মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব চলছে। কাদের এত সাহস হতে পারে? তৃতীয় রাতে জোরাল টর্চের আলো ফেলে নৌকোর লোকগুলোকে ডাকলুম। অমনি ওরা নৌকো অন্যদিকে ঘুরিয়ে দক্ষিণপাড়ে চলে গেল। অনেকটা ঘুরে পিচ রাস্তার ব্রিজ হয়ে সেখানে গেলুম। নৌকোটা বাঁধা আছে। লোক নেই। ব্যাপারটা রহস্যময়। সকালে আবার গেলুম সেখানে। নৌকোটা নেই। আমি এর মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে রহস্যটা ফাঁস করে যান। শুভেচ্ছা রইল।

শিবচরণ পাণ্ডে

চিঠিটা ফেরত দিয়ে বললুম, 'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি বটে!'

'হুঁ, রহস্য।' কর্নেল দাড়ি নেড়ে সায় দিলেন এবং চওড়া টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমার কী মনে হয়, শুনি জয়ন্ত!'

একটু হেসে বললুম, 'আমি তো বোকা।'

'না না। বোকারা গাছে চড়তে পারলেই বুদ্ধি খোলে—চীনা প্রবাদ। তুমি গাছে চড়তে পেরেছ, ডার্লিং!'

কথার ভঙ্গিতে আরও হাসি পেল। বললুম, 'তা ঠিক। তারপর থেকে আমার মাথা সত্যি খুলে গেছে। এখন বুঝতে পারছি, ওই জলায় কেউ বা কারা গোপনীয় কিছু করছে এবং পাণ্ডেজি সেটা দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে মেরে ফেলা হল।

আমরা গিয়ে না পড়লে—সরি, আপনি গিয়ে না পড়লে ওটা মানুষ-খেকো বাঘের হাতে মৃত্যু বলে চালানো সোজা ছিল।'

'বাঃ! অপূর্ব! খাসা বলেছ ডার্লিং!' বৃদ্ধ ঘুঘুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রশংসায় খুশি হয়ে বললুম, 'মানুষখেকো বাঘের ব্যাপারটাও রটনা বলে মনে হচ্ছে। যাতে জঙ্গলে লোকেরা না ঢোকে।'

কর্নেল সায় দিলেন। 'ঠিক, ঠিক!' বিশেষ করে ওই জলায় জেলেরা মাছ ধরতে যায়। তারাও বাঘের ভয়ে যাতায়াত বন্ধ করেছে। যাই হোক, সকাল ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। তবে সত্যি জয়ন্ত, আমার ছিপটাও খুব দামি। আর মাছটাও নিশ্চয় বড়। দেখা যাক, ঘণ্টারাম মাছটার লোভে আমার ছিপটা উদ্ধার করে দেয় নাকি। ঘণ্টারাম! ঘণ্টারাম! ইধার আও তুম!'

কর্নেল ঘণ্টারামকে ডাকতে থাকলেন। ঘণ্টারামের সাড়া পাওয়া গেল কিচেন থেকে। সেই রাতের খাবার তৈরি করছিল। এই সময় হঠাৎ কর্নেল মুচকি হেসে চাপা গলায় বললেন, 'কিন্তু জয়ন্ত, তোমার থিওরিতে একটা খটকা থেকে যাচ্ছে। পাণ্ডেজির শেষ কথাটি "বা...।" এ সম্পর্কে তোমার কী বক্তব্য?'

এবার একটু ঘাবড়ে গেলুম। বললুম, 'বা-রহস্য সত্যিই গোলমেলে। ওকে যদি মানুষেই হত্যা করে থাকে, 'বা...' মানে, বাঘ বলতে চাইলেন কেন?' বলেই ফের বুদ্ধি খুলে গেল। উত্তেজিতভাবে বললুম, 'হ্যাঁ—বুঝেছি। পাণ্ডেজি এই নকল বাঘের মুণ্ডটা ঝোপের ফাঁকে দেখেছিলেন। মুন্ডুটা...'

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মুন্ডুটা প্লাস্টিকে তৈরি খেলনার মুখোশ। তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ ডার্লিং! এই নকল মুন্ডু সম্পর্কেই হয়তো পাণ্ডেজির কিছু বক্তব্য ছিল। মৃত্যু সেই কথাটি শেষ করতে দেয়নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা 'বা...রহস্যে' আটকে যাচ্ছে দেখছি। নকল বাঘের মুন্ডুর কথাই বা বলতে গেলেন কেন পাণ্ডেজি?'

এতক্ষণে ঘণ্টারাম সেলাম দিয়ে ঘরে ঢুকল। কর্নেল বললেন, 'এসো ঘণ্টারাম। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।'

ঘণ্টারাম বিনীতভাবে বলল, 'বোলিয়ে কর্নেলসাব।' তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।....

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। ভোরের দিকেই বোধহয় ঘুমটা আমাকে বাগে পেয়েছিল। কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, 'নটা বাজে। উঠে পড়ো ডার্লিং!'

একটু অবাক লাগল। কর্নেলের প্রাতঃভ্রমণে বেরুনোর অভ্যাস আছে জানি। কিন্তু বরাবর সবখানেই সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ করে এসে আমাকে ঘুম থেকে ওঠান। অথচ আজ সকালে নটা অবধি বাইরে ছিলেন।

তারপরই মনে পড়ে গেল ছিপ উদ্ধারের পরিকল্পনাটা। তাহলে ঘণ্টারামকে নিয়ে প্রপাতের জলায় ছিপ উদ্ধারে গিয়েছিলেন। তাই এত দেরি? বললাম, 'ছিপটা পেলেন?'

কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললেন, 'নাঃ! ঘণ্টারামের ধারণা, ছিপসুদ্ধু মাছটা জলার দক্ষিণে স্রোতের দিকটায় চলে গিয়েছিল। এতক্ষণ কয়েক মাইল দূরে চলে গেছে নদীর ধারে কোনও আদিবাসী বসতির কাছে গিয়ে পড়লে তাদের পেটে মাছটা হজম হয়ে গেছে। অবশ্য ছিপটা উদ্ধার করা যায়। দেখা যাক।' বলে ইজিচেয়ারে বসলেন। চোখ বন্ধ। দাড়িতে আঙুলের চিরুনি কাটতে থাকলেন।

বাথরুম সেরে এসে দেখি, টেবিলে ব্রেকফাস্ট রেডি। ঘণ্টারামকে আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে! সে চলে গেলে বললুম, 'আপনি খুব মুষড়ে পড়ছেন দেখছি। কিন্তু ঘণ্টারামের মুখটা বড় বেশি তুম্বো হওয়ার কারণ আশা করি মাছ না পাওয়ার ব্যর্থতা নয়?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ জয়ন্ত!' বৃদ্ধ ঘুঘু মিটিমিটি হাসতে থাকলেন। 'বেচারাকে সাতসকালে বঁড়শি- বেঁধা মাছের বদলে একটা মড়া ঘাঁটতে হয়েছে। তার ওপর ওর বউ ওকে মড়া ঘাঁটার জন্য আবার একদফা স্নান করিয়েছে।'

চমকে উঠে বললুম 'মড়া?'

'পাণ্ডেজির ডেডবডি।' কর্নেল টোস্টে কামড় দিয়ে বললেন, 'পুলিশ অফিসার মিঃ সিনহা খুব জেদি মানুষ। পুরো পুলিশবাহিনী এবং বন দফতরের সব ক'জন রক্ষী , মায় রেঞ্জার সাহেবকেও লড়িয়ে দিয়েছিলেন। তল্লাটের বনজঙ্গল শ্মশান-মশান সারারাত চষা হয়েছে। বেগতিক দেখে খুনিরা পাণ্ডেজির বডি ওই জলার তলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে রেখেছিল। ঘণ্টারাম সেটা উদ্ধার করেছে। সে মোটা বখশিশ পাবে সরকার থেকে! কিন্তু...'

কর্নেল খাওয়ায় মন দিলেন। বললুম, 'কিন্তু কী?'

'ওই বা...।'

চুপ করে গেলুম। বা-রহস্য সত্যিই নির্ভেজাল রহস্য। এই সময় দরজা দিয়ে চোখে পড়ল, বাংলোর লনে ঘণ্টারামের হামাগুড়ি দেওয়া বাচ্চা সেই নকল বাঘের মুন্ডুটা নিয়ে খেলছে। তার মা এসে বাচ্চাটাকে বকাবকি করে কোলে তুলে নিল এবং মুন্ডুটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বুঝলাম, ঘণ্টারামের বউ ওটাকে অলুক্ষুণে ভেবেছে। কিন্তু মুন্ডুটা কর্নেল কি বাচ্চাটাকে উপহার দিয়েছিলেন?

প্রখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবর কীভাবে সেটা আঁচ করে বললেন, 'ঘণ্টারামের বউ খুব ভয় পেয়ে গেছে, জয়ন্ত! ওর ধারণা জীবজন্তুর নকল মুন্ডু বানানো ঠিক নয়। এতে তাদের ঠাট্টা করা হয়। তার ওপর মানুষখেকো বাঘ। তার নকল মুন্ডু! মানুষখেকো বাঘটা রেগে আগুন হয়ে গেছে এতে।'

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। একটু পরে কফিতে মন দিলেন, ওঁর প্রিয় পানীয়।

বললুম, 'জলার সেই কাছিমের খোলের মতো পাথরটা পুলিশ পরীক্ষা করল না? ওখানেই তো পাণ্ডেজি আলো দেখেছিলেন।'

'নিরেট পাথর।' কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন।

'নৌকো নিয়ে ওখানে গিয়েছিলুম। তা ছাড়া পাথরটা বেজায় পিছল। শ্যাওলা জমে আছে। ওঠা কঠিন। উঠলেও দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। মিঃ সিনহা পা হড়কে জলে পড়ে গেলেন। পুলিশের উর্দি, রিভলবার সব ভিজে কেলেঙ্কারি।'

একটু ভেবে বললুম, 'তা হলে আলোটা অন্য কোথাও দেখে থাকবেন পাণ্ডেজি। দূর থেকে দেখা ভুল হতেই পারে।'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'চলো, বেরুনো যাক।'

'ছিপ উদ্ধারে নাকি?'

'ঘণ্টারামকে সে-দায়িত্ব দিয়েছি। আমরা কোদণ্ড পাহাড়ে জলপ্রপাতের মাথায় উঠব, ডার্লিং! একটু কষ্টকর। তবে তোমার তো মাউন্টেনিয়ারিঙে ট্রেনিং নেওয়া আছে। এসো, বেরিয়ে পড়ি...!'

এই খেয়ালি বুড়োর পাল্লায় পড়ে অনেকবার ভুগেছি। কিন্তু সে-কথা বলতে গেলেই উনি আমার মাথার ঘিলুর দিকে আঙুল তুলবেন। সবই নাকি আমারই বোকামির ফল। কাজেই কথা না বাড়ানোই ভালো। তবে এবারকার কোদণ্ড পর্বতারোহণ মন্দ লাগছিল না। প্রপাতটা শুধু সুন্দর নয়, যেন একটা প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রাও। তাছাড়া দুধারে বৃক্ষলতা এবং রঙবেরঙের ফুলে সাজানো।

ফুল থাকলে প্রজাপতি থাকবে এবং গাছ থাকলে পাখি। প্রকৃতিবিদ প্রপাতের মাথায় চড়তে-চড়তে প্রচুর ছবি তুললেন। বাইনোকুলার চোখে রেখে কতবার থেমে পড়লেন। আমি যখন মাথায় পৌঁছে গেছি তখন উনি ফুট বিশেক নিচে একটা পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করেছেন। ওপরে আসলে একটা নদী। নদীটা এখানে এসে নিচে ঝাঁপ দিয়ে প্রপাত সৃষ্টি করেছে। গনগনে রোদ্দুর। তাতে পাহাড়ে চড়ার পরিশ্রম। হাঁপ ধরে গেছে! একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম। যেখানে পাথর মাটি মিশে আছে। ঘন জঙ্গল। দূরে উত্তরে বনবাংলোটি দেখা যাচ্ছিল। ক্লান্তভাবে গাছের নিচে পাথরটাতে বসেছি, অমনি পেছন ঝোপে মচমচ শব্দ হল। ঘুরে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে দুটো লোক বাঘের মতো আমার ওপর এসে পড়ল এবং মুখে টেপ সেঁটে দিল। চ্যাচানোর সুযোগই পেলুম না। কাল বিকেলে দেখা সেই লোকদুটোই বটে।

একজন একটা ছুরি গলায় ঠেকিয়েছিল। কাজেই হাত-পা নড়ানো বা ধস্তাধস্তির উপায় নেই। গলায় ছুরি ঢুকে যাবে।

তারপর আমার চোখে রুমাল পড়ল এবং টের পেলুম আমি ওদের কাঁধে। কাল বিকেলে পাণ্ডেজির মড়া যেভাবে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেভাবেই আমাকেই নিয়ে চলল ওরা।

কতক্ষণ পরে কাঁধ থেকে আমাকে নামিয়ে বসিয়ে দিল। তারপর চোখ থেকে

রুমাল খুলে নিল। মুখের টেপটা কিন্তু খুলল না। জায়গাটা প্রথম কিছুক্ষণ অন্ধকার মনে হচ্ছিল। একটু পরে দৃষ্টি পরিষ্কার হল। তখন দেখলুম, এটা একটা মন্দির। ফাটল-ধরা এবং পোড়ো মন্দির। দেয়াল ফুঁড়ে শেকড়বাকর বেরিয়েছে। সামনে বেদীর ওপর শিবলিঙ্গ। বেদির একপাশে একজন গাব্দাগোব্দা ষণ্ডামার্কা চেহারার লোক পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পেল্লায় গোঁফ। কুতকুতে চোখে ক্রুর হাসি। সে খৈনি ডলছিল। খৈনিটা দুই স্যাঙাতকে বিলি করে বাকিটুকু নিজের মুখে ঢোকাল। তারপর হিন্দিতে বলল, 'টেপ খুলে দে। কথা বের করি।'

হ্যাঁচকা টানে আমার মুখের টেপ খুলল একজন। যন্ত্রণায় আঃ করে উঠলুম। বেদির লোকটা বলল, 'এই ছোট টিকটিকি! পাণ্ডে ব্যাটাচ্ছেলে মরার সময় কী বলেছে?'

ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'বা—'

'চো-ও-প্!' বলে সে পাশ থেকে একটা জিনিস তুলে দেখাল। জিনিসটা অবিকল মানুষের হাতের গড়ন। কিন্তু পাঁচটা আঙুল নখের মতো বাঁকা এবং ধারালো। 'দেখেছিস এটা কী? এর নাম বাঘনখ। পাণ্ডের মতো ফালাফালা করে ফেলব। কলজে উপড়ে নেব। সত্যি কথা বল!'

মিনতি করে বললুম, 'বিশ্বাস করুন! পাণ্ডেজি শুধু 'বা' বলেই মারা যান।'

'শুধু বা! আর কিছু নয়?' বলে সে বাঘনখটা উঁচিয়ে ধরল। আঁতকে উঠে বললুম, 'বিশ্বাস করুন। শুধু বা!'

লোকটা তার স্যাঙাত দুজনকে বলল, 'তোমরা এবার বুড়ো টিকটিকিটাকে ধরে নিয়ে এসো। বেগড়বাঁই করলে ছুঁড়ে প্রপাতের তলায় ফেলে দেবে।'

ওরা তখুনি বেরিয়ে গেল। কর্নেলের জন্য আঁতকে কাঠ হয়ে রইলুম। চোখে বাইনোকুলার রাখলে ওঁর আর কোনও দিকে মন থাকে না। সেটাই ভাববার কথা।

লোকটা বলল, 'এই উল্লুক! 'বা' মানে কী বুঝেছিস?'

'আজ্ঞে, বা মানে বাঘ।'

'আর ওই দাড়িওলা বুড়ো বুঝেছে?'

'সেটা ওঁর মুখেই শুনবেন। আমাকে তো উনি খুলে কিছু বলেননি।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বড্ড দেরি করছে। হলটা কী? একটা বাহাত্তুরে বুড়োকে ধরে আনতে এতক্ষণ লাগছে!' বলে সে মন্দিরের দরজার কাছে গেল। তারপর আপনমনে গজগজ করতে থাকল।

এই সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। গায়ের জোরে ওর সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। তাই নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে বেদি থেকে বাঘনখটা তুলে নিলাম।

কিন্তু লোকটা কীভাবে যেন টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আমার হাতে ওটা দেখেই পকেট থেকে ছুরি বের করল। আমার হাতে বাঘনখ ওর হাতে ছুরি। পরস্পর পরস্পরকে তাক করছি এবং দুজনের মুখ থেকেই হুমহাম গর্জন বেরুচ্ছে। দুজনে বেদি চক্কর দিচ্ছি। আমি মরিয়া, সেও মরিয়া।

হঠাৎ সেই সময় শিবলিঙ্গটা নড়তে শুরু করল। তারপর একপাশে কাত হয়ে পড়ল এবং আমাদের দুজনকেই হকচকিয়ে দিয়ে একটা মুন্ডু বেরুল।

মুন্ডুটিতে টুপি এবং সাদা দাড়ি। সেটি প্রখ্যাত ঘুঘুবুড়ো কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের।

নাকি স্বপ্ন দেখছি?

উঁহু, স্বপ্ন নয়। এক লাফে কর্নেল বেদি ফুঁড়ে বেরিয়ে রিভলভার তাক করলেন লোকটার দিকে। সে ছুরি ফেলে দিয়ে দুহাত ওপরে ওঠাল এবং দেয়ালে সেঁটে গেল। কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। মন্দিরের ভেতর যেন বাজপড়ার শব্দ। বললেন, 'কী বাবুরাম! কেমন জব্দ। সাবাস জয়ন্ত! ব্রাভো! এই তো চাই।'

বাইরে ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল। পুলিশ অফিসার মিঃ সিনহাকে আসতে দেখলুম। সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল। তারা এই বাবুরামের দুই স্যাঙাতের হাতে-হাতে দড়ি এবং সেই দড়ি কোমরেও পরিয়ে টেনে আনছে। যেন এই শিবমন্দিরে জোড়াপাঁঠা বলির জন্য আনা হচ্ছে।

কর্নেল ডাকলেন, 'ভেতরে আসুন মিঃ সিনহা। স্বয়ং বা-বাবাজি ধরা পড়েছে।'

মিঃ সিনহা ঢুকেই দৃশ্যটা দেখে একচোট হাসলেন। দুজন কনস্টেবল বাবুরামের হাতে হাতকড়া এঁটে দিল। মিঃ সিনহা এবার ওলটানো শিবলিঙ্গ দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী!'

কর্নেল বললেন, 'ওখান দিয়ে আমার আবির্ভাব ঘটেছে। একটু দেরি হলেই রক্তারক্তি হয়ে যেত। আসলে ওটা একটা সুড়ঙ্গ পথ।'

মিঃ সিনহা উঁকি মেরে দেখে বললেন, 'কী আশ্চর্য!'

কর্নেল বললেন, 'প্রপাতের একধারে দাঁড়িয়ে পাথরের আড়ালে একটা ফোকর আবিষ্কার করেছিলুম। ঢুকে দেখি এটাই সেই সুড়ঙ্গপথ। ধাপে-ধাপে কোদণ্ডদেবের মন্দিরে উঠে এসেছে। হ্যাঁ, আসল কথাটা বলা দরকার। ঘণ্টারামই বলেছিল এই মন্দিরের তলায় নাকি একটা সুড়ঙ্গপথ আছে। সেখানে তার মাসতুতো ভাই দাগি ফেরারি আসামি এই বাবুরাম লুকিয়ে থাকে বলে তার ধারণা। ঘণ্টারাম খুব নীতিবাগীশ লোক। তাকে সরকার থেকে পুরস্কার পাইয়ে দেবেন মিঃ সিনহা। তবে আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। কথামতো আপনি দলবল নিয়ে এখানে না এসে পড়লে জয়ন্ত বেচারাও...'

রেগেমেগে বললুম, 'বাঘনখ দিয়ে বাবুরামকেও 'বা' বলিয়ে ছাড়তুম।

কর্নেল হাসলেন। 'খুনের দায়ে পড়তে ডার্লিং। যাই হোক, মিঃ সিনহা, মন্দিরের তলায় একটা কুঠুরিতে পাণ্ডেজির রাইফেল আর প্রচুর ডাকাতির মাল মজুত রয়েছে। আসামিদের থানায় পাঠিয়ে দিন। আর আপনার হাতের ওয়াকি-টকিতে মেসেজ পাঠান। জিনিসগুলো উদ্ধার করা দরকার।'

বলে আমার হাত থেকে বাঘনখটি নিয়ে কর্নেল মিঃ সিনহাকে দিলেন এবং

আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলো ডার্লিং! খুব ধকল গেছে তোমার বাংলোয় ফেরা যাক।'

সেই গাছটার কাছে এসে বললুম, 'বা-রহস্য ফাঁস হল। কিন্তু আলো-রহস্য?'

কর্নেল বললেন, 'তখন আমাকে নিচে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে, ওখান থেকেই টর্চের আলো দেখাত বাবুরাম। তখন ওর দলের লোকেরা ডাকাতি-করা মাল নৌকোয় নিয়ে আসত। আসলে কোদণ্ডমন্দিরের পেছনে আদিবাসী জেলেদের একটা বসতি আছে। তারা প্রপাতের নিচের জলায় রাতবিরেতে জাল ফেলে মাছ ধরতে যেত। মানুষখেকো বাঘের ভয়ের চেয়ে পেটে খিদে নামক রাক্ষসের ভয় বেশি জয়ন্ত! বেচারারা এত গরিব যে নৌকো কেনার ক্ষমতা নেই। তো ওরা মাছ ধরে পাহাড়ি পথে বসতিতে ফিরে গেলে তখন বাবুরাম আলোর সংকেত করত।'

বললুম, 'তাহলে পাণ্ডেজি পরে টের পেয়েছিলেন বাবুরাম ডাকুরই কীর্তি! তাই...'

'হ্যাঁ'। বলে হঠাৎ কর্নেল বাইনোকুলার চোখে তুললেন এবং ঝোপঝাড় ভেঙে অদৃশ্য হলেন।

বুঝলুম, সেই সাংঘাতিক গাছটার তলায় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওঁর অপেক্ষা করতে হবে! তবে আর হামলার ভয়টা নেই। অতএব সেই সুন্দর পাথরটাতে বসে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করায় বাধা নেই।...

টুপি রহস্য

নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গিয়েছিলুম। কর্নেল বৃদ্ধ মানুষ। মাথায় টাক ও মুখে দাড়ি আছে! একেবারে সায়েবদের মতো চেহারা। ভারি অমায়িক আর হাসিখুশি মানুষ। একা থাকো।

কিন্তু বুড়ো হলে কী হবে।

এখনও ওর গায়ে পালোয়ানের মতো জোর! দৌড়ে পাহাড়ে চড়তে পারেন। বাঁ-হাতে রাইফেল ছুঁড়ে বাঘ মারতে পারেন। পারেন না কী, তাই-ই বলা কঠিন। সারা জীবন নানা দেশে বিদঘুটে অ্যাডভেঞ্চারে গেছেন—জঙ্গলে, সমুদ্রে, দ্বীপে, বরফের দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আফ্রিকা আর বর্মা ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছেন। অবসর নেওয়ার পর ওঁর হবি হচ্ছে দুর্লভ জাতের পাখি, পোকামাকড় ও প্রজাপতি খুঁজে বেড়ানো। এজন্যে প্রায়ই উনি পাহাড়ে-জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গী বলতে আমি—এই জয়ন্ত চৌধুরি। আমার মতো একজন যুবকের সঙ্গে ওই বুড়োর গলাগলি ভাব যে কতটা, না দেখলে বিশ্বাস হবে না কারও।

এই কর্নেল বুড়োর আর এক বাতিক গোয়েন্দাগিরি। অনেক বড়-বড় ডাকাতি আর খুনের হিল্লে করে বিস্তর খ্যাতি কুড়িয়েছেন। শুধু পুলিশ মহলেই নয়, সবখানেই ওঁর নামটা বিলক্ষণ চেনা। কেউ যদি বলে 'বুড়ো ঘুঘু' তাহলে বুঝতে হবে সে নির্ঘাত কর্নেলের কথাই বলছে।

সেই রোববারের সকালে ওঁর বাসায় গেলুম, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্যও ছিল। আমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার। আমাদের কাগজেই একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছিল। জানতুম, অদ্ভুত যা-কিছু—তাতেই কর্নেলের কৌতূহল। উনি নাক না গলিয়ে থাকতে পারবেন না। আর এই খবরটা শুধু অদ্ভুত নয়, রীতিমতো অবিশ্বাস্য।

তো আমাকে দেখেই বুড়ো হাসতে-হাসতে বললেন,—এসো জয়ন্ত, এখুনি তোমার কথা ভাবছিলুম। নিশ্চয়ই তুমি সেই ভুতুড়ে টুপির ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছ।

বললুম,—ভুতুড়ে টুপি, না জ্যান্ত টুপি?

এই কথা। —বলে কর্নেল খবরের কাগজ খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন,—ব্যাপারটা বেশ মজার, তাই না জয়ন্ত? চোঙার মতো ছুঁচলো ডগাওয়ালা এই ধরনের টুপি খ্রিস্টমাসের পরবে পরা হয়! আবার সার্কাসের ক্লাউনরাও এমন টুপি পরে ভাঁড়ামি করে। সেই টুপি কিনা ইচ্ছামতো চলে বেড়ায়, লাফায়, নাচে। বিছানায় ঘুমোয়। খাবার টেবিলে গিয়ে খেতে বসে। ইজিচেয়ারে আরামে গড়ায়। খাসা! ভাবাই যায় না। টুপির মালিক যে ঘাবড়ে যাবেন তাতে আর সন্দেহ কী!

বললুম,—শুধু তাই নয় কর্নেল! বাগানে গিয়ে গোলাপ গাছে চড়ে চমৎকার দোল খায় ব্যাটা।

কর্নেল খুব হাসলেন। তারপর বললেন,—বসো। এখুনি টুপির মালিক মিঃ গজেন্দ্র কিশোর সিংহরায় এসে পড়বেন! একটু আগেই আমায় ফোন করেছিলেন।

কর্নেলের পরিচারিকা মিস অ্যারাথুন একটা ট্রেতে কফি রেখে গেল। কফির পেয়ালার সবে মুখ দিয়েছি, দরজায় ঘণ্টা বাজল। তারপর এক প্রকাণ্ড দশাসই চেহারার স্যুট পরা ভদ্রলোক ঢুকলেন। ওঁর হাতে একটা কিট ব্যাগ। আমাকে নমস্কার করলেন, আর কর্নেলের সঙ্গে করলেন হ্যান্ডশেক। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্নেল। সোফায় গম্ভীর মুখে উনি বসলে কর্নেল বললেন,—মিঃ সিংহরায়, বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?

সিংহরায় বললেন,—আপনাকে ফোনে তো সবই বলেছি, কর্নেল। নতুন করে কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা আজ তিনদিন ধরে সত্যি ঘটছে। খবরের কাগজে তো দূরের কথা, বাড়ির কাউকেই আমি বলিনি। অথচ কীভাবে ফাঁস হয়ে গেল, কে জানে! খবরের কাগজেই বা কে খবরটা দিল কিছুই বুঝতে পারছি নেই। সে জন্যেই আপনার সাহায্য চাইছি।

কর্নেল মুখ খোলার আগে আমি অবাক হয়ে বললুম,—খবরটা নিশ্চয়ই কোনও রিপোর্টারকে কেউ দিয়েছে। না দিলে কাগজে বেরোতেই পারে না।

সিংহরায় উদ্বিগ্ন মুখে বললেন,—সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে কী ভাবছিলেন। বললেন,—হুম। কিন্তু টুপিটা সে ওইসব অদ্ভুত কাণ্ড করছে তা তো সত্যি!

সিংহরায় জবাব দিলেন,—একেবারে হুবহু সত্যি। টুপিটা কিনেছি গত বিষ্যুৎবার চৌরঙ্গীর একটা নিলামের দোকানে। অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখা আমার বাতিক। টুপিটা দেখতে অদ্ভুত লাগল! পঁচিশ টাকা থেকে দর হাঁকাহাকি শুরু হল। তিরিশে উঠেই অন্যরা ছেড়ে দিল। শুধু একজন...

—হুম! বলুন।

—একজন অবাঙালি ভদ্রলোক ছাড়ল না। দর চড়াতে থাকল। তাই আমারও জেদ চড়ে গেল। শেষ অবধি রোখের মাথায় তেরো হাজার টাকা হাঁকলুম। তখন লোকটা সরে গেল, টুপি নিয়ে বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরলুম এবং তারপর সন্ধেবেলা থেকেই টুপি খেলা দেখানো শুরু করল। ড্রয়িংরুমের কোণায় একটা টেবিলে ওটা রেখেছিলুম। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ দেখি টুপিটা টেবিলের ওপর চলতে-চলতে নিচে পড়ে গেল। তখনও সন্দেহ হয়নি। ওটা সেখানেই তুলে রেখে ওপরের ঘরে গেছি। খাওয়া-দাওয়া করেছি। শুতে গিয়ে দেখি, আশ্চর্য! টুপিটা বিছানায় শুয়ে আছে। বাড়ির সবাইকে জিগ্যেস করলুম, কেউ কিছু জানে না। সবচেয়ে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল শুক্রবার রাতে। টুপিটা শোবার ঘরেই রেখেছিলুম। রাত দুটোয় ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে খসুখস শব্দ শুনে সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্প জ্বালালুম। দেখি, টুপিটা মেঝেতে দিব্যি হাঁটছে। হাঁটতে-হাঁটতে জানলার দিকে যাচ্ছে।

তারপর চোখের সামনে সেটা জানলা গলিয়ে লাফ দিল। বিশ্বাস করুন কর্নেল যা বলছি, এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই।

—হুম! বলুন, বলুন!

মিঃ সিংহরায়ের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। একটু দম দিয়ে বললেন,—তখুনি টর্চ আর পিস্তল নিয়ে নিচে গেলুম। দেখলুম, টুপিটা বোগেনভেলিয়ার গাছে কাত হয়ে যেন ঘুমোচ্ছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল গত রাতে। টুপিটা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। একটা গোলাপগাছে চড়ে বসেছে। আজ ভোরবেলা মালি দেখতে পেয়ে...

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন,—বুঝেছি। টুপিটা কি এনেছেন?

—এনেছি! এই বিদঘুটে জিনিস আর কাছে রাখতে একটুও ইচ্ছে নেই কর্নেল। বলে সিংহরায় কিটব্যাগ খুলে একটা চোঙার মতো টুপি বের করলেন! প্রকাণ্ড টুপি। কালো রং ছুঁচলো ডগায় একটা রেশমি টুপি আছে। দুপাশে দুটো দুষ্টুহাসি ভরা মুখ, এক দিকেরটা ছেলের, অন্য দিকেরটা মেয়ের। আমার নাকে কড়া গন্ধ লাগল। নিশ্চয়ই টুপির গন্ধ।

কর্নেল টুপিটা নিয়ে পরীক্ষা করতে-করতে বললেন,—হুম, বেশ ওজন আছে দেখছি। শক্ত সমর্থ মাথা না হলে ঘাড় ব্যথা করবে। কিন্তু এ টুপি তো প্রশান্ত মহাসাগরের মাকাসিকো দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা পরে। বুনো বেড়ালজাতীয় জন্তুর চামড়ায় তৈরি।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—কর্নেল, কর্নেল! গত বছর মাকাসিকোতে রাজাকে হটিয়ে এক সেনাপতি সিংহাসন দখল করেছিল না? রাজা অনুহিটিকি পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। খুব খুনোখুনি আর লুটপাট হয়েছিল রাজপ্রাসাদে।

কর্নেল আবার দিকে তাকিয়ে বললেন,—অপূর্ব জয়ন্ত, অপূর্ব! তাই-ই তো বটে। হাজার হলেও তুমি খবরের কাগজের লোক! ইয়ে মিঃ সিংহরায়, তাহলে টুপিটা আমার কাছে আপাতত থাক! আপত্তি আছে?

সিংহরায় যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। বললেন,—মোটেও না। বরং বেঁচে গেলুম কর্নেল। বাপস, এখনও আমার বুক ঢিপঢিপ করছে! ওই ভুতুড়ে টুপি এবার হয়তো গলা টিপে মেরেই ফেলবে মশাই।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে আমি সন্ধ্যার দিকে আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। জয়ন্তও যাবে আমার সঙ্গে। কেমন।

সিংহরায় মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

কথামতো সাড়ে পাঁচটায় আবার কর্নেলের ফ্ল্যাটে গেলুম। দেখি, আমারই অপেক্ষা করছেন উনি। একটু হেসে বললুম,—টুপিটা নিশ্চয়ই আপনাকে খুব জ্বালিয়েছে কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন,—না জয়ন্ত। এবং সেটাই আশ্চর্য!

—কেন, কেন?

—টুপি যদি সত্যি ভুতুড়ে হবে, তাহলে সবখানেই ভুতুড়ে কাণ্ড করবে অথচ আমার ঘরে এসে একেবারে শান্ত খোকাবাবুটি বনে গেল। কোনও মানে হয় না জয়ন্ত!

—তাহলে সিংহরায় মিথ্যে বলেছেন? খবরের কাগজেও কি উনি নিজেই খবরটা দিয়েছেন? কিন্তু এসবের উদ্দেশ্য কী কর্নেল? সিংহরায় কেন এমন আজগুবি ঘটনা রটাচ্ছেন?

—সবকিছু জানতেই ওঁর বাড়ি যাচ্ছি আমরা। চলো, বেড়িয়ে পড়া যাক।...

নিউ আলিপুরে সিংহরায়ের ইভনিং লজে যখন আমরা পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যা ছটা। বিশাল বাড়ি। চওড়া লন, ফুলবাগিচা, টেনিস কোর্ট আছে। আমাদের অভ্যর্থনা করে প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। টুপিটা কর্নেলের হাতে ছিল। সোফার এককোণে রেখে পাশেই বসলেন। তারপর কথাবার্তা শুরু হল। দেখলুম, কর্নেল টুপির কথা মোটেও তুললেন না। ঘরের নানান শিল্পসামগ্রী নিয়ে পুরাতত্ত্বে চলে গেলেন। ওসব পণ্ডিতি ব্যাপার আমি বুঝিনে। চুপচাপ বসে রইলুম।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল টুপিটা নড়ছে। নড়তে-নড়তে সোফার পিছনে, চলে যাচ্ছে। ঘরে আলো খুব উজ্জ্বল নয়। হালকা ধূসর আলো জ্বলছে। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। এত অবাক, আর ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি যে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

টুপিটা সোফার পিছন দিয়ে মাতালের মতো টলতে-টলতে এগোচ্ছে ডগার টুপিটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে। দেখতে-দেখতে ওটার গতি বাড়ল।

দরজার কাছে যেতেই আমি এতক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলুম,—কর্নেল। কর্নেল টুপি! টুপিটা পালাচ্ছে।

সিংহরায় হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কর্নেল দেখলুম মিটিমিটি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন ততক্ষণে টুপিটা দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়েছে।

কর্নেল, দেখলুম কাছে গিয়েই আচমকা লাফ দিলেন। তারপর উনিও অদৃশ্য। এতক্ষণে আমারও হুঁশ এল যেন। দৌড়ে বেরিয়ে ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

অমনি লনের ওদিকের গেটের কাছে দুড়ুম-দুড়ুম আওয়াজ হল। নিশ্চয় কেউ গুলি ছুঁড়ল। দারোয়ান, চাকরবাকর চেঁচিয়ে উঠল। দৌড়াদৌড়ি শুরু হল। গেটে গিয়ে দেখি, কর্নেল একহাতে টুপি অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে সেই মিটিমিটি হাসি। রুদ্ধশ্বাসে বললুম,—কী ব্যাপার কর্নেল?

কর্নেল বললেন,—আমার কাছে নয়, ওখানে সব রহস্য পড়ে আছে, জয়ন্ত। ওই দ্যাখো, দেখতে পাচ্ছ?

কর্নেলের সামনে নুড়িবিছানো রাস্তায় একটা ছোট্ট বিলিতি কুকুর মরে পড়ে আছে। বুকের কাছে রক্তের ছোপ। সিংহরায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে

উঠলেন,—জিমি! কে তোকে খুন করল? কর্নেল ওর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন, মিঃ সিংহরায়, জিমিকে ওর আসল মালিকরা এইমাত্র গুলি করে মেরে গেল। জিমিকে আপনি নিশ্চয়ই সদ্য কিনেছিলেন! তাই না?

সিংহরায় উঠে দাঁড়ালেন—হ্যাঁ। যেদিন টুপিটা কিনি, সেদিনই একটা লোক বেচতে এনেছিল। কিন্তু কী বলছেন আপনি! আমি তো এসব কিছুই বুঝতে পারছি না!

কর্নেল মৃদু হাসলেন,—দেখুন, এই টুপির মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু দামি মণিমুক্তো লুকানো আছে। টুপিটা হাতাবার জন্যেই জিমিকে ওরা আপনার কাছে বেচেছিল। টুপিতে একরকম গন্ধ মাখানো আছে। মাকাসিকো দ্বীপের একজাতের ফুলের গন্ধ। বহুকাল টিকে থাকে এই গন্ধ। ওরা এই গন্ধ জোগাড় করে জিমিকে শুঁকিয়ে খুব ট্রেনিং দিয়েছিল, বোঝা যাচ্ছে। তবে ট্রেনিং জিমির তেমন রপ্ত হয়নি। সময়ও যথেষ্ট পায়নি। তাই টুপিটা ওদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ওরা কদিন রাস্তায় ওত পেতে অপেক্ষা করেছে বেচারা জিমির!

সিংহরায় হতভম্ব হয়ে বললেন,—তাহলে টুপির তলায় জিমিটাই ঘুরে বেড়াত?

—অবশ্যই ভুতুড়ে টুপির রহস্য হচ্ছে এই। আর খবরের কাগজে খবর দিয়েছিল ওরাই, যাতে টুপিটা হারালে ভূতের ঘাড়েই দোষটা চাপানো যায়। বুঝলেন তো! ওইটুকুন কুকুর, খাড়াই মোটে ছ-ইঞ্চি। টুপির তলায় ঢুকলে তো ওকে দেখা যাবে না।

এরপর আমরা ড্রয়িংরুমে ফিরে গেলুম। ছুরি দিয়ে টুপির ভেতরটা চিরে দিতেই গুচ্ছের পাথর ঠিকরে পড়ল। চোখ ধাঁধানো রং সব। আমি লাফিয়ে উঠলুম,—কর্নেল! রাজা অনুহিটিক পালাবার সময় অনেক ধনরত্ন নিয়ে যান। পথে অনেক খোওয়া গিয়েছিল নাকি। ওই টুপিটার মধ্যেও কিছু ছিল দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল চুরুট জ্বেলে শুধু বললেন,—হুম!

জুতো রহস্য

ভদ্রলোক দরজার পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "জুতো পায়ে ঢুকতে পারি স্যার?"

"নিশ্চয় পারেন। তবে খুলে রেখে এলেও আপনার নতুন জুতো যে চুরি যাবে না, সে-গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।"

"অ্যাই! তা হলে যথাস্থানেই এসেছি।" বলে ভদ্রলোক হন্তদন্ত ঘরে ঢুকলেন। তারপর সোফায় বসে পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। "আমার ভাগ্নে গোকুল স্যার, আপনি চেনেন ওকে—বাবুগঞ্জ ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার। আপনার ঠিকানা দিয়ে বলল, এর কিনারা করতে আপনিই পারবেন।"

"জুতো চুরির?"

"আজ্ঞে।"

"ক'জোড়া চুরি গেছে এ-পর্যন্ত?"

"তিনজোড়া।" ভদ্রলোক করুণমুখে বললেন, "এ-বাজারে একজোড়া চামড়ার জুতোর দাম চিন্তা করুন স্যার! এক সপ্তায় তিন-তিনজোড়া জুতো লোপাট। গত রোববার থেকে শুরু। রোববার সন্ধেবেলায়। তারপর বিস্যুদবার ঠিক সেই সন্ধেবেলায় আবার লোপাট। শুক্কুরবার ফের কিনলাম। ফের সেদিনই সন্ধেবেলা লোপাট হয়ে গেল। এ কেমন চোর স্যার, সবার জুতো ঠিকঠাক পড়ে থাকে, আর আমার জুতোই ব্যাটাচ্ছেলে নিয়ে পালায়? নতুন জুতো তো আরও কত লোকে পরে যায়। তাদের জুতো ভুলেও ছোঁয় না। খালি আমার জুতো!"

"ঠাকুরবাড়ির দরজা থেকে?"

"ঠিক ধরেছেন স্যার! রাজাদের ঠাকুরবাড়ি। কবে ওঁরা কলকাতায় চলে এসেছেন। দালান-কোঠা সবই ধসে পড়েছে। শুধু ঠাকুরবাড়িটাই কোনওরকমে টিকে ছিল। পোড়ো খাঁ-খাঁ অবস্থা। দেবতার নামে জমি আছে! কিন্তু পুজো-আচ্চা বন্ধ ছিল। সেবায়েত থাকলে কী হবে? পায়ে বাত। চলাফেরা করতে পারে না। নিজের ঘরে শুয়েই নমো-নমো। বুঝলেন তো স্যার?"

"বুঝলাম! তারপর কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল ঠাকুরবাড়িতে?"

"অ্যাই!" ভদ্রলোক নড়ে বসলেন। "গোকুল যা বলছিল ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে।"

"তিনি আসার পর রোজ সন্ধে থেকে শাস্ত্রপাঠ-কথকতা-কীর্তনের আসর বসছিল?"

"আজ্ঞে।" ভদ্রলোক আবার নড়ে বসলেন। "গোকুল যা বলছিল—"

"আপনার নাম কী?"

"পাঁচুগোপাল সিংহ।"

"আপনার বাবার নাম?"

'আজ্ঞে যদুগোপাল সিংহ। তিনি আমার ছোটবেলায়—"

"আপনার ঠাকুরদার নাম?"
"জয়গোপাল সিংহ।"
"তিনি কী করতেন?"
"তিনি রাজবাড়ির খাজাঞ্চি ছিলেন।"
"খাজাঞ্চি?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ। খাজাঞ্চি মানে ক্যাশিয়ার স্যার! আজকাল খাজাঞ্চি বললে—"
"আপনার বাবা কী করতেন?"
"রাজবাড়ির সেরেস্তাদার—মানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন।"
"আপনি কী করেন?"
"রেলে টিকিটচেকার ছিলাম। গত মাসে রিটায়ার করে পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছি। বিয়ে-টিয়ে করিনি। আমার বিধবা দিদি—গোকুলের মা স্যার! দিদিই আমাদের বাড়িতে থাকত। আমি আসার পর সে গোকুলের সরকারি কোয়ার্টারে চলে গেছে। অত করে বললাম। থাকল না। বলে কী, আর এ-বাড়িতে ভূতের অত্যাচার সইতে পারবে না।"
"ভূতের অত্যাচার?"
"আজ্ঞে!" ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, "রাতবিরেতে কীসব অদ্ভুত শব্দ। কুকুর চ্যাঁচালেই থেমে যেত। তবে প্রথম-প্রথম গা করিনি। শেষে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করলাম। তাতেও কাজ হল না। এমন সময়—"
"সাধুবাবার আবির্ভাব। কাজেই তাঁর শরণাপন্ন হলেন।"
"হলাম। কিন্তু সাধুবাবার কৃপায় ভূতের অত্যাচার যদি-বা বন্ধ হল, হঠাৎ এই আরেক উপদ্রব শুরু হয়ে গেল। জুতো-চুরি। তিন-তিনজোড়া জুতো স্যার।"
"সাধুবাবা কোনও আস্কারা করতে পারলেন না?"
ভদ্রলোকের মুখে এতক্ষণে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। "আস্কারা করতে গিয়েই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড স্যার। কাল শনিবার সকালে ঠাকুরবাড়ির যে ঘরটায় সাধুবাবা থাকতেন, সেই ঘরের বারান্দায় চাপ-চাপ রক্ত দেখা গেল। সারা বাবুগঞ্জ হুলুস্থুলু। পুলিশ এল। রক্তের ছাপ পেছনকার দরজার ঘাটেও পাওয়া গেল। নিচে গঙ্গা। পুলিশ বলল, বডি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। শেষে গোপনে গোকুলকে সব বললাম। তখন গোকুল—"
"আপনার বাড়িতে আর কে থাকে?"
"কেউ না স্যার। আমি একা থাকি। স্বপাক খাই। বরাবর নিজের কাজ নিজে করার অভ্যেস আছে।"
"আপনি যে রোজ সন্ধেয় বাড়ি থেকে সাধুবাবার আসরে যেতেন—"
"কাছেই স্যার। খুব কাছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কী মনে হতো না বাড়িতে চোর ঢুকতে পারে?"

ভদ্রলোক হাসবার চেষ্টা করে বললেন, "ভুলো স্যার! ভুলোর চ্যাঁচানি যে একবার শুনেছে, সে-ই কানে আঙুল গুঁজে পালাবে।

"ভুলো কোনও কুকুরের নাম?"

"আজ্ঞে। ঠিক ধরেছেন। গোকুল যা-যা বলছিল—"

"ভুলোকে আপনি কোথায় পেলেন?"

"দিদির পোষা দিশি কুকুর। দিদি চলে গেলেও ভুলো চলে যায়নি।"

"তা বলে ভুলো এখন আপনার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে?"

"অ্যাঁ?" ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। "তাই তো! ওর কথা কাল থেকে আমার খেয়ালেই নেই। ভুলোকে আমি কাল থেকে দেখেছি, না দেখিনি? হুঁ, দেখিনি। কী আশ্চর্য! ভুলো কি তাহলে দিদির কাছে চলে গেছে? অকৃতজ্ঞের কাণ্ড দেখছ?"

"আপনি ফিরে গিয়ে ওর খোঁজ নিন। দেরি করবেন না।"

পাঁচুগোপালবাবু তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আর একটা কথাও না বলে হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।...

এতক্ষণ চুপচাপ বসে এইসব কথা শুনছিলাম। এবার দেখলাম আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ এবং রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন। চওড়া টাক বড্ড বেশি চকচক করছে। একটু হেসে বললাম, "আশ্চর্য কর্নেল! আপনি অন্ধকারে ঢিল ছোড়েন এবং দিব্যি সেই ঢিল লক্ষ্যভেদও করে।"

কর্নেল চোখ খুলে জোরে মাথা দোলালেন। "অন্ধকারে? নাহ্ জয়ন্ত! আমি আলোতেই ঢিল ছুড়েছি।"

"জুতো-চুরির কথা আপনি জানতেন তাহলে?"

"নাহ্। ভদ্রলোককে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে গঙ্গার ধারে ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার গোকুলবাবুকে চিনি। গত এপ্রিলে বাবুগঞ্জে উনি আমাকে কয়েকটা অর্কিডের খোঁজ দিয়েছিলেন।" কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি যত্ন করে ধরিয়ে বললেন, "জুতোর ব্যাপারটা তুমিও আঁচ করতে পারতে, যদি ওঁর কথাগুলো লক্ষ করতে। তাকে বুঝে প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর বেরিয়ে আসে।"

"কিন্তু সাধুবাবার ব্যাপারটা?"

"ডার্লিং! বরাবর দেখে আসছি, কাগজের লোক হয়েও তুমি কাগজ খুঁটিয়ে পড়ো না। তোমাদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকাতেই বাবুগঞ্জের সাধুবাবা নিখোঁজ এবং রক্তের খবর বেরিয়েছে।"

"বেশ। কিন্তু কুকুরের ব্যাপারটা?"

"পাঁচুগোপালবাবুর মুখেই শুনেছ, কুকুর চ্যাঁচালে ভুতুড়ে শব্দ থেকে যেত। কাজেই একটা কুকুর থাকার চান্স ছিল।"

"তাহলে ভূত আসলে জুতো চুরি করতেই আসত।"

"বাহ্!" কর্নেল হাসলেন। "ক্রমশ তোমার বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে।"

"রীতিমতো রহস্যজনক ঘটনা। কুকুরটাও নিপাত্তা হয়ে গেল সাধুবাবার মতো?"

"এবং তিনজোড়া জুতোও নিপাত্তা হয়ে গেছে।"

"কিন্তু কুকুরের জন্য ভদ্রলোক প্রায় গুলতির বেগে বেরিয়ে গেলেন কেন বলুন তো?"

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। আবার চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন এবং চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে ওঁকে আপনমনে বিড়বিড় করতে শুনলাম। "খাজাঞ্চি! আগের দিনে রাজা খেতাবধারী বড় জমিদারদের খাজাঞ্চিখানা থাকত। ট্রেজারি! খাজাঞ্চি ঠিক ক্যাশিয়ার নয়, ট্রেজারার। সে আসলে খুব সম্মানজনক পদ। তবে খুব আস্থাভাজন লোক হওয়া চাই। আস্থা! খুব গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দটা—আস্থা।"

ষষ্ঠীচরণ আর-এক প্রস্থ কফি রেখে গেল। বললাম, "কর্নেল! কফি!"

"হ্যাঁ। কফি খেয়েই আমরা বেরোব।" কর্নেল চোখ খুলে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমরাও গুলতির বেগে বেরিয়ে যাব। বাসে মাত্র ঘণ্টা তিনেকের জার্নি। পৌঁছেই লাঞ্চ খাওয়া যাবে।"

বাবুগঞ্জ গঙ্গার ধারে বেশ জমকালো মফস্বল শহর। টেলিফোন এক্সচেঞ্জও আছে। সরকারি ডাকবাংলো শহরের শেষ প্রান্তে। গাছপালাঘেরা নিঝুম নিরিবিলি পরিবেশ। কেয়ারটেকার গোকুলবাবু যেন জানতেন কর্নেল তাঁর মামাবাবুর কাছে খবর পেয়েই ছুটে আসবেন। তাই সুস্বাদু ইলিশ সহযোগে চমৎকার একখানা মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। খাওয়ার পর উনি ইনিয়ে-বিনিয়ে রাজমন্দিরে এক সাধুবাবার আকস্মিক আবির্ভাব এবং রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বর্ণনা করলেন। শেষে বললেন, "মামাবাবুর মাথায় ছিট আছে। মা এতকাল দাদামশাইয়ের ভিটে আগলে রেখেছিলেন। এত বলেও আমার কোয়ার্টারে মাকে আনতে পারিনি। তারপর মামাবাবু রিটায়ার করে বাড়ি ফিরলেন। অমনই নাকি ভূতের উপদ্রব শুরু হল। আসলে ভূতটুত, জুতো-চুরি বোগাস। মামাবাবুর পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়েই মা অগত্যা আমার কাছে চলে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ আগে মামাবাবু আপনার কাছ থেকে ফিরে আবার এক পাগলামি করতে এসেছিলেন। খামোকা ঝগড়াঝাটি!"

কর্নেল বললেন, "ভুলোর জন্য?"

"আপনি শুনেছেন?" গোকুলবাবু হাসলেন। "ভুলো মায়ের পোষা দিশি কুকুর। কিন্তু আমি থাকি সরকারি কোয়ার্টারের দোতলায়। ভুলো বিলিতি হলে কথা ছিল। তাছাড়া যা বিচ্ছিরি চ্যাঁচায়। মামাবাবুর ধারণা, ভুলো মায়ের কাছে পালিয়ে এসেছে। এলেও ওই এরিয়ায় ঢুকবে কেমন করে? এক এরিয়ার কুকুর অন্য এরিয়ায় গেলে কুকুরগুলো তাকে ঢুকতে দেবে?"

চলে যাওয়ার আগে গোকুলবাবু জানিয়ে গেলেন, তাঁর মামাবাবুর জুতো চুরির ব্যাপারটা নয়, সাধুবাবার হত্যা রহস্যের ব্যাপারে তাঁর খটকা লেগেছিল। সেইজন্যই ওঁকে কর্নেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

বাসজার্নির ধকল এবং লাঞ্চের পর ভাতঘুমের অভ্যাস আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। কর্নেলের ডাকে উঠে বসলাম। গঙ্গার ওপারে সূর্য সবে অদৃশ্য হয়েছে। দিনের আলো কমে গেছে। চারদিকে পাখিরা তুমুল চ্যাঁচামেচি করছে। কর্নেল পিঠ থেকে কিটব্যাগ খুলে টেবিলে রেখেছিলেন। জিগ্যেস করলাম, "প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছিলেন, না কি অর্কিডের খোঁজে?"

"নাহ্। জুতোর খোঁজে।"

হেসে ফেললাম। "আপনি কি ভেবেছিলেন চোর আপনাকে পাঁচুগোপালবাবুর জুতো ফেরত দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে?"

"কতকটা তা-ই।" কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন। "তবে এভাবে ফেরত দেবে ভাবিনি।"

অবাক হয়ে বললাম, "কীভাবে?"

"জুতো মেরে।" কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বিষণ্ণভাবে বললেন, "হ্যাঁ। জুতো মারা আর কাকে বলে? ছ'পাটি ছেঁড়া পামশু আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারা! একপাটি আমার টাকে পড়তে যাচ্ছিল। মাথা না সরালে পেরেকে রক্তারক্তি হয়ে যেত। সোল ওপড়ালে সব জুতোরই পেরেক বেরিয়ে থাকে। সবে একটা নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে মুখ তুলেছি, অমনই টুপিটা পড়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে জুতো ছুঁড়েছে!"

"বলেন কী! কোথায়?"

"রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ভেতর। চিন্তা করো জয়ন্ত, সোল ওপড়ানো পেরেক-বেরোনো জুতো।"

"সোল ওপড়ানো জুতো?" আরও অবাক হয়ে বললাম, "তাহলে কী পাঁচুগোপালবাবুর জুতোর সোলের ভেতর কিছু লুকনো ছিল?"

"পর-পর তিনজোড়া জুতো চুরি যাওয়ার কথা শুনেই সেটা তোমার মাথায় আসা উচিত ছিল। বিশেষ করে সেকালের এক জমিদারবাড়ির ট্রেজারারের পৌত্রের জুতো।"

এই সময় উর্দিপরা একটা লোক ট্রেতে কফি নিয়ে এল। সে সেলাম দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কর্নেল ডাকলেন, "রামহরি!" সে কাছে এলে কর্নেল বললেন, "তুমি তো এখানকার লোক। রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে কে-কে আছে এখন?"

রামহরি বলল, "ঠাকুরমশাইয়ের তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে নেই। এখন শুধু গিন্নিঠাকরুণ আছেন। ঠাকুরমশাই তো বাতের অসুখে বিছানায় পড়ে আছেন।"

"ঠাকুরমশাইয়ের কোনও ভাই বা জ্ঞাতি নেই?"

"এক ভাই ছিল। বনিবনা হতো না। ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল। সে প্রায় তিন-চার বছর আগের কথা স্যার। শুনেছি সে জেলখানায় আছে। চুরি-ডাকাতি করে বেড়াত। সেই নিয়েই তো দাদার সঙ্গে ঝগড়া।"

"ঠিক আছে। তুমি এসো রামহরি।"

রামহরি চলে গেলে কর্নেল চুপচাপ কফি খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, "চলো। ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি যাই।"

বিদ্যুতের আলোয় বাবুগঞ্জ ঝলমল করছিল। বড় রাস্তায় পৌঁছে কর্নেল একটা সাইকেল রিকশা নিলেন। সন্ধেরাতেও প্রচণ্ড ভিড়। রিকশাওয়ালা অনেক গিঞ্জি গলি পেরিয়ে একখানে থেমে বলল, "আর যাওয়া যাবে না স্যার! পায়ে হেঁটে চলে যান। আমি বলেই এলাম। অন্য কেউ কিছুতেই আসবে না।"

কর্নেল বললেন, "কেন হে? ভূতের ভয়ে নাকি?"

রিকশাওয়ালা কপালে-বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল, "ঠাট্টাতামাশার কথা নয় স্যার! এই তল্লাটে দিনদুপুরে কেউ পা বাড়ায় না আজকাল। যাচ্ছেন যান। তবে সাবধানে যাবেন।"

সে রিকশা ঘুরিয়ে উধাও হয়ে গেল। এদিকটায় বিদ্যুৎ নেই। কর্নেল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলাম। ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। একফালি আঁকাবাঁকা পথ। সামনে মিটমিটে আলো জ্বলছিল। কর্নেলের টর্চের আলোয় একটা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি দেখা গেল। কাছে গিয়ে উনি ডাকলেন, "ঠাকুরমশাই আছেন নাকি?"

দরজা খুলে এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে কর্নেলকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "কোত্থেকে আসছেন আপনারা?"

কর্নেল বললেন, "কলকাতা থেকে আসছি। একটা কথা বলেই চলে যাব।"

"উনি তো অসুস্থ।'"

"নাহ্। কথাটা আপনার সঙ্গে।'"

"আমার সঙ্গে? কী কথা?"

"আপনি কি ঠাকুরবাড়িতে সাধুবাবার আসরে যেতেন?"

ভদ্রমহিলা আবার চমকে উঠেই সামলে নিলেন। "কেন সে-কথা জিগ্যেস করছেন বাবা? আপনারা কী পুলিশের লোক? আমরা কোনও সাতেপাঁচে থাকি না।"

"আমার কথার জবাব দিলে খুশি হব। ঠিক জবাব না পেলে কিন্তু ঝামেলায় পড়বেন।"

কর্নেলের কথার ভঙ্গিতে ভয় পেলেন ভদ্রমহিলা। বললেন 'আমরা তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি বাবা!"

"আপনি কি সাধুবাবার আসরে যেতেন?"

ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী আস্তে বললেন, "একদিন গিয়েছিলাম।"

"শুক্রবার সন্ধ্যেয়?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"কতক্ষণ ছিলেন আসরে?"

"যতক্ষণ ভাগবতপাঠ হল, ততক্ষণ ছিলাম।"

"সবাই চলে গেলে আপনি কি সাধুবাবার সঙ্গে চুপিচুপি দেখা করেছিলেন?"

ভদ্রমহিলা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ। তা—"

"আপনি তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন কেন?"

ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী চুপ করে থাকলেন।

"বলুন। তা না হলে ঝামেলায় পড়বেন কিন্তু!"

এই সময় ঘরের ভেতর থেকে খ্যানখেনে গলায় কে বলে উঠল, "বলে দাও না। এত ভয় কীসের? ভুতো নিজের পাপের শাস্তি পেয়েছে। একদিন-না-একদিন সে খুন হতোই। হয়েছে। পুলিশকে বলে দাও সব কথা।"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "সাধুবাবাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন। তাই না? সেইজন্য চুপিচুপি তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কী বলেছিলেন আপনি তখন আপনার ভুতোঠাকুরপোকে?"

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। "ওকে বললাম, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। আর কিছুদিন থাকলে আরও অনেকে চিনে ফেলবে। তুমি শিগগির পালিয়ে যাও ঠাকুরপো! হঠাৎ সেই রাত্তিরে ঠাকুরপো খুন হয়ে গেল। চাপ-চাপ রক্ত!"

কর্নেল বললেন, "আপনার ঠাকুরপো ভূতনাথের নামে পুলিশের হুলিয়া জারি করা আছে। এলাকার কয়েকটা ডাকাতের মামলা ঝুলছে তার নামে।"

"জানি। সেইজন্যই তো—"

"হ্যাঁ। তাই তাকে চিরদিনের জন্য বেঁচে যাওয়ার একটা ফন্দি দিয়েছিলেন। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।"

কথাটা বলেই কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। আমি হতবাক হয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম।...

বাংলায় ফিরে দেখি, পাঁচুগোপালবাবু অপেক্ষা করছেন। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। কর্নেলকে দেখে উত্তেজিতভাবে বললেন, "অনেক খুঁজে পেয়ে গেছি স্যার! আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক তা-ই।"

কর্নেল বললেন, "জুতো?"

"আজ্ঞে।" বলে পাঁচুগোপালবাবু ব্যাগে হাত ঢোকালেন।

"এখানে নয়। আমার ঘরে চলুন।"

ঘরে ঢুকে পাঁচুগোপালবাবু ব্যাগ থেকে দুপাটি পামশু বের করলেন। জীর্ণ

বেরঙা ছেঁড়া বেঢপ জুতো। বললেন, "ঠাকুরদার সিন্দুকের তলায় লুকানো ছিল স্যার। ঠাকুরদার জুতোই মনে হচ্ছে। ইস! কী বিচ্ছিরি গন্ধ!"

কর্নেল জুতোজোড়া নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে টেবিলে রাখলেন। বললেন, "এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। রাজবাড়ির ওদিকটায় এতক্ষণে ঘন অন্ধকার। আপনি সেখানে গিয়ে এই গানটা গাইবেন—"

"গা-গান? আমি স্যার গান গাইতে পারি না যে!"

"চেষ্টা করবেন। নিন, মুখস্থ করুন :

চলে আয় ওরে ভুতো

পায়ে দিবি রাঙা জুতো।।"

পাঁচুগোপালবাবু অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে আওড়ালেন। তারপর করুণমুখে বললেন, "কে-কেন গান গাইতে হবে স্যার? আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না!"

"আপনার জুতো-চোর ভূতটাকে ধরতে হবে না? তিন-তিনজোড়া জুতো চুরি করেছে সে। তাকে ধরা উচিত নয় কি?"

এই সময় একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললেন, "বডি পাওয়া গেছে কর্নেলসায়েব! শকুনে প্রায় সাবাড় করেছে। তবে স্কেলিটনটা আছে। বেশি দূরে ভেসে যায়নি। মাত্র দুকিলোমিটার দূরে একটা খাড়িতে ভাসছিল। মুন্ডু-কাটা বডি।"

পাঁচুগোপালবাবু লাফিয়ে উঠলেন। "সাধুবাবার বডি?"

কর্নেল বললেন, "নাহ্। আপনার ভুলোর।"

পাঁচুগোপালবাবু আর্তনাদ করলেন, "হায়, হায়। ভুলোকে কে মারল?"

"ভুতো।" বলে কর্নেল উঠলেন। "আপনার ঠাকুরদার জুতোজোড়া নিন। চলুন, ভুতোকে ফাঁদে ফেলা যাক।"

পুলিশ জিপ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসার কর্নেলের সঙ্গে চুপি-চুপি পরামর্শ করে চলে গেলেন। কর্নেল পাঁচুগোপালবাবুকে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে চললেন।

ঘুরঘুট্টে অন্ধকার এলাকা। এবার কর্নেল টর্চ জ্বালছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে একটা কালো ঢিবির পাশে গুঁড়ি মেরে বসলেন। তারপর পাঁচুগোপালবাবুকে চাপাস্বরে বললেন, "সামনে দাঁড়িয়ে জোরে গানটা শুরু করুন।"

ভদ্রলোক কেশে গলা সাফ করে হেঁড়ে গলায় সুর ধরে আওড়ালেন :

"চলে আয় ওরে ভুতো

পায়ে দিবি রাঙা জুতো।।"

বারকতক গাওয়ার পর কালো ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল ওঁর সামনে। খোনা গলায় বলে উঠল, "এঁনেছিস? দেঁ! দেঁ!"

পাঁচুগোপালবাবু চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আতঙ্কে। "ওরে বাবা! এ যে দেখছি সত্যিই ভূ-ভূ-ভূত!"

অমনই এদিক-ওদিক থেকে টর্চের আলো জ্বলে উঠল। একটা সাধুবাবার

চেহারার লোক পালানোর জন্য লাফ দিতেই কর্নেল গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। দুজন কনস্টেবলকে দেখলাম লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। কর্নেল তার দাড়ি-জটা উপড়ে নিয়ে বললেন, "ছদ্মবেশী সাধুবাবাকে চিনতে পারছেন না পাঁচুগোপালবাবু? রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর ভাই ভূতনাথ। আপনার ভুলোর মুন্ডু কেটে রক্ত ছড়িয়ে আত্মগোপন করেছিল। আপনার ঠাকুরদার দু'পাটি জুতোর সোলের ভেতর লুকিয়ে রাখা দশটা সোনার মোহরের খবর বহুদিন আগে ভূতনাথ পেয়েছিল আপনার দিদির কাছে। আপনার দিদি কথায়-কথায় মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন ওকে। পরে বুদ্ধি করে বলেছিলেন, সেই মোহর আপনার জুতোর সোলে লুকনো আছে। তখন আপনি রেলের চাকরি করেন। ট্রেনে-ট্রেনে ঘোরেন। ভূতনাথ তাই সুযোগ পায়নি। আপনি রিটায়ার করে বাড়ি ফেরার পর তাই সে আপনার জুতো চুরির ধান্দা করেছিল। যাই হোক, চলুন। বাংলোয় ফেরা যাক।"

হং চং লং-রহস্য

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটা ইনল্যান্ড লেটার পড়ছিলেন। জ্বলন্ত চুরুট থেকে একটুকরো ছাই সাদা দাড়িতে পড়ল। এটা নতুন কোনও দৃশ্য নয়। কিন্তু উনি বাঁহাত তুলে এমনভাবে মসৃণ টাকে বুলোতে থাকলেন, যেন ছাইয়ের টুকরোটা মাথাতেই পড়েছে। হাসি চেপে বললাম, "ছাই কিন্তু আপনার দাড়িতে পড়েছে।"

আমার রসিকতায় কান দিলেন না কর্নেল। চিঠিটা ভাঁজ করে "হং চং লং!"

অবাক হয়ে বললাম, "কী বললেন?"

"হং চং লং।"

"তার মানে?"

কর্নেল চিঠিটা আমাকে দিয়ে বললেন, "দ্যাখো। মানে উদ্ধার করতে পার নাকি।"

খুলে দেখি, লেখা আছে ঃ

মহাশয়,

আপনার কীর্তি সুবিদিত। তাই আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমার প্রাণনাশের চক্রান্ত চলিতেছে। অনুগ্রহপূর্বক শীঘ্র আসিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। এবং চক্রান্তকারীদের যথোচিত শাস্তি দিন। হং চং লং। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সিংহরায়

শান্তি কুটির, বাবুগঞ্জ (নিমতিতার সন্নিকটে),

জেলা মুর্শিদাবাদ।

চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়ার পর বললাম, "হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে বয়স্ক মানুষ। মাথায় গণ্ডগোল আছে।"

"কীসে বুঝলে?"

"হঠাৎ হং চং লং কেন? সবই তো খোলাখুলি লিখেন।"

কর্নেল চুরুট অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললেন, "এমনও হতে পারে, আমি পৌঁছনোর আগে যদি সত্যিই ওঁর বরাতে কিছু ঘটে যায়, হং চং লং থেকে আমি কোনও সূত্র পেয়ে যাব। এই ভেবে—"

ওঁর কথার ওপর বললাম, "সূত্র আগাম জানিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে তা ও খোলাখুলি লিখতে পারতেন। হিং টিং ছট কেন?"

"হিং টিং ছট নয়। হং চং লং!"

"একই কথা। তবে আমার মনে হচ্ছে। শান্তি কুটির আসলে একটা উন্মাদাশ্রম।"

কর্নেল আমার কথাটা গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, "জয়ন্ত! তোমার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য বাবুগঞ্জে একটা চমকপ্রদ স্টোরি অপেক্ষা করছে।"

"আপনি সত্যিই কি চিঠিটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন?"

"দিচ্ছি। কারণ ওই হং চং লং।"

"আশ্চর্য! জেনেশুনেও আপনি এক পাগলের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছেন?"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "তুমি কিন্তু খালি হাতে ফিরবে না, এ আশ্বাস আমি দিতে পারি। বাবুগঞ্জে আমি একবার গিয়েছিলাম। সীমান্ত এলাকা। অন্তত স্মাগলিং নিয়েও একটা রোমাঞ্চকর স্টোরি দাঁড় করাতে পারবে। আমিও অবশ্য খালি হাতে ফিরব না। এই শীতের মরসুমে পদ্মায় অসংখ্য বিদেশি জলচর পাখি আসে। চিয়ার আপ জয়ন্ত! হং চং লং।"

বুঝলাম, হং চং লং-এর হাত থেকে আমারও নিষ্কৃতি নেই।...

বাবুগঞ্জ পদ্মাতীরে একটা পুরনো বাণিজ্যকেন্দ্র। রেলস্টেশন থেকে কবছর আগেও দূরত্ব ছিল প্রায় ছ-কিলোমিটার। পদ্মার ভাঙনে ক্রমশ সরে এসেছে। উত্তর দিকটায় মাটি কিছুটা উঁচু। তাই সেখানে সাবেক গঞ্জের কয়েকটা বাড়ি এখনও টিকে আছে। কিন্তু বাড়িগুলোর চেহারা জরাজীর্ণ। দেখে মনে হয় না ওসব বাড়িতে মানুষ বাস করে।

আমরা উঠেছিলাম নতুন বসতি এলাকায়, সরকারি ডাকবাংলোয়। চৌকিদার বনবিহারী কর্নেলের চেনা লোক। কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহরায়ের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "একসময় খুব দাপট ছিল এলাকায়। এখন বয়স হয়েছে। বাড়ি থেকে আর বেরোতে দেখি না।"

কর্নেল বললেন, "কীসের দাপট ছিল?"

বনবিহারী চাপা গলায় বলল, "বর্ডার এরিয়া স্যার! বুঝতেই পারছেন। যত স্মাগলার, খুনে আর ডাকাত ছিল কেষ্টবাবুর চেলা। এখন চেলারা অন্য গুরু ধরেছে।"

কর্নেল হাসলেন। "অন্য গুরুর নাম কী?"

"আজ্ঞে, সে কেষ্টবাবুরই খুড়তুতো ভাই। আসল নাম জানি না। সবাই ডাকে গঞ্জুবাবু বলে।"

"গঞ্জুবাবু থাকে কোথায়?"

"তার থাকার কোনও ঠিকঠিকানা নেই স্যার! আগে থাকত কেষ্টবাবুর কাছে। শুনেছি ওঁর সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। তারপর থেকে সে ও-বাড়ি ছেড়েছে।" বনবিহারী শ্বাস ছেড়ে বলল, "আমি স্যার এখানকার কোনও সাতে-পাঁচে থাকি না।"

বাংলো থেকে বেরিয়ে কর্নেল একটা সাইকেল-রিকশা ভাড়া করলেন। রিকশাওলাকে বললেন, "কেষ্টবাবুর বাড়ি চেনো?"

রিকশাওলা বলল, "কেষ্টবাবুর বাড়ি অবদি রিকশা যাবে না। আপনাদের খানিকটা পায়ে হাঁটতে হবে।"

"ঠিক আছে। তুমি বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে চলে আসবে। বখশিশ পাবে।"

নতুন বসতি এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে জঙ্গল এবং ঢালু জমি। রাস্তাটা হঠাৎ সেখানে শেষ হয়ে গেছে। জঙ্গল এবং ঢালু জমিটা পেরিয়ে উঁচু মাটির ওপর সাবেক গঞ্জের

সেই পুরনো বাড়িগুলো দেখা গেল। রিকশাওলা বলল, "আমি আর যাব না স্যার। রিকশা চুরি যাবে। ওই যে গেটটা দেখছেন, ওটাই কেষ্টবাবুর বাড়ি। তবে একটা কথা বলি স্যার! সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবেন। জায়গাটা ভালো না। প্রায় ছিনতাই হয়।"

সে কথাগুলো বলেই গুলতির বেগে উধাও হয়ে গেল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। কর্নেল উঁচু জায়গায় উঠেই বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললেন, "অপূর্ব! কেষ্টবাবু —আমাদের কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহরায় অনুমতি দিলে ওঁর বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাব। পদ্মার সৌন্দর্যের কোনও তুলনা হয় না।"

বললাম, "ওঁর খুড়তুতো ভাই গঞ্জুবাবু আপনাকে থাকতে দেবে বলে মনে হয় না।"

কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "কেন বলো তো?"

"এখন মনে হচ্ছে কেষ্টবাবুর ভয়েই আপনাকে চিঠিটা লিখেছেন।"

"হুঁ। হুং চং লং!"

বিরক্ত হয়ে আর কোনও কথা বললাম না। দোতলা বাড়িটার চারদিকে টুটাফাটা পাঁচিল। গেটে একটা ফলকে লেখা আছে 'শান্তি কুটির'। গেটটার অবস্থাও শোচনীয়। আমরা গেটের সামনে যেতেই একজন মধ্যবয়সি লোক প্রাঙ্গণ থেকে এগিয়ে এল। মাথার চুল সাদা। কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ গড়ন। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে রুক্ষস্বরে বলল, "কাকে চাই?"

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড বের করে লোকটাকে দিলেন। বললেন, "আমরা কলকাতা থেকে আসছি। সিংহরায় মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করব।"

সে কার্ডটা হাতে নিয়ে চলে গেল। এতক্ষণে লক্ষ করলাম, গেটে ভেতর থেকে তালা খুলে বলল, "আসুন।" তারপর আমরা ভেতরে ঢুকলে ফের তালা আটকে দিল।

বসার ঘরটা দেখে মনে হল একসময় অবস্থা ভালোই ছিল! লোকটা আমাদের সোজা দোতলায় নিয়ে গেল। বাড়িতে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। কেন যেন গা ছমছম করছিল। একটা ঘরের ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় কেউ বলে উঠল, "আসুন।"

সেই ঘরে ঢুকে দেখি, খাটে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আলোয়ান-মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। আমরা বসলে তিনি কর্নেলের কার্ডটা দেখতে-দেখতে বললেন, "কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনি মিলিটারির লোক?"

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, "আপনি কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহরায়?"

"হ্যাঁ। তা আপনাদের আসার উদ্দেশ্য?"

"আপনিই আমাকে আসতে লিখেছিলেন।"

"আমি? আমি কস্মিনকালে আপনাকে চিনি না।"

"আপনি আমাকে কোনও চিঠি লেখেননি?"

"কখনও না। আপনাকে কেন চিঠি লিখতে যাব?"

"হং চং লং!"

কেষ্টবাবু হঠাৎ খাপ্পা হয়ে গেলেন, "কী বলছেন মশাই? হং চং লং মানে?"

"মানে তো আপনারই জানার কথা।"

কেষ্টবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, "অ্যাই, ভাঁটু! এদের গেট পার করে দিয়ে আয়। তোকে পইপই করে বলেছি, যাকে-তাকে হুট করে বাড়ি ঢোকাবি না।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। আমি কেটে পড়ার তালে ছিলাম। দুজনে নিচে নেমে আসার পর ভাঁটু তুম্বো মুখে আমাদের অনুসরণ করল। গেটের কাছে পৌঁছে সে কাঁচুমাচু মুখে বলল, "কিছু মনে করবেন না স্যার! বাবুর মেজাজ আজকাল কেমন হয়ে গেছে।"...

বাংলোয় ফিরে কর্নেল মুখ খুললেন, "কী বুঝলে জয়ন্ত?"

হাসতে-হাসতে বললাম, "আপনাকে বলেছিলাম, ভদ্রলোকের মাথায় গণ্ডগোল আছে।"

"কোনও অদ্ভুত ব্যাপার তুমি লক্ষ করোনি?"

"না তো! অবশ্য অদ্ভুত ব্যাপার বলতে হং চং লং শুনে উনি হঠাৎ কেন যেন খাপ্পা হয়ে উঠলেন।"

"আর কিছু?"

"বড্ড চ্যাঁচামেচি করে কথা বলছিলেন!"

কর্নেল সায় দিলেন। "ঠিক ধরেছ। ওঁর কণ্ঠস্বর বড্ড বেশি চড়া।"

"আচ্ছা কর্নেল! এমন তো হতে পারে, পাশের ঘরে বা আশেপাশে কোথাও ওঁর সন্দেহভাজন চক্রান্তকারীরা ছিল। তাই তাদের শুনিয়ে ওভাবে কথা বলছিলেন।"

"হ্যাঁ। তোমার কথায় যুক্তি আছে।" কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, "তবে চিঠিটা ওঁর দেখতে চাওয়া উচিত ছিল। তোমার যুক্তি অনুসারেই বলছি, চক্রান্তকারীদের শুনিয়েই চিঠিটা দাবি করতে পারতেন। করলেন না।"

বনবিহারী কফি আনল। কর্নেল চুপচাপ কফি খেলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি বিশ্রাম করো! আমি আসছি।"

কিছু জিগ্যেস করার সময়ও পেলাম না, কর্নেল এমন হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় ঠান্ডাটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। পদ্মার দিক থেকে হিম হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঘরে ঢুকে সতর্কতার দরুণ দরজা এঁটে কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনও ট্রেনজার্নির ধকল সামলাতে পারিনি!

কিছুক্ষণ পরে দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল ফিরলেন ভেবে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। তারপর হকচকিয়ে গেলাম। কর্নেল নন, শান্তি কুটিরের সেই

কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহরায় ওরফে কেষ্টবাবু। পরনে গলাবন্ধ কোট, মাথায় হনুমান-টুপি। তা সত্ত্বেও চিনতে ভুল হল না। ঘরে ঢুকেই চাপা স্বরে বললেন, "কর্নেলসায়েব কোথায়?"

ব্যস্তভাবে বললাম, "আপনি একটু বসুন। কর্নেল এসে পড়বেন।"

"বসার সময় নেই। ওঁকে বলবেন, শিগগির যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন। আজ রাত্রেই।"

কথাটা বলেই কেষ্টবাবু বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক লনের পাশে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছেন। বনবিহারী কিচেনে কয়লার উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে খুন্তি নাড়ছে। তা হলে যা ভেবেছি, তা-ই ঠিক। আমরা এমন সময় দেখা করতে গিয়েছিলাম, যখন চক্রান্তকারীরা ওঁর বাড়িতে ছিল।

কিন্তু তারা কারা? ওঁর আত্মীয়স্বজন? বাড়ির ভেতরে তো আর কারও সাড়াশব্দ পাইনি।

কর্নেল ফিরলেন প্রায় ঘণ্টাদুই পরে। আমি ব্যস্তভাবে বললাম, "কেষ্টবাবু এসেছিলেন।"

"জানি। ওঁর বাড়ির কাছে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বললেন, আমার খোঁজে বাংলোয় গিয়েছিলেন।"

"ব্যাপারটা তা হলে সত্যি।"

"ব্যাপারটা একেবারে হং চং লং।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "আবার সেই হং চং লং। একটু খুলে বলবেন তো?"

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে টুপি খুললেন। তারপর চুরুট ধরিয়ে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "বছর তিনেক আগে এখানে এসেছিলাম। কলকাতার জাদুঘর থেকে চুরি যাওয়া একটা প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি এখান থেকে পাচার হওয়ার মুখেই উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। তবে তার জন্য কোনও কৃতিত্ব দাবি করছি না। কারণ স্বয়ং পদ্মা আমাকে একটা বড় পুরস্কার দিয়েছিল। একঝাঁক দুর্লভ প্রজাতির সাইবেরিয়ান হাঁস! চিন্তা করো জয়ন্ত, পদ্মার জলে সাইবেরিয়ান হাঁস।"

"কেষ্টবাবুর সঙ্গে কী কথা হল বলুন?"

"সাইবেরিয়ান হাঁস নিয়ে। কারণ, সেবার এই হাঁসের খবর কেষ্টবাবুই দিয়েছিলেন। তবে পদ্মার ধারে হঠাৎ দেখা এবং দু-চারটে কথা বলার ফাঁকেও মনে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু ওই হং চং লং! আজ বিকেলে শান্তি কুটিরে যাওয়ার সময় বাইনোকুলারে পদ্মা দেখামাত্র মনে পড়ে গিয়েছিল, আরে তাই তো! হাঁসের খবর দিয়ে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'কী হাঁস তা জানি না মশাই! খালি হং চং লং আর হং চং লং। হাঁসের এমন বিদঘুটে হাঁকডাক জীবনে কখনও শুনিনি।" ভদ্রলোককে আমার নেমকার্ড দিয়েছিলাম।"

"ধুস! হং চং লং তাহলে কেষ্টবাবুর ভাষায় হাঁসের ডাক?"

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ। চিঠিতে হং চং লং লেখার কারণ আশা করি এবার বুঝতে পারছ। পূর্বপরিচয় মনে করিয়ে দেওয়া। এবং সেইসঙ্গে সাইবেরিয়ান হাঁসের লোভ দেখানো, যাতে আমি চিঠি পেয়েই ছুটে আসি।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওঁর প্রাণনাশের চক্রান্ত কারা করেছে?"

"সে নিয়ে কোনও কথা হয়নি।"

"কী আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যের কী আছে? সন্ধ্যাবেলায় অমন নিরিবিলি জায়গায় ওসব কথা বলার রিস্ক ছিল। ওঁর শত্রুপক্ষ ওত পেতে বেড়াচ্ছে। তাই হাঁস নিয়েই কথা হল। তেমনই চড়া গলায় আলোচনা। শেষে বললেন, রাত দশটা নাগাদ আমি যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করি। হাঁসের খবর দেবেন।"

বাংলো থেকে যখন দুজনে বেরোলাম, তখন গঞ্জের রাস্তাঘাট একেবারে খাঁ-খাঁ নিঝুম। কোথাও গাঢ় কুয়াশার মধ্যে ভুতুড়ে আলো। আমার গা ছম ছম করছিল। কর্নেল খুদে টর্চের আলো পায়ের কাছে ফেলে হন্তদন্ত হাঁটছিলেন। নতুন বসতি এলাকার পর সেই জঙ্গল আর ঢালু জমির কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে পদ্মার দিক থেকে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

উঁচু জমির ঢাল বেয়ে ওঠার পর শান্তি কুটিরের গেট দেখা গেল। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। সেই আলোর ছটা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আসতে-আসতে অন্ধকারের পায়ের তলায় নেতিয়ে পড়েছে। হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। কর্নেল বললেন, "ভাঁটু নাকি?"

"হ্যাঁ স্যার! আসুন। গেট খোলা আছে।"

আমরা ভেতরে ঢুকলে সে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে গেটের কাছে এল এবং গেটে তালা আটকে দিল। কে জানে কেন, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল ভাঁটু পেছন থেকে বলল, "আপনারা ওপরে চলে যান। বাবু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

দোতলার সেই ঘরে কেষ্টবাবু খাটের ওপর তেমনই আলোয়ান-মুড়ি দিয়ে এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। মাথায় হনুমান-টুপি! এবার আর চড়া গলায় না, আস্তে-আস্তে বললেন, "বসুন।"

আমরা বসলাম। তারপর কর্নেল বললেন, "হাঁসের খবর বলুন!"

"বলছি। আগে সেই চিঠিটা দেখি।"

"চিঠিটা তো বাংলোয় রেখে এসেছি।"

"এই ভদ্রলোককেই পাঠিয়ে দিন। চিঠিটা নিয়ে আসবেন।"

"চিঠিটা নিয়ে কী করবেন?"

"ওটা পুড়িয়ে ফেলা দরকার।"

"আপনি খুব সাবধানী লোক গঞ্জুবাবু!"

"কী বললেন?"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "গঞ্জুবাবু! একটুও নড়বেন না। পুলিশ বাড়ি ঘিরে রেখেছে। আপনার চেলারা পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় এতক্ষণ ফাঁদে পড়ে গেছে। ওই শুনুন! সিঁড়িতে পুলিশের জুতোর শব্দ।"

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সদলবলে একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন, "বাঃ! একেবারে কেষ্টবাবু দেখছি! কেষ্টবাবুর আলোয়ান আর মাঙ্কি ক্যাপ। একই ছাঁটের গোঁফ। একই ভঙ্গিতে বসে আছে ব্যাটাচ্ছেলে!"

দুজন কনস্টেবল গিয়ে গঞ্জুবাবুকে খাট থেকে চ্যাংদোলা করে নামাল এবং হাতকড়া পরিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। কর্নেল বললেন, "ভাঁটু কেটে পড়েনি তো কল্যাণবাবু?"

পুলিশ অফিসার বললেন, "পাঁচিল থেকে ঠ্যাং ধরে টেনে নামানো হয়েছে।"

"বাড়িটা সার্চ করে ফেলুন। কেষ্টবাবুর ডেডবডি খুঁজে বের করা দরকার। আমার ধারণা, ডেডবডি এখনও পদ্মায় ফেলার সুযোগ পায়নি। কারণ, বিকেলে বাইনোকুলারে দেখছিলাম পদ্মায় বি এস এফের খুব আনাগোনা চলছে। আপনিও বলছিলেন, একটা চর নিয়ে কদিন থেকে দুদেশের মধ্যে ঝামেলা বেধেছে। রোজ ফ্ল্যাগমিটিং হচ্ছে। কাছেই ডেডবডি বাড়ির ভেতর কোথাও পোঁতা আছে।"

বলে কর্নেল আমার কাঁধে হাত রাখলেন। "চলো জয়ন্ত! বাংলোয় ফেরা যাক। এখানে শীতটা বড্ড বেশি হুং চং লং করছে।"...
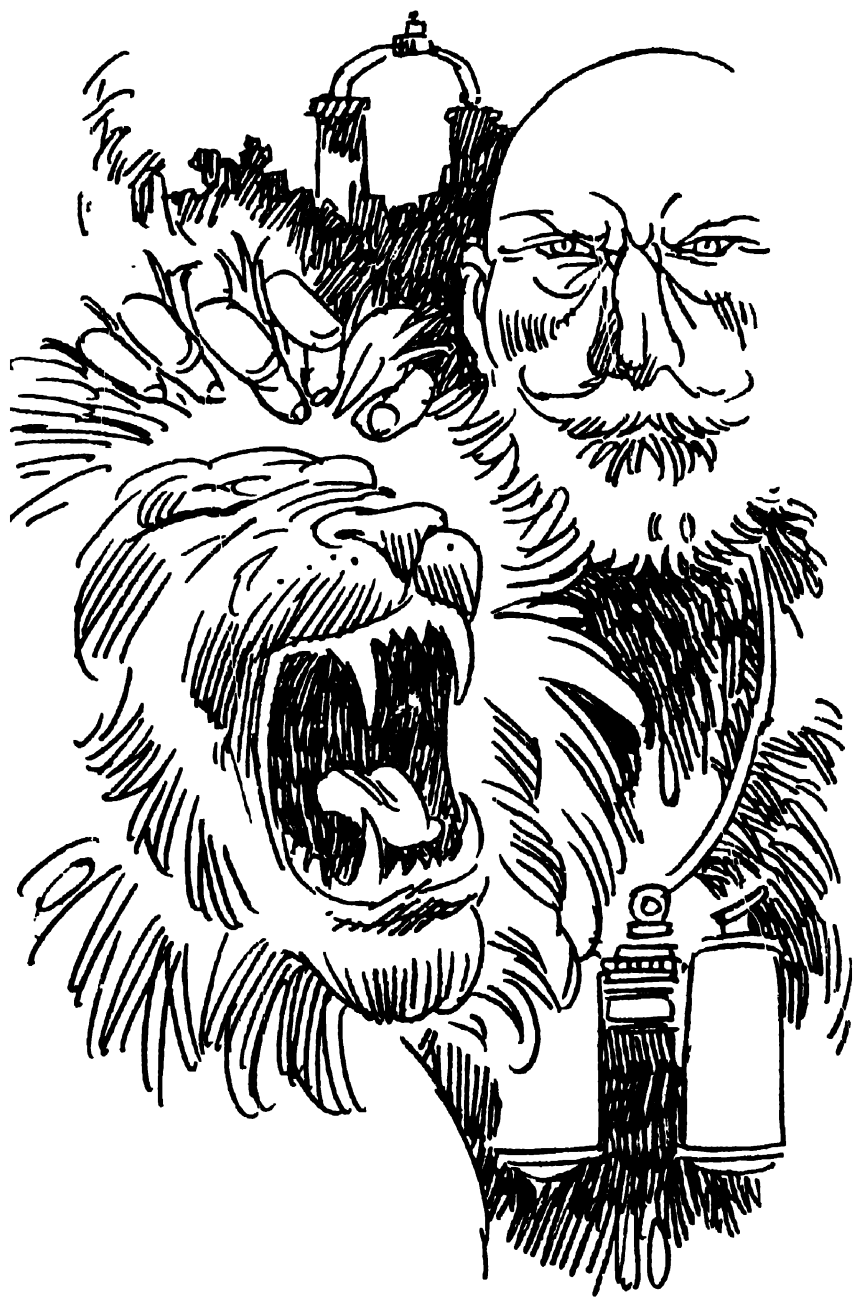
কাপালিক ও সিংহ

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের বিস্তর গোয়েন্দাগিরি দেখেছি। প্রচুর জটিল রহস্যের সমাধান করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেবার মোহনপুরের ঘটনায় যেভাবে ঝটপট রহস্যটা ফাঁস করে ফেলেছিলেন, তেমনটি আর কখনও দেখিনি। ব্যাপারটাকে 'এক মিনিটেই সমাধান' বললে ভুল হয় না।

কবে পুজো শেষ হয়েছে। আসন্ন শীতে কোনও মুলুকে বেড়াতে যাবার প্ল্যান করতেই কর্নেলের কাছে গেলাম। কথাবার্তার সময় এক ভদ্রলোক হঠাৎ ঘরে ঢুকে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন, "কর্নেল! কর্নেল! আমায় আপনি বাঁচান।"

কর্নেল বললেন, "আগে আপনি শান্ত হয়ে বসুন। তারপর বলুন কী হয়েছে।"

ভদ্রলোক ধপাস করে সোফায় বসে বললেন, "আমার শ্যালকা নান্তুকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। তারপর এই দেখুন চিঠি।"

কর্নেল চিঠিটি নিলেন। পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখি, লাল কালিতে লেখা আছে।

"আগামীকাল পূর্ণিমা তিথিতে সিংহবাহিনীর মন্দিরের কাছে রাত এগোরোটায় আড়াই হাজার টাকা না নিয়ে গেলে নান্তুকে মায়ের সামনে বলি দেব। সাবধান. পুলিশের কানে তুলবেন না। মন্দিরের ফটকের সামনে টাকা নিয়ে অপেক্ষা করবেন। মায়ের বাহন সিংহ গর্জন করতে-করতে আপনার সামনে যাবে। নির্ভয়ে তার সামনে টাকা ফেলে দিয়ে চলে যাবেন। ঘুরে তাকালেই বিপদ হবে। ইতি কাপালিক।"

কর্নেল চিঠিটা ফেরত দিয়ে বললেন, "হুম! কবে এবং কীভাবে আপনার শ্যালককে চুরি করে নিয়ে গেছে বলুন। কিন্তু আপনার নাম ঠিকানা বলুন আগে।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম সদাশিব রায়। বাড়ি মোহনপুরে। দুদিন আগে নান্তু নিখোঁজ হয়েছে। রাত্তিরে শুয়েছিল ওর ঘরে। সকালে দেখি বাইরের দিকের দরজা খোলা। বিছানায় ধস্তাধস্তির চিহ্ন। চাদর ঝুলছে। মশারির দড়ি ছেঁড়া। নান্তুর একপাটি জুতো দরজার কাছে, অপর পাটি বাইরের লনে পড়ে আছে।"

"এই চিঠিটা কবে পেলেন?"

"আজ ভোরবেলা আমার ঘরের মেঝেয়। সুতোয় ছোট ঢিলের সঙ্গে বেঁধে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে।" সদাশিববাবু হঠাৎ ব্যস্তভাবে বুকপকেটে হাত ভরলেন। তারপর কয়েকটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে বললেন, "তার আগের ঘটনাও বলা দরকার, কর্নেল! কিছুদিন থেকে বাড়িতে অদ্ভুত ধরনের চুরি হয়েছিল। প্রথমে অত খেয়াল করিনি। পরে এই তিনটে চিরকুট একইভাবে মেঝেয় কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। প্রথমে চুরি গেল আমার দাঁতমাজা ব্রাশ। পরের দিন নস্যির কৌটো খুঁজে পেলুম না। তবে মেঝেয় কুড়িয়ে পেলুম এই চিরকুটটা। তাতে লেখা আছে : 'সবে কম দামি জিনিস দিয়ে শুরু, পরে আরও দামি জিনিস যাবে। ইতি, কাপালিক।' পরদিন গেল আস্ত চশমা। তারপর পেলুম এই দ্বিতীয় চিরকুট : "এখনও বুঝতে পারছ না

মূর্খ কী ঘটতে চলেছে? ইতি, কাপালিক।' পরের দিন গেল আমার মেয়ে ঝুমার কানের একটা দুল চুরি। স্নানের সময় বাথরুমে খুলে রেখে ভুলে গিয়েছিল। আনতে গিয়ে দেখে একটা নেই। সেদিনই আমার ঘরের মেঝেয় তৃতীয় চিরকুট আবিষ্কার করলুম : 'সাবধান! এবার আস্ত মানুষ চুরি যাবে। ইতি, কাপালিক।' সত্যি গেল। নান্তুকে চুরি করে নিয়ে গেল।"

কর্নেল চিরকুটগুলো নিয়ে চোখ বুলিয়ে ফেরত দিলেন। তারপর বললেন, "কাপালিক কিন্তু বেশি টাকা দাবি করেনি। মাত্র আড়াই হাজার।"

সদাশিববাবু বললেন, "টাকাটা দিতে আমি পারি। কিন্তু কে এই ব্যাটা কাপালিক? তাকে জব্দ না করলে যে মনে শান্তি পাব না কর্নেল! আমি মোহনপুরের সদাশিব রায়। আমার সঙ্গে এরকম বেয়াদপি করার সাহস?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "ঠিক আছে! চলুন, আপনার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি। আজই তো পূর্ণিমা তিথি।" তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, "কী জয়ন্ত, যাবে নাকি? তোমার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য একটা দারুণ রোমাঞ্চকর খবরও হবে।"

সায় দিয়ে বললুম, "আলবৎ যাব। অন্তত কাপালিক সাধুর পোষা সিংহটা দেখতে ইচ্ছে করছে খুব।"...

মোহনপুরে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে গেল। ঠিক গ্রাম নয়, গ্রাম-শহরের বিদঘুটে জগাখিচুড়ি। সদাশিববাবুর বাড়িটা শেষ প্রান্তে, গঙ্গার ধারে। বাগানের দিকের যে ঘর থেকে ওঁর শ্যালক নান্তুবাবুকে কাপালিক ধরে নিয়ে গেছে, সেই ঘরটা খুঁটিয়ে দেখলেন কর্নেল। নান্তুবাবুর জুতো দুটো কোথায়- কোথায় কীভাবে পড়েছিল, তা জেনে নিলেন। তারপর বললেন, "নান্তুবাবুর বয়স কত?"

সদাশিববাবু বললেন, "বছর আঠারো-উনিশ হবে। কলেজের ছাত্র। আমার কাছ থেকেই পড়াশোনা করে।"

"ছাত্র হিসেবে কেমন?"

"তত ভালো না। কারণ সবসময় খেলাধুলোয় মন পড়ে থাকে। খেলা-পাগল বলতে পারেন।"

"হুম! আপনার বাড়ির চাকর বিশ্বাসী তো?"

"আলবৎ! গদাই ছেলেবেলা থেকে এ-বাড়িতে আছে। এখন চুল পেকে গেছে।"

"গদাই কি লেখাপড়া জানে?"

"মোটেও না।"

এরপর কর্নেল সদাশিববাবুর ঘর দেখতে গেলেন। যেখান থেকে ওঁর কলম, নস্যির কৌটো চুরি গেছে। তারপর বাথরুমে উঁকি দিলেন। দাঁতের ব্রাশ আর ওঁর মেয়ের দুল কোথায় ছিল জেনে নিলেন। তারপর বাগানে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি

করলেন। কর্নেলের গলায় যথারীতি বাইনোকুলার ঝুলছিল। চোখে রেখে গাছগুলো দেখতে-দেখতে বললেন, "কত পাখি! বড় সুন্দর জায়গায় আপনার বাড়ি সদাশিববাবু।"

কর্নেলের পাখি দেখার বাতিক প্রচণ্ড। একটু পরে দেখলুম, উনি অভ্যাসমতো বাইনোকুলার চোখে রেখে কী একটা পাখি দেখতে-দেখতে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। তারপর আর নড়ার নাম নেই। বেলা পড়ে এসেছে। সদাশিববাবু আমার দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু হাসলেন। আমি একটু হেসে চাপাগলায় বললুম, "চলুন, আমরা বরং ঘরে গিয়ে বসি। উনি এখন পক্ষি দেবতার ধ্যানে বসেছেন। ধ্যান ভাঙতে দেরি হবে।"

এই সময় কর্নেলের মাথার টুপিটা খসে পড়ল। মাথা-জোড়া টাক শেষ বেলাতেও চকচক করে উঠল। তারপর দেখি সাদা দাড়িতে সম্ভবত পোকা ঢুকেছে এবং পোকার উৎপাতেই উঠে দাঁড়ালেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

কিছুক্ষণ পরে বসার ঘরে যখন আমরা চা খাচ্ছি, কর্নেল চোখ বুজে বিড়বিড় করে বললেন, আড়াই হাজার টাকা! হুম, কাপালিক খুব সামান্য টাকা দাবি করেছে। কেন?

সদাশিববাবু বললেন, "জানে আমি কড়া লোক। শ্যালকের প্রাণ যাক আর যাই ঘটুক, তত বেশি টাকা দেবার পাত্র নই।"

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, "হুম! ঠিকই বলেছেন।"

একটু পরে সদাশিববাবু ভেতবে গেলে আমি কর্নেলকে চুপি-চুপি বললুম, "সদাশিববাবু অদ্ভুত লোক তো। শ্যালকের প্রাণ যাওয়া নিয়ে যেন মাথাব্যথা নেই। 'কাপালিক' ওঁকে যেন এভাবে বড্ড বেশি অপমান করছে ধরে নিয়েই চটেছেন। এমনকী, আমার ধারণা, শ্যালকের চাইতে ওঁর দাঁতের ব্রাশ, নস্যির কৌটো চুরি করেছে বলেই কাপালিককে টিট করতে চাইছেন আপনার সাহায্যে।"

কর্নেল হাসলেন, "তাও ঠিক। তবে আড়াই হাজার টাকার ব্যাপারটাও ওঁর কাছে মোটে সামান্য নয়। কেন জানো? মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক বেজায় হাড়কেপ্পন। কাপালিক সেটা জানে বলেই বেশি টাকা দাবি করেনি।"

সদাশিব ফিরে এলে আমরা চুপ করলাম। এবার উনি ঘরে আলো জ্বেলে দিলেন।

সিংহবাহিনীর মন্দির মোহনপুর থেকে আধ কিলোমিটার দূরে। গঙ্গার ধারে একটা জঙ্গলের ভেতর জরাজীর্ণ এক মন্দির। একেবারে জনহীন জায়গা। পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমলে আলো ছড়াচ্ছে। কর্নেল, সদাশিববাবু এবং আমি ভাঙা ফটকের কাছে একটা ঝোপের আড়ালে বসলুম।

একটু পরে কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, "এগারোটা বাজে। সদাশিববাবু, টাকা নিয়ে রেডি হোন।"

সদাশিববাবু রুমালে বাঁধা নোটের বান্ডিল দেখিয়ে বললেন, "টাকাটা যেন নিয়ে না পালায় কর্নেল। আমার অনেক কষ্টের টাকা।"

কর্নেল বললেন, "দেখা যাক।"

সেই সময় মন্দিরের দিক থেকে চাপা গর্জন শোনা গেল। শিউরে উঠলুম। সিংহের গর্জনই বটে। সদাশিববাবু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। আরেকবার গর্জন শুনতে পেলাম। দেবীর বাহন তাহলে আসছে কাপালিকের হুকুমে টাকা নিতে।

তারপর জ্যোৎস্নায় সত্যি সিংহটার আবির্ভাব হল। ফটকের কাছে দুপায়ে বসে একটা পা তুলে ধরে চতুর্থ পায়ে গোঁফের কাছটা চুলকোতে থাকল। মাথায় ঝাঁকড়া কেশর। লেজটা খাড়া হয়ে আছে পেছনে।

সদাশিববাবুকে কর্নেলকে টেনে নড়াতে পারলেন না। ভদ্রলোক সমানে কাঁপছেন। ওঁর হাত থেকে টাকার রুমালটা নিয়ে তখন কর্নেলই এগিয়ে গেলেন। সিংহটা তেমনি বসে রয়েছে। কর্নেল তার সামনে রুমালটা ছুঁড়ে ফেলতেই সিংহটা একটা থাবা বাড়িয়ে তুলে নিল। তারপর সেই চার পা হয়ে ঘুরছে, কর্নেল বললেন, "এক মিনিট! কথা আছে।"

অবাক কাণ্ড। সিংহটা ঝটপট ঘুরে গেল। আঁতকে উঠে ভাবলুম, এই রে! দিল কর্নেলের মুণ্ডুটা বুঝি থাবার আঘাতে গুঁড়ো করে। সদাশিববাবু আমাকে চেপে ধরলেন ভয়ের চোটে।

কিন্তু আমাদের আরও অবাক করে কর্নেল লাফ দিয়ে এগিয়ে সিংহের কেশর খামচে ধরে বললেন, "চলে আসুন সদাশিবাবু।"

সদাশিববাবু "ওরে বাবা" বলে আরও কাঁপতে শুরু করলেন। আমি দৌড়ে গেলাম। সিংহ বেকায়দায় পড়ে দাপাদাপি করছে বটে, কিন্তু মোটেও গজরাচ্ছে না যে! কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, "কী নান্তু! দিল্লিতে এশিয়াড দেখতে যদি এত ইচ্ছে, খুলে বললেই পারতে জামাইবাবুকে!"

অমনি সিংহটা দুপায়ে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে বলল, "খুলে বললে কি টাকা দিতেন? জামাইবাবু যে বড্ড হাড়কেপ্পন!'

সদাশিব তখুনি সব টের পেয়ে দৌড়ে এসে বললেন, "নেমকহারাম! তুই আমায় তাই ভাবলি? দিতুম না তোকে টাকা? বেশ। আমি না দিতুম, তোর দিদিকে বললে বুঝি দিত না?"

সিংহবেশী নান্তু রুমালে বাঁধা টাকাটা ছুড়ে দিয়ে বলল, "এই নিন আপনার টাকা! আমি কলকাতা গিয়ে মেজদির বাড়ি টিভিতে এশিয়াড দেখব বরং।"

সদাশিববাবু টাকাটা কুড়িয়ে বললেন, "তাই দেখিস। তবে তার আগে আমার টুথব্রাশ, নস্যির কৌটো, কলম, ঝুমির কানের দুল ফেরত দে।"

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, "ওসব জিনিস নান্তু চুরি করেনি সদাশিববাবু। কাল সকালে আপনার বাগানের আমগাছের ডগায় কাকের বাসাতে ওগুলো পেয়ে

যাবেন। আসলে দুষ্টু কাকটার ওই কীর্তিকলাপ দেখেই আপনার শ্যালকের মাথায় এই রহস্যের ফন্দি গজিয়েছিল। বাইনোকুলারে ওবেলা কাকের বাসাটাই দেখেছিলুম যে।"

সদাশিববাবু নরম হয়ে শ্যালকের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "যাক গে, বাড়ি আয়। কদিন ধরে খেলি কোথায়, ঘুমুলি কোথায়? ছ্যা ছ্যা, কোনও মানে হয়?"

পরদিন ফেরার পথে ট্রেনে কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম, "কেমন করে টের পেলেন সব।"

কর্নেল হাসলেন। "খুব সোজা হিসেব। সিংহ সেই গির অরণ্যে আছে। মোহনপুরে সিংহ কোথায়? তাছাড়া এখন সার্কাসেরও সিজন নয়। তাহলে সিংহ আসবে কোত্থেকে। তাছাড়া সিংহের ডাক নকল করুক, ধরা পড়বেই। নান্তু যদি বরং বাঘ সাজত, একটু জট পাকিয়ে যেত রহস্যটা। তবে যখনই শুনলুম, নান্তু খেলা-পাগল ছেলে, তখনই আঁচ করলুম সামনে মানে নভেম্বরে এশিয়াড এবং তার জামাইবাবু কেমন মানুষ। যাক গে, ছেড়ে দাও।" বলে কর্নেল চোখ বাইনোকুলার রেখে টেলিগ্রাফের তারের পাখিটাকে দেখতে থাকলেন। চলমান ট্রেন বলে পাখিটা পিছিয়ে পড়ল। তখনও জানলায় ঝুঁকে আছেন বুড়ো ঘুঘুমশাই।...

কুমড়ো রহস্য

স্টেশন তখনও অন্তত আধ কিলোমিটার দূরে, ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেল। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। ট্যাক্সির সামনে ও পিছনে গাদাগাদি করে প্রায় এক ডজন যাত্রী ঠাসা ছিল। এ-মুল্লুকে নাকি এটাই রেওয়াজ। তবে শীতের দাপটে অবস্থাটা খুব একটা অসহনীয় মনে হচ্ছিল না। তা ট্যাক্সিওয়ালা দশ কিলোমিটার পথ আসতে ইতিমধ্যে তিনবার ভাড়া বাড়িয়েছে। এবার এই কলকব্জা বিগড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে চতুর্থ দফা ভাড়া বাড়াবার ফন্দি ভেবেই আমরা যাত্রীরা ঝটপট নেমে এলুম। এবং যাঁদের ঠ্যাংগুলো লম্বা, তাঁরা সবার আগে দেখতে-দেখতে উধাও হয়ে গেলেন।

একটু পরে দেখি, আমি আর ট্যাক্সিওয়ালা ছাড়া আর জনপ্রাণীটি নেই। ট্যাক্সিওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও ফন্দিফিকির বা ধূর্তামির চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। লোকটা করুণ মুখে ইঞ্জিনের কলকব্জার দিকে তাকিয়ে আছে। বললুম, "কী দাদা, কী বুঝছেন?"

লোকটা হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "নেহী সাব। আপ পায়দল চলা যাইয়ে।"

হুঁ, ভেবেছে আমি ওর হাড়-জিরজিরে গাড়িটার মূর্ছাভাঙার অপেক্ষায় আছি। আসলে এতক্ষণ ঠাসাঠাসিতে আমার শরীর আগাগোড়া ঝিম ধরে গেছে। পা দুটোতে কোনও সাড়া নেই। তাই সেই ঝিমুনি কাটিয়ে নিচ্ছি। এবং সেটা ওকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই রাস্তার উপরে পা দুটো ঘোড়ার মতো ঠুকতে-ঠুকতে কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। কাছেই একটা ব্রিজ রয়েছে। নদীটা বেশ চওড়া। তবে অর্ধেকের বেশি বালিতে ভরা, বাকিটায় কালো জল। স্রোত বইছে বলে মনে হচ্ছিল না।

বিকেল হয়ে গেছে। শীতের দিন ঝটপট ফুরিয়ে যায়। হিসেব করে দেখলুম, ট্রেনের এখনও মিটি কুড়ি দেরি। স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে গেলেও ট্রেন ধরা যাবে। সঙ্গে একটা কিটব্যাগ ছাড়া কোনও বোঝা নেই। তাছাড়া জায়গাটা কেন যেন খুব ভালো লাগছিল। একধারে ছোটবড় পাহাড়। তার উপত্যকা শীতের শস্যে সবুজ হয়ে আছে। অন্যধারেও পাহাড় আছে। আর আছে ঝোপঝাড় আর মাঝে-মাঝে ঘন জঙ্গল। সামনে ওই স্টেশনের কাছে যা একটা বসতি—তাছাড়া কাছাকাছি কোনও বসতির চিহ্ন চোখে পড়ছিল না।

মনে হল, জায়গাটা ভ্রমণবিলাসীদের পক্ষে মোটামুটি পছন্দসই।

হঠাৎ আমার চোখ গেল ডাইনে নদীর পাড়ে জঙ্গলের দিকটায়। ঝোপের মধ্যে কী একটা বসে আছে যেন। বাঘ-ভালুক নাকি? বলা যায় না, এই জঙ্গলে জনহীন জায়গায় বিশেষ করে শীতকালে জন্তু-জানোয়ার বেরিয়ে পড়তেও পারে।

ধূসর রঙের প্রাণীটি আমার দিকে পিঠ রেখে ওত পেতে আছে। একবার ভাবছি, ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে সাবধান করে দিই। আবার ভাবছি, আমার হাঁক-ডাকানি শুনে

যদি দাঁত-নখ বাগিয়ে তেড়ে আসে? অবশ্য রাস্তাটা যথেষ্ট উঁচু এবং আন্দাজ দেড়শ মিটার দূরত্বে রয়েছে ওটা।

কিন্তু আমাকে হকচকিয়ে দিয়ে ওটা উঠে দাঁড়াল এবং তখুনি বুঝলুম, চোখের ভুল হয়েছে। ওটা ধূসর রঙের কোট-প্যান্ট পরা একজন মানুষই বটে। হাতে কী একটা রয়েছে। গা ছমছম করে উঠল এবার। অন্যরকম ভয়ে। হাতে কী ওটা? পিস্তল? কাউকে খুন করার জন্য ওত পেতে আছে লোকটা। কিন্তু কোট-প্যান্ট এবং দস্তুরমতো সায়েবি টুপি পরা কোনও লোক কাউকে খুন করার জন্যে ওভাবে ওত পেতেছে, এটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত মনে হল না।

অথচ ওর গতিবিধি সন্দেহজনক। সন্দেহ আরও বাড়ল, যখন দেখলুম, লোকটা হাতের কালোরঙের জিনিসটা তুলে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে একটু কুঁজো হল এবং ওইভাবে পা টিপে-টিপে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে থাকল।

তারপর দেখি, সে দৌড়াতে শুরু করেছে। গুরুতর দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আমার বুক টিপটিপ করছে এবার। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, গুলির শব্দ আর মানুষের আর্তনাদ শুনব। ওর হাতের জিনিসটা যদি বন্দুক হতো, তাহলে তো শিকারিই ভাবতুম। পিস্তল দিয়ে কি কেউ পাখি বা জন্তু-জানোয়ার শিকার করে?

দৌড়ে সে যেখানে ঢুকল, সেখানে কিছু উঁচু-উঁচু গাছ রয়েছে। ছায়ায় অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছি। তারপর সে অন্তত একমিনিটের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্যাক্সিওয়ালা ব্যাপারটা দেখেছে নাকি জানার জন্যে ওদিকে ঘুরলুম। না, ও এখনও ইঞ্জিনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

আবার যখন সেই লোকটাকে দেখতে পেলুম, তখন সে নদীর পাড়ে হাঁটু দুমড়ে বসেছে এবং পিস্তল তাক করে রেখেছে। আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে ব্যাপারটা দ্রুত জানিয়ে দিলুম। দু-দুজন মানুষ এখানে থাকতে একটা খুনখারাপি হবে! যে-ট্যাক্সিওয়ালা তিন-তিনবার যাত্রীদের চাপ দিয়ে ভাড়া বাড়িয়েছে, তার বিবেকও এবার নড়ে উঠল। "এইসা?" বলে সে তার ট্যাক্সি থেকে একটা লোহার রড বের করল। তারপর চোখ কটমট করে আমাকে ডাক দিল। আমারও একটা কিছু হাতে নেওয়া দরকার। অগত্যা ওর ইঞ্জিনের মধ্যে রাখা একটা রেঞ্চ তুলে নিয়েই রওনা দিলুম। উত্তেজনায় মাথার ঠিক নেই।

ট্যাক্সিওয়ালা উঁচু রাস্তা থেকে নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় চাপাস্বরে কী বলতে-বলতে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে থাকল। আমি ওর পিছু-পিছু চলেছি। দুজনেই সতর্ক। আচমকা ধরে ফেলব ওকে।

আমাদের দিকে পিঠ রেখে লোকটা এখনও তেমনি বসে আছে। টুপি পরা মাথাটা সামনে ঝুঁকেছে, হাতের পিস্তল একেবারে নাকের ওপর তুলে তাক করে রেখেছে। সম্ভবত হতভাগ্য মানুষটি অর্থাৎ যাকে খুন করবে, সে নিচে নদীতে নিশ্চিন্তে কিছু করছে-টরছে। কিছু টের পাচ্ছে না। খুনে লোকটির হাতে পিস্তল আছে বলেই

আমরা এত সাবধানী হয়েছি। পা টিপে এগিয়ে কয়েক মিটার দূর থেকে ট্যাক্সিওয়ালা রড তুলল এবং আমিও রেঞ্চটা বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, "খুন করলে! খুন করলে! পাকড়ো পাকড়ো!" ভুলেই গেলুম যে, ওর হাতে পিস্তল আছে।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে গুপ্তঘাতক ঘুরে ব্যাপারটা দেখেই হুড়মুড় করে নদীতে ঝাঁপ দিল। ট্যাক্সিওয়ালা রড নাচিয়ে পাড় থেকে শাসাতে শুরু করল। "পিস্তল ফেক দো! নেহি তো ডাণ্ডা মারেগা হাম!"

আমি তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। নাকি এখনও লিটনগঞ্জের সেই সরকারি অতিথিশালায় শুয়ে একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছি?

কালো এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা জলে বুক-অবধি ডুবিয়ে হতভাগ্য গুপ্তঘাতক এখন ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তার টুপিটাও খুলে পড়ে কাগজের নৌকোর মতো ভেসে যাচ্ছে অল্প-অল্প স্রোতে, এবং তার ফলে মাথাজোড়া যে টাকটি এই গোলাপি রোদ্দুরে চিকচিক করছে, সেটি অতি প্রসিদ্ধ এবং আমার সুপরিচিত। তার সান্টাক্লজ সদৃশ সাদা অনবদ্য গোঁফ-দাড়িতে এখন বিস্তর জলকাদা লেগেছে।

এবং তার হাতের সেই পিস্তলটা পরিণত হয়েছে বাইনোকুলারে। এবং তা হয়েছে বলেই আমাদের বোকামির শাস্তি পাইনি। কিন্তু ততক্ষণে আমার পেটে হাসি ঘুলিয়ে উঠছে। হায় বুড়ো ঘুঘু। এ কী দশা তোমার! ট্যাক্সিওয়ালা লোহার রডটা ফের তুলতেই করুণ আওয়াজ এল, "জয়ন্ত! ওকে একটু বুঝিয়ে বলো যে, এটা পিস্তল-টিস্তল নয়, সামান্য একটা দূরবিন।"

এতক্ষণে আমি হাসতে পারলুম। হো-হো করে হেসে উঠলুম। ট্যাক্সিওয়ালা অবাক হয়ে বলল, "ক্যা জী? কোই জান-পহচান আদমি? কৌন হ্যায় উও?"

বললুম, "থোড়া গলতি হুয়া দাদা! মাফ কিজিয়ে। উও দেখিয়ে আপকা ট্যাক্সিমে বাচ্চালোক ক্যা গড়বড় কর রাহা।"

সত্যি-সত্যি কাচ্চাবাচ্চারা ওই জনহীন রাস্তায় ওর ট্যাক্সিতে হামলা করেনি, কিন্তু উপায় নেই। ওই নিমজ্জিত বৃদ্ধ ভদ্রলোককে উদ্ধার করতে হবে। শীতের বিকেলে নদীর জল ওঁর পক্ষে নিশ্চয় আরামদায়ক হচ্ছে না। যাই হোক, আমার মিথ্যে কথায় কাজ হল ট্যাক্সিওয়ালা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ওর হাতে সেই ছোট্ট রেঞ্চটা গুঁজে দিতেই সে জঙ্গল ভেঙে রাস্তায় তার ট্যাক্সির দিকে দৌড় দিল।

নিমজ্জিত বৃদ্ধের দিকে ঘুরে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললাম, "জলটা কী খুবই ঠান্ডা?"

উনি করুণ হেসে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "ধন্যবাদ! আমি এবার উঠতে পারব। তবে দয়া করে তুমি আমার টুপিটা উদ্ধার করো।"

হাসতে-হাসতে একটা গাছের ডাল ভেঙে ধীরে ভাসমান টুপিটা উদ্ধার করে দেখি, উনি পাড়ে উঠেছেন এবং কী আশ্চর্য, আবার চোখে বাইনোকুলার রেখে পা টিপে-টিপে এগোচ্ছেন! ভিজে পোশাক থেকে জল ঝরছে সমানে। কিন্তু এতক্ষণে

সব রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে ওঁর প্রচলিত নাম বা বদনাম ধরে ডেকে ফেললুম, "হাই ওলড ঘুঘু! নিমুনিয়া হবে যে!"

উনি কানই দিলেন না। দৌড়ে গিয়ে ওঁর কাঁধ খামচে ধরলুম। তখন হতাশ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। "মাইডিয়ার ইয়ংম্যান! তুমি জানো না, কী সাংঘাতিক ক্ষতি করেছ আমার! অনেক কষ্টের পর বিরল প্রজাতির একটা উড-ডাকের দেখা পেয়েছিলুম। আর কী তাকে খুঁজে পাব?"

ওঁর কথায় এবার অনুতাপ জাগল। বললুম, "এই দুর্ঘটনার জন্য আমি যথেষ্ট লজ্জিত এবং দুঃখিত। ক্ষমা করুন এবং চলুন, যেখানে উঠেছেন, সেখানে গিয়ে পোশাক বদলাবেন।"

"এক মিনিট, জয়ন্ত! আমি প্রজাপতি-ধরা জালটা নিয়ে আসি।"

বলে উনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন। সেদিকে তাকিয়ে দেখি, গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠের বেড়া দেখা যাচ্ছে। বুড়ো দেখতে-দেখতে কী কৌশলে সেই বেড়ার ফাঁক গলিয়ে অদৃশ্য হলেন। তখন ব্যাপারটা ভালো করে দেখার জন্য বেড়ার দিকে এগিয়ে গেলুম।

একটা কৃষিফার্ম বলে মনে হল। নদীর ধারে চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে কেউ চাষবাস করছে। অঢেল শীতের ফসল ফলে রয়েছে। তরিতরকারিও লাগানো আছে। বুড়ো এখন হামাগুড়ি দিয়ে কুমড়োখেতের ওগুলোর মসৃণ নিটোল গড়ন আর সোনালি রঙ দেখেই বুঝতে পারলুম, পাথর নয়। অতএব কুমড়ো ছাড়া আর কী?

আমার বৃদ্ধ বন্ধু ওখানে হাঁটু মুড়ে সাবধানে জাল গুটোচ্ছিলেন। হঠাৎ কোত্থেকে বাজখাঁই গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই! অ্যাই! আই!" তারপর দেখি, গামবুটপরা, নাদুসনুদুস চেহারার এক ভদ্রলোক হাতে খুরপি নিয়ে দৌড়ে আসছেন! এই রে! এবার আর বুড়োকে বাঁচানো যাবে না। আমি বেড়ার ফাঁক গলিয়ে ঢোকার জন্যে সাধ্যসাধনা করছি। তার মধ্যে শুনি, উভয়পক্ষই হা-হা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"জয়ন্ত! চলো এসো। আলাপ করিয়ে দিই।"

ডাক শুনে বেড়া গলিয়ে ঢুকে পড়লুম। খামারের মালিক অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। বেড়ার ফাঁকটা বেড়ে গেছে সম্ভবত সেদিকেই ওঁর নজর।....

খামারের মালিকের পরিচয় পেয়ে আমি অবাক। ভদ্রলোক আসলে একজন কৃষিবিজ্ঞানী। নাম ডঃ রঘুনাথ গিনতিওয়ালা। সংক্ষেপে ডঃ গিনতি। অনেককাল পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। ভালো বাংলা বলেন। এই খামার তাঁর ল্যাবরেটরি। গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাছাড়া এক ঋতুর ফসল কীভাবে অন্য ঋতুতে ফলানো যায়, তা নিয়েও মাথা ঘামান। আমার কৌতূহল ওঁর ফলানো কুমড়ো সম্পর্কে। প্রশ্ন শুনে হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনারা বাঙালিরা কুমড়োর ছক্কা খেতে খুব ভালবাসেন। ওদিকে লিটনগঞ্জের কলকারখানা এলাকায় অজস্র বাঙালি আছেন। বলতে

পারেন, তাঁদের মুখ চেয়েই আমি এই উৎকৃষ্ট জাতের কুমড়ো ফলিয়েছি। ওখানকার অফিস-ক্যান্টিনগুলোতে তরিতরকারি জোগায় একটা এজেন্সি। তারা আমার খেতের কুমড়ো ট্রাকবোঝাই করে কিনে নিয়ে যায়। আপনার বন্ধু কর্নেল সাহেবকেই জিগ্যেস করুন সত্যি না মিথ্যে।"

কর্নেল সাহেব অর্থাৎ 'বুড়ো ঘুঘু' বলে পরিচিত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এই খামারবাড়ির পাশের ঘর থেকে ভিজে পোশাক ছেড়ে ডঃ গিনতির বেঁটে পাজামা-পাঞ্জাবি এবং আস্ত কম্বল জড়িয়ে এতক্ষণে এলেন। ফায়ারপ্লেসের সামনে আরাম করে বসে বললেন, "জয়ন্ত, ডঃ গিনতির ওই কুমড়োগুলো কিন্তু অকাল-কুষ্মাণ্ড।"

ডঃ গিনতি হো-হো করে হেসে উঠলেন। "কী বললেন? অকালকুষ্মাণ্ড?"

কর্নেল বললেন, "তাছাড়া আর কী বলব? সচরাচর কুমড়ো পরিণত আকার পেতে এবং পাকাপোক্ত হতে অনেক দিন লেগে যায়। আপনার এই কুমড়ো মাত্র তিনমাসেই প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। ভেতরটা লাল টুকটুকে।"

ডঃ গিনতি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যেন। বললেন, "না, না। লাল বলা ঠিক নয়, হলদে। আপনি তো ভেতরটা দেখার সুযোগ পাননি এখনও। বরং কাল সকালে আপনার ফরেস্ট-বাংলোয় খানিকটা পাঠিয়ে দেব। তখন—"

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, "সরি! ভেতরটা তো এখনও দেখিইনি। তবে যেন মনে হচ্ছে, লাল হওয়াই উচিত।"

"কেন বলুন তো?"

"বুঝলেন ডঃ গিনতি, আমার ইদানিং উদ্ভিদবিজ্ঞানের দিকেও ঝোঁক চেপেছে। সেদিন একটা পত্রিকায় দেখছিলুম, অবিকল এই জাতের কুমড়ো পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফলে। প্রশান্ত মহাসাগরের ওই সব দ্বীপে দুশো বছর আগে কুমড়ো কী তা কেউ জানতই না। ১৭৬৯ সালে বিখ্যাত অভিযাত্রী টমাস কুক প্রথম তাহিতি দ্বীপে বিলিতি কুমড়োর কিছু বীজ পুঁতে এসেছিলেন। তার প্রায় একশ বছর পরে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন গিয়ে দেখেন, মাটির গুণে বিশাল আকারের কুমড়ো ফলেছে। তা এখনও দ্বীপের লোকেরা ভয়ে কুমড়ো ছোঁয় না। ওখানকার একটা দ্বীপের নাম ইস্টার দ্বীপ। সেখানের লোকেরা যে পক্ষিদেবতার পুজো করে, এ বুঝি তারই ডিম। বুঝুন অবস্থা!"

আমি ও ডঃ গিনতি হেসে উঠলুম। এই সময় কফি এল। আমরা আরাম করে কফিতে চুমুক দিলুম। কর্নেলবুড়ো কোনও ব্যাপারে একবার মুখ খুললে তো থামতে চান না। আবার পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফিরেছেন। গতিক দেখে ডঃ গিনতি আমার দিকে চোখ ইশারা করে বললেন, "ইয়ে, এবার জয়ন্তবাবু ব্যাপারটা শোনা যাক। বলুন জয়ন্তবাবু, কী দেখে এলেন লিটনগঞ্জে?"

কর্নেল চিমটেয় অগ্নিকুণ্ড থেকে একটুকরো অঙ্গার তুলে চুরুট ধরাতে ব্যস্ত হলেন। আমি বললুম, "ব্যাপার সত্যি সাংঘাতিক। হেভি ওয়াটার প্ল্যান্টের-প্রায় অর্ধেকটা

বিস্ফোরণে গুঁড়ো হয়ে গেছে। সরকারি গোয়েন্দারা এখনও তদন্ত করছেন। কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। কিন্তু আঁচ করা যাচ্ছে না যে, অত কড়াকড়ি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও কীভাবে অন্তর্ঘাত ঘটল!"

ডঃ গিনতি শিউরে উঠলেন। "বলেন কী! অন্তর্ঘাত? তাহলে ফিরে গিয়ে আপনাদের পত্রিকায় কড়া করে লিখবেন জয়ন্তবাবু।"

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে দুষ্টু হেসে বললেন, "রিপোর্টার হিসেবে জয়ন্তের খুব সুনাম আছে, ডঃ গিনতি। ওর কলমের জোরে সরকারি অফিসের চেয়ারগুলো কেঁপে ওঠে শুনেছি।"

পালটা খোঁচা মেরে বললুম, "আর আপনার? আপনারও তো বুড়ো ঘুঘু বলে যথেষ্ট নাম আছে।"

কর্নেল আচমকা কাশতে শুরু করলেন। সর্বনাশ! জলে নাকানিচুবানি খাওয়ার ফলাফল। ডঃ গিনতি আমাকে কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, উদ্বিগ্ন হয়ে থেমে গেলেন। কিন্তু না, কর্নেল সামলে নিয়েছেন। বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাবার ক্ষমতা আছে ওঁর। রুমালে নাম মুছে বললেন, "এবার ওঠা যাক। বাংলোয় ফিরতে রাত হয়ে যাবে।"

ডঃ গিনতি বললেন, "সঙ্গে লোক দেব। আলো দেব। কিছু ভাববেন না। তা জয়ন্তবাবু, ওই হেভিওয়াটার প্ল্যান্ট ব্যাপারটা আদলে কী বলুন তো? বুঝতেই পারছেন, আমি নিছক কৃষিবিদ্যার চর্চা করি।"

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। "এবার উঠি ডঃ গিনতি। আপনার আতিথ্য এবং সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কাল সকালে আপনার এই কাপড়চোপড় আর কম্বল ফেরত পাঠাব। এসো জয়ন্ত।"

বলে উনি সটান বেরিয়ে গেলেন। বাইরে এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু কুয়াশাও ঘন হয়ে জমেছে। আর কনকনে ঠান্ডার কথা না তোলাই ভালো। মনে হচ্ছিল, কর্নেলবুড়োর পাল্লায় পড়াটা ঠিক হয়নি। সোজা ভারুণ্ডি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলে ভালো করতুম।

এই জঙ্গলের পথে হাড়কাঁপানো শীতে ফরেস্ট বাংলোর দিকে হাঁটতে-হাঁটতে এবার বাঘভালুকের ভয় হচ্ছিল। শুনলুম ভারুণ্ডি জঙ্গলে বুনো হাতিরও উৎপাত আছে। তবে ডঃ গিনতির লোকটির হাতে আলো আছে।

ফরেস্ট বাংলোয় আরাম করে বসে কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, সবার সামনে আমাকে বুড়ো ঘুঘু বলাটা তোমার বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। না—আমি রাগ করিনি। কিন্তু কথাটা তোমার তলিয়ে দেখা উচিত। তুমি কী এলিয়ট রোডে আমার ফ্ল্যাটের নতুন নেমপ্লেটটা লক্ষ করোনি?"

একটু হেসে বললুম, "করেছি। লেখা আছে ঃ কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, প্রকৃতিবিদ'। বুড়ো-ঘুঘুর বাসা বলে পরিচিত ফ্ল্যাটের মধ্যে এখন কাচের জার ভর্তি। তাতে প্রজাপতি-পোকামাকড়েরা ডিম পাড়ছে। হরেক পাখপাখালির মমি সাজানো

রয়েছে। দুর্লভ এবং বিরল প্রজাতির নমুনা। কিন্তু হে বৃদ্ধ, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তাছাড়া অভ্যাস যায় না মলে। দশ কিলোমিটার দূরে লিটনগঞ্জে হেভিওয়াটাব প্ল্যান্টের রহস্যময় দুর্ঘটনা আর ভারুণ্ডি ফরেস্ট বাংলোয় এক প্রাক্তন গোয়েন্দার অবস্থিতি কি নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার? দুয়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই? আমি মোটেও বিশ্বাস করি না।"

কর্নেল জোরে মাথা দুলিয়ে বললেন, "একেবারে কাকতালীয়। আমাকে সরকার ওসব ব্যাপারে কোনও অনুরোধ করেননি। আমি এসেছি উড-ডাকের খবর পেয়ে। খবরের কাগজের লোক হলেও ওসব খবরে তোমার মাথাব্যথা থাকে না। নইলে সম্প্রতি ভারুণ্ডির জঙ্গলে উড-ডাকের আবির্ভাবের খবর তোমার চোখে পড়ত। যাক গে, এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে। আমি চৌকিদারকে দেখি। ততক্ষণ তুমি ফায়ারপ্লেসের অগ্নিকুণ্ডটার দায়িত্ব নাও। কাঠ গুঁজে দিতে ভুলো না যেন।"

উনি বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি বসে আছি তো আছিই। আর ওঁর পাত্তা নেই। বাংলো গোরস্থানের মতো স্তব্ধ। একা বসে থাকতে গা ছমছম করছে। প্রায় দুঘণ্টা পরে কর্নেল ফিরলেন। বললুম, "এত দেরি যে?"

কর্নেল বললেন, "রাতের কাজটুকুও সেরে এলুম। আশা করি, আমার সেই অত্যদ্ভুত ক্যামেরার কথা তুমি ভোলনি।"

"হ্যাঁ, অত্যদ্ভুত ক্যামেরাই বটে। প্রতাপগড় জঙ্গলে ওটা পেতে রাখতে দেখেছিলম সেবার। জন্তুদের জল খেতে যাওয়ার পথে গাছের ডালে বেঁধে রেখেছিলেন। একটা তার নিচে মাটিতে পোঁতা ছিল। ক্যামেরার লেন্সের সামনে দিয়ে পঞ্চাশ গজ অবধি মাটিতে কেউ হেঁটে গেলেই অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক সিস্টেমে সেই স্পন্দন ধরা পড়বে এবং আপনা-আপনি শাটারটা ক্লিক করবে। ফ্ল্যাশ বালব জ্বলবে এবং ছবি উঠে যাবে। কর্নেলের মতে, জন্তুদের স্বাভাবিক চেহারার ছবি এভাবেই তো সহজ।"

বললুম, "কোথায় ক্যামেরা পেতে এলেন?"

চাপা হেসে কর্নেল বললেন, "ডঃ গিনতির কুমড়োখেতে। কারণ, তখন ওখানে কয়েকটা অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখছিলুম। ওটা কী প্রাণী দেখা দরকার।"

বুড়োর বাতিকের কোনও তুলনা নেই। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন একমাত্র ভাবনা, সকাল হলেই আমাকে কেটে পড়তে হবে। লিটনগঞ্জ হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের রিপোর্ট কীভাবে লিখব, তাই ভাবতে থাকলুম। কর্নেলও অবশ্য আর মুখ খুললেন না। কেমন গম্ভীর হয়ে চুরুট টানতে থাকলেন।

খেয়েদেয়ে শুতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। ক্লান্তির ফলে কখন ঘুমিয়ে গেছি। সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। দেখি, সকাল হয়ে গেছে। কর্নেল অভ্যাসমতো কখন এই প্রচণ্ড শীতের ভোরে বাইরে ঘুরে এসেছেন। গায়ে ওভারকোট, মাথায়

হনুমানটুপি, হাতে ছড়ি। বললেন, "গুড মর্নিং! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে। এখন উঠে পড়ো এবং দ্রুত চোখমুখ ধুয়ে এসো।"

বললুম, "দ্রুত কেন? কোথাও বেরুবেন বুঝি?"

"বেরুব। অবশ্য তাতে তোমার লাভই হবে। কথা দিচ্ছি।"

"লাভের দরকার নেই। আমি সোজা গিয়ে ট্রেন ধরব।" বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলুম।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে দেখি কর্নেল বিছানায় ফোটোর গুচ্ছের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "জয়ন্ত আমার রাতের ফসল। দেখে যাও, তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।"

একটা ফোটো তুলে নিয়ে সত্যি-সত্যি চক্ষু চড়কগাছ আমার। এ কী দৃশ্য! কুমড়োখেতে একটা বিশাল কুমড়োর ওপর ঝুঁকে ডঃ গিনতি কী যেন করছেন, এক হাতে খুদে টর্চ রয়েছে। বললুম, "কী ব্যাপার?"

কর্নেল হাসলেন। "ডঃ গিনতি নিশ্চয় রাতদুপুরে নিজের কুমড়ো নিজে চুরি করছেন না।"

"তাহলে কী করছেন? নিশ্চয় কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-টরীক্ষা করছেন।"

"ঠিক তাই। অসাধারণ ওঁর গবেষণা।" কর্নেল তারিফ করে বললেন। "খুব অধ্যবসায়ী লোকও বলব, জয়ন্ত। যাক্‌গে। সেই অদ্ভুত পায়ের ছাপের রহস্য রহস্যই থেকে গেল। সম্ভবত জন্তুটা ওঁকে দেখে আর ওখানে পা বাড়ায়নি।"

চৌকিদার কফি দিয়ে গেল। কফি খাওয়ার পর কর্নেল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "জয়ন্ত, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বলে আমাকে আপত্তির সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে টানতে-টানতে বেরুলেন। কুয়াশার ফাঁকে হালকা রোদ ফুটেছে। কিন্তু ঠান্ডার কথা না তোলাই ভালো। বাংলো থেকে উতরাই রাস্তায় আমরা নেমে গেলুম কিছুদূর। তারপর সমতলে আরও কিছুটা এগিয়ে চমকে উঠলুম। গাছপালার আড়ালে একটা জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিপে কারা বসে আছে। কর্নেল তাদের দিকে হাত ইশারা করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঝোপে ঢুকলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে জয়ন্ত। একটু কষ্ট করো।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

"স্বচক্ষে দেখবে। চলো।"

পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, উপায় কী! ঝোপঝাড় ও পাথরের আড়ালে এগোচ্ছি। ঠান্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনছি। কতক্ষণ পরে কর্নেল একটু উঁচু হয়ে চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন, "এসে গেছে! দেখবে নাকি জয়ন্ত? দ্যাখোই না।"

বাইনোকুলারে চোখ রাখতেই ডঃ গিনতির খামারবাড়ির গেট নজরে পড়ল। একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকের গায়ে যা লেখা আছে, স্পষ্ট পড়তে পারছি। উন্মর

সিং ক্যাটারিং কোম্পানি। ট্রাকে তরিতরকারি বোঝাই হচ্ছে। ডঃ গিনতি এবং তাঁর লোকেরা তদারক করছেন। আমি মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। এই স্বাভাবিক ব্যাপারে এত লুকোচুরি বা ওত পেতে বেড়ানোর কারণ কী?

হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, "চলে এসো জয়ন্ত। পাখি ফাঁদে পড়েছে।"

তারপর আমার প্রায় বাঘের লেজে-বাঁধা শেয়ালের অবস্থা হল। খামারবাড়ির গেটে পৌঁছে ফের চমকে উঠলুম। ট্রাক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী এক দঙ্গল পুলিশ। ডঃ গিনতি দুহাত তুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। কর্নেলকে দেখে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "দেখছেন, দেখছেন কর্নেল, কী জঘন্য অত্যাচার।"

কর্নেল গম্ভীরমুখে কোনও কথা না বলে ট্রাকের কাছে গেলেন এবং কাঠবেড়ালির মতো উঠে পড়লেন। তারপর হেঁট হয়ে একটা বিশাল কুমড়ো তুলে বললেন, "আসুন মিঃ শর্মা। খুব সাবধানে ধরবেন। কিন্তু এর মধ্যে সাংঘাতিক এক্সপ্লোসিভ আছে। বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।"

একজন পুলিশ-অফিসার হাত বাড়িয়ে কুমড়োটা নিয়ে সাবধানে ধরে রইলেন কর্নেল নেমে এসে তাঁর হাত থেকে কুমড়োটা নিলেন। তারপর মাটিতে রেখে বোঁটার কাছে চাপ দিলেন। একটা লম্বাচওড়া ফালি উঠে এল। উঁকি মেরে দেখি, ভেতরে একটা ধূসর রঙের মস্ত গোল জিনিস ভরা রয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি খুলে গেল। থরথর করে কাঁপতে থাকলুম।

কর্নেল বললেন, "তাহলে বুঝতে পারছ জয়ন্ত, তোমার কাজের জন্যে কেমন একখানা স্টোরি পেয়ে গেলে! আশা করি, এবার এও বুঝেছ যে, লিটনগঞ্জের হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় টাওয়ারকেও ধ্বংস করার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ক্যান্টিনে এই বিশেষ চিহ্নিত কুমড়োটি যেত এবং সেখান থেকে পাচার হতো টাওয়ারের মধ্যে যাকগে, আমার কাজ শেষ। বাকি যা কিছু, মিঃ শর্মার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো এসো জয়ন্ত, আমরা বাংলোয় ফিরি। তোমার ট্রেন সেই এগারোটায়। ততক্ষণ তুমি এই অকালকুষ্মাণ্ডের রহস্যময় কাহিনির একটা খসড়া করে নিতে পারবে। তবে মনে রেখো, কুমড়ো-রহস্য আমি দৈবাৎ টের পেয়েছিলুম। প্রজাপতি ধরা জাল পাততে গিয়েই।"

আসতে-আসতে শুনলুম, পেছনে ডঃ গিনতি গর্জে বলছেন, "নেমকহারাম আমার পাজামা-পাঞ্জাবি-কম্বলটা পর্যন্ত এখনও ফেরত দিল না।"

ওজরাকের পাঞ্জা

কালো পাথরের মতো দেখতে জিনিসটাকে...আলো পড়লেই ঠিকরে পড়ত হরেক রশ্মি...চরকির মতো ঘুরত রশ্মিগুলো...ধাতু-বিজ্ঞানীও বলতে পারেননি ধাতুটা কী! রহস্যময় এই বস্তুটাই চুরি গেল আরও রহস্য-জনকভাবে রাতদুপুরে কান্দ্রা উপত্যকায়...পাহাড় থেকে নেমে এল ঝোড়ো হাওয়া...শোনা গেল ঘুঙুরের শব্দ...নিভে গেল সব আলো! তারপর?

॥ বেহালা-রোগ ॥

সেদিন সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় গিয়ে তাঁর প্রিয় ভৃত্য ষষ্ঠীচরণকে কেমন যেন মনমরা লক্ষ করছিলুম। কর্নেল তখনও ছাদে ক্যাকটাস এবং অর্কিডের সেবায় মশগুল। এসব সময় অবস্থা মৌনীবাবাদের মতো। তাই নিচের ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিলুম। ষষ্ঠী যথারীতি কফি দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুখটা বেজায় গম্ভীর। চেহারা উস্কোখুস্কো। চোখের তলায় যেন কালি। জিগ্যেস করেছিলুম, অসুখ-বিসুখ নাকি?

ষষ্ঠী শুধু মাথা নেড়েছিল। এ-রকম মাথা নাড়ার মানে হ্যাঁ বা না যে কোনওটাই হতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে কফির পেয়ালা নিতে এল সে। তখন বললুম, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন ষষ্ঠী?

ষষ্ঠীচরণ দাঁড়িয়ে মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। তারপর গলার ভেতর বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না দাদাবাবু!

—আহা! তোমার হয়েছে কী বলবে তো?

এবার ষষ্ঠী নিজের মাথাটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলল, আমি হয়তো আর বাঁচব না দাদাবাবু। আমার মাথার ভেতর কী একটা হয়েছে দুদিন থেকে। বাবামশাইকে বললুম, তো হেসে উড়িয়ে দিলেন। ইদিকে আমার মাথার ভেতর খালি বেহালা বাজছে!

অবাক হয়ে বললুম, বেহালা বাজছে? সে আবার কী?

আজ্ঞে হ্যাঁ! এই তো এখনও বাজছে। —ষষ্ঠী করুণ মুখে বলল। —মাঝে মাঝে বাজছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলুম কেউ কোথাও বেহালার বাজনা শিখছে। এ-বাড়ির সব ফেলাট, আশেপাশের বাড়ির সব ফেলাট, খুব খোঁজাখুঁজি করেছি। শেষে বুঝতে পেরেছি আমার খুলির ভেতর বাজছে। আমার বড় কষ্ট দাদাবাবু!

হঠাৎ চমকে উঠলুম। এ কী! আমার মাথার ভেতরও যেন বেহালা বাজছে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি। এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অত্যন্ত ক্ষীণ সুরে ঝিঁঝিপোকার ডাকের মতো কোঁ-কোঁ করে বেহালা বাজছে। ষষ্ঠী আমার মুখের অবস্থা দেখে কী বুঝল কে জানে, ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে কফির পাত্র নিয়ে চলে গেল।

বড় ভাবনায় পড়ে গেলুম। কলকাতায় একেক সময় একেক রকম উদ্ভুট্টে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই বেহালা-রোগ নিশ্চয় সংক্রামক। ষষ্ঠীর হাতে কফি খাওয়ামাত্র আমাকে ধরেছে। দুহাতে মাথা আঁকড়ে ধরে জোর ঝাঁকুনি দিলুম। মাথায় বারকয়েক গাঁট্টা মারলুম। তখন হঠাৎ অতিসূক্ষ্ম বেহালার সুরটা থেমে গেল।

কিন্তু একটু পরেই ফের শুরু হয়ে গেল মারাত্মক সেই বাজনা। কোঁ-কোঁ-কোঁ-কোঁ—অস্বস্তিকর হতচ্ছাড়া একটা সুর। আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে গেল। এই সময় কোণার দিকে সিঁড়িতে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর্তনাদের সুরে চেঁচিয়ে উঠলুম, কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের পরনে গার্ডেনিংয়ের পোশাক। হাতে খুরপি এবং সাদা দাড়িতে শুকনো পাতা। আমার দিকে দৃকপাত না করে সটান বাথরুমে ঢুকলেন। আমি মরিয়া হয়ে আবার মাথায় গাঁট্টা মারতে থাকলুম। বাজনাটা যেন কর্নেল আসার পরই বেড়ে চলেছে। মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য বেহালার ছড়ি ধারাল করাতের মতো আমার ঘিলুকে ফালা-ফালা করছে।

তারপর কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম। —জয়ন্ত কি ইদানিং বক্সিং শিখতে শুরু করেছে? আমার মনে হয়, নিজের মাথার চেয়ে এ ব্যাপারে বালি ভর্তি একটা বস্তাই উপযুক্ত জিনিস।

বোবা-ধরা গলায় বললুম, বক্সিং নয়, বক্সিং নয়। মাথার ভেতর কী একটা কেলেঙ্কারি।

—অ্যাসপিরিন বড়ি খাও!

—না, না। বেহালার বাজনা। ওঃ! আমার মাথার ভেতর কেউ বেহালা বাজাচ্ছে!

কর্নেল আসতে-আসতে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। পর্দার ফাঁকে ষষ্ঠীচরণের মুন্ডু দেখা যাচ্ছিল। সে বলে উঠল, বাবামশাইকেও ধরবে বেহালা রোগে। পেথমে আমাকে ধরল। তা'পরে কাগুজে দাদাবাবুকে ধরল। প্রিতিকার না করলে আপনাকেও ধরবে। তখন বুঝবেন কী কষ্ট!

কর্নেল ঘুরে চোখ কটমটিয়ে তাকালেন ওর দিকে। ষষ্ঠী মুন্ডু সরিয়ে নিল পর্দার আড়ালে। তারপর কর্নেল আমার দিকে ঘুরে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, আপনি হাসছেন! পারছেন হাসতে? কোথায় ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করবেন, তা নয়, মজা দেখছেন। ঠিক আছে। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়াতেই কর্নেল এগিয়ে এসে আমার কাঁধে থাবা হাঁকড়ালেন। তারপর হিড়হিড় করে টেনে একটা অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ওটা কী?

হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতর একটি কালচে বাদামি রঙের

জলচর জীব রয়েছে। দেখতে-দেখতে বললুম, কাঁকড়া বলে মনে হচ্ছে।

—এই কাঁকড়াটির সঙ্গে তোমার এবং ষষ্ঠীর বেহালা-রোগের সম্পর্ক আছে।

—তার মানে?

কর্নেল আবার অট্টহাসি হেসে বললেন, দেখতে পাচ্ছ? কাঁকড়ার সামনের একটা লম্বাটে ঠ্যাং মুখের কাছে বেঁকে তিরতির করে কাঁপছে। জলে বুজকুড়ি ওঠাও তো দেখতে পাচ্ছ।

—পাচ্ছি। কিন্তু—

—একে বলে ফিডলার ক্র্যাব। বেহালা-বাজিয়ে কাঁকড়া।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘিলু পরিষ্কার হয়ে গেল। আমিও হো-হো করে হাসতে লাগলুম। পর্দার আড়ালে ষষ্ঠীরও খিক-খিক হাসি শোনা গেল। ওই হতচ্ছাড়া কাঁকড়াটাই তাহলে বেহালা বাজাচ্ছে এমন সুরে!

কর্নেল একোয়ারিয়ামের দিকে ঝুঁকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন,—লক্ষ করো ডার্লিং, ফিডলার কাঁকড়ার দুপাশের দুটো সাঁড়াশির মতো হাত কিন্তু একই গড়নের নয়। একটা ছোট্ট, অন্যটা বড়। এ এক সৃষ্টিছাড়া জীব। জীবজগতে যে সব প্রাণীর হাত আছে, তাদের দুটো হাতের গড়ন ও আয়তন একইরকম। শুধু ফিডলার কাঁকড়া ব্যতিক্রম। এক অদ্ভুত বৈষম্যের প্রতীক।

আমরা সোফায় এসে বসলুম। কর্নেলের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। কর্নেল আমাকে হাত লাগাতে ইশারা করলেন। বললুম, ধন্যবাদ। জব্বর ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়েছি।

খেতে খেতে কর্নেল আবার ফিডলার কাঁকড়া নিয়ে পড়লেন। —ফিডলার কাঁকড়াকে অদ্ভুত বৈষম্যের প্রতীক বলেছি। কেন বলেছি, তার ব্যাখ্যা করতে হলে পদার্থবিজ্ঞানের ল অফ প্যারিটি বা সাদৃশ্যের নিয়ম সম্পর্কে মোটামুটি কিছু ধারণা দরকার।

বেগতিক দেখে বললুম, কী দরকার আর? বেহালা-রোগ তো সেরে গেছে!

কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না আমার কথা। বললেন, জয়ন্ত, পদার্থবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি যা কিছু সৃষ্টি করেছে, সবই যেন জোড়ায়-জোড়ায় করেছে। একটা অপরটার ঠিক উলটো। উপমা দিয়ে বলছি—যেমন কিনা, তোমার ডানহাত আর বাঁহাত। সাদৃশ্যের নিয়ম অনুসারে বলা যায়, প্রকৃতি কিছু জিনিস যেন ডানহাতের পাকে—তকলিতে পাক ঘুরিয়ে সুতো কাটার মতো আর কী, এবং কিছু জিনিস বাঁহাতের পাকে তৈরি করেছে। ইংরেজিতে একে বলে নেচারস রাইটহ্যান্ড টুইস্ট অ্যান্ড লেফটহ্যান্ড টুইস্ট। একটা অন্যটার উলটো—যেন দর্পণবিম্ব। দেখা যাবে, সব অসমানুপাতিক গড়নের জিনিসের দর্পণবিম্ব একেবারে উলটো। যেমন আয়নার সামনে দাঁড়াও। দেখবে তোমার ডানহাতে বাঁহাত হয়ে গেছে এবং বাঁহাত হয়ে গেছে ডানহাত। কিন্তু সমানুপাতিক গড়নের জিনিস—ধরো একটা গ্লাস, আয়নার ভেতর একইরকম দেখাবে। উলটো দেখাবে না। মজাটা

হল, মানুষের হাত বা জলের গ্লাস এসব উদাহরণ নেহাত স্থূল উপমা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক অসমানুপাতিক আণবিক গড়নের জিনিস পরীক্ষা করে দেখা গেছে এরকম দুটো জিনিস বাইরে-বাইরে দেখতে একই রকম, অথচ আণবিক গড়নে পরস্পর উলটো। একটা যেন অপরটার দর্পণবিম্ব। ইংরেজিতে বলা হয়, মিরর-ইমেজ। কিন্তু এখানেই বিপদ। কোনও জিনিস যদি তার ওই মিরর-ইমেজের মতো জিনিসের —তার মানে উলটোসত্তার সংস্পর্শে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংসটা কী রকম তারও উপমা দিই। ধরো, একটা লাঠির গায়ে একটা দড়ি ডানপাকে ঘুরিয়ে জড়িয়ে রেখেছ। কিন্তু দড়িটা বাঁপাকে ঘোরালেই কী ঘটবে? দড়ি ও ছড়ি আলাদা হয়ে যাবে। এই হল নেচারস রাইটহ্যান্ড টুইস্ট আর লেফটহ্যান্ড টুইস্টের রহস্য।

কান ভোঁ-ভোঁ করছিল। কর্নেল জলের গ্লাস তুলে নিয়ে জল খেতে গিয়ে হঠাৎ থামলে আবার শুরু করবেন ভেবে দ্রুত বললুম, বুঝেছি আপনি আসলে ম্যাটার-অ্যান্টিম্যাটারের কথা বলছেন।

কর্নেল জল খেয়ে গ্লাসটা রেখেছেন, এমন সময় কলিংবেল বাজল। তারপর ষষ্ঠী এসে একটা ভিজিটিং কার্ড দিল। কার্ডটাতে চোখ বুলিয়ে কর্নেল যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

কর্নেলের সঙ্গে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখে আমিও চঞ্চল হয়ে উঠলুম। কান্দ্রার নবাব মির্জা আজমল খানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গত ডিসেম্বরে দিল্লিতে, ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ প্রকেটশান সোসাইটির সম্মেলনে। ভদ্রলোক একজন প্রখ্যাত ওরিন্থোলজিস্ট অর্থাৎ পক্ষিবিজ্ঞানী। বোম্বের সালিম আলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সালিমসায়েবও সেই সম্মেলনে এসেছিলেন।

মির্জাসায়েব অমায়িক এবং খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ। কর্নেলের মতোই তাগড়াই ফর্সা চেহারা। তবে কর্নেলের মুখে সাদা দাড়ি এবং মাথায় প্রশস্ত টাক, মির্জাসাহেবের মুখে শুধু বিশাল গোঁফ, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া মাকড় চুল। বয়সে দুজনেই অবশ্য ষাটের ওধারে।

মির্জাসায়েব সোফায় বসেই ঘোষণা করলেন, আপনাদের নিতে এলুম। —বলে আমার দিকে ঘুরলেন। —হ্যাঁ, আপনাকেও। কারণ ভেবে দেখলুম, একজন সাংবাদিকেরও এসব বিষয়ে জড়িত থাকা উচিত।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, কীসব বিষয়ে বলুন তো?

—বলছি। বলে হঠাৎ মির্জাসাহেব মাথাটা জোড়ে নাড়া দিলেন। বললেন, আরে কী মুশকিল!

—কী হল মির্জাসায়েব?

—হঠাৎ মাথার ভেতর কী যেন—

—বেহালারা বাজনা নয় তো? —বলে উঠলুম সঙ্গে-সঙ্গে।

মির্জাসায়েব মাথাটা আবার ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, সর্বনাশ! বেহালার বাজনার মতো মাথার ভেতর এ কী বিশ্রী উপদ্রব শুরু হল!

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, ফিডলার ক্র্যাব। ওই অ্যাকোয়ারিয়ামে বসে বেহালা বাজাচ্ছে।

তাই বলুন! —কান্দ্রার নবাব হা-হা করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন।...

॥ ঘুঙুরপরা চোর! ॥

কফিতে চুমুক দিয়ে মির্জাসাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, এখনও লোকে আমাকে মির্জা-নবাব বলে ডাকে। খাতিরও করে। কিন্তু নবাবি তো কবে ঘুচে গেছে। প্রিভিপার্স বাবদ বার্ষিক বৃত্তিও সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। সেজন্য অবশ্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ধনসম্পদে আমার কোনওদিনও রুচি ছিল না। কিন্তু জিনিসটা আমার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত সম্পদ। বাজারে নিশ্চয় ওটার অনেক টাকা দাম। দামের জন্য নয়, একটা পারিবারিক ও বংশানুক্রম পবিত্র স্মৃতির প্রতীক বলেই আমার কষ্ট হচ্ছে।

কর্নেল বললেন, জিনিসটা বলতে কোনও রত্নের কথাই হয়তো বলছেন। সেটা কি চুরি গেছে?

কান্দ্রার নবাব নিশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ। খুব রহস্যময় চুরি।

—কবে চুরি গেছে?

—গত ২৫ মার্চ রাত্রে। আমি তখন কান্দ্রা লেকের ধারে তাঁবুতে ছিলুম। খবর পেয়েছিলুম হিন্দুকুশ থেকে একঝাঁক ভরত পাখি এসেছে। দুদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। ২৬ মার্চ সকালে খবর পেলুম 'নুরে আলম' চুরি গেছে। নুরে আলম কথাটার মানে ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতি। এমন নামের কারণও ছিল। ওটা একটা অত্যাশ্চর্য রত্ন। বিস্তর জহুরিকে দেখানো হয়েছে। কেউ বলতে পারেনি ওটা কী। কালো রঙের পাথরের মতো দেখতে। অথচ আলো পড়লেই নীল লাল সাদা সবুজ হরেক রঙের রশ্মি ঠিকরে পড়ত আর সেই রশ্মিগুলো চরকির মতো ঘুরত। একবার এক ধাতু-বিজ্ঞানীকে দেখিয়েছিলুম। তিনিও চিনতে পারেননি ওটা কী ধাতু।

—হুঁ। কীভাবে চুরি গেছে?

—কান্দ্রা উপত্যকায় এই সময়টা মাঝরাতে পাহাড় থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া নেমে আসে। গ্রীষ্ম অবধি এটা দেখা যায়। ২৫ মার্চ রাতে ঝড়টা যখন আসে, হঠাৎ বাড়ির সব আলো নিভে গিয়েছিল। ঝড়টা মিনিট কুড়ি ছিল। ওই সময় দারোয়ান একটা অদ্ভুত শব্দ শোনে। শব্দটা কতকটা ঘুঙুরের মতো। কেউ যেন পায়ে অসংখ্য ঘুঙুর বেঁধে ঝমঝম করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাবুর্চি কিসমত খাঁ বলেছে, সে অন্যরকম শব্দ শুনেছে। শিসের শব্দের মতো। তারপর—

—আগে বলুন, নুরে আলম ছিল কোথায়?

—আমার বেডরুমে দেয়ালে আঁটা আয়রন চেস্টের ভেতর। চোর সেটার একটা পাল্লা সম্ভবত গ্যাসের আগুনে—তার মানে, অ্যাসিটিলিনে গলিয়ে তরল করেছে। তারপর জিনিসটা হাতিয়েছে।

দরজা বন্ধ ছিল বাইরে থেকে?

—নিশ্চয় ছিল। তালা গলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হল, দরজার বাইরে আমার এক পরিচারক কুদরত খাঁয়ের লাশ পড়ে ছিল। নিশ্চয় সে টের পেয়ে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, তার লাশ একেবারে পুড়ে ছাই! একদলা ছাই তুলে কবর দেওয়া হয়েছে।

—ছাই! কর্নেল অবাক হয়ে বললেন। —পোস্টমর্টেম হয়নি?

—কীভাবে হবে? তবে একমুঠো ছাই পুলিশ দিল্লির ফরেন্সিক এক্সপার্টদের কাছে পাঠিয়েছিল, তাঁদের মতে, প্রচণ্ড ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে গেছে কুদরত খাঁর শরীরে।

—বাজ পড়ে মারা গেলেও কিন্তু লাশ পুড়ে ছাই হয় না।

—হ্যাঁ। তাছাড়া ঘরের ভেতর বাজ ঢুকবে কীভাবে? বাজের তো ঠ্যাং গজায়নি।

আমি বললুম, শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মড়া পুড়িয়ে ছাই করা হয়। নিশ্চয় অতটা ভোল্টেজ না হলে কুদরত খাঁর দেহ ছাই হতো না!

মির্জা-নবাব কফি শেষ করে বললেন, তাহলেই বুঝুন কেমন চোর!

কর্নেল একটু হেসে বললেন, বৈদ্যুতিক চোর!

মির্জাসায়েবের মুখে অবশ্য হাসি ফুটল না। উনি জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে কিছু বের করছিলেন। ভাবলুম সিগারেটের প্যাকেট বের করছেন। কিন্তু তার বদলে বের করলেন কাগজে জড়ান একটা চাকতির মতো জিনিস। মোড়ক খুললে দেখলুম, জিনিসটা একটা কালো রঙের চাকতি। আয়তনে রূপোর টাকার চেয়ে সামান্য বড়। চাকতিটার দুপিঠেই সাদা আঁকজোক।

সেটা কর্নেলের হাতে দিয়ে কান্দ্রার নবাব বললেন, এই জিনিসটা কুদরত খাঁয়ের লাশের কাছে পড়েছিল। ফরেন্সিক টেস্ট করানো হয়েছে। ওঁরা বলতে পারেননি এটা কোনও ধাতু না পাথর। কোনও জৈব পদার্থও নয়। মোট কথা, এটা বিজ্ঞানীদের এ পর্যন্ত জানা কোনও পদার্থের মধ্যে পড়ে না।

কর্নেল উঠে গিয়ে তাঁর আতস কাচ নিয়ে এলেন। তারপর পরীক্ষা করতে-করতে বললেন, উঁহু—এই আঁকজোকগুলো ফার্সি হরফ নয়। কী ভাষা কে জানে!

মির্জাসায়েব বললেন, কর্নেল এই জিনিসটাকে কান্দ্রার লোকেরা বলে ওজরাকের পাঞ্জা।

কর্নেল মুখ তুললেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, ওজরাকের পাঞ্জা!

আমি অবাক হয়ে বললুম, ওজরাক! সে আবার কে?

কান্দ্রার নবাব বললেন, ওখানকার লোকে—বিশেষ করে পশুপালক গুজর উপজাতির লোকেরা বংশপরম্বরায় বিশ্বাস করে, কান্দ্রা উপত্যাকার পশ্চিমের পাহাড়ে বাস করে ওজরাক নামে এক মায়াবী জাদুকর। তার নাকি উড়ন-খাটোলা বা উড়ন্ত খাটিয়া আছে। তাতে চেপে মাঝে-মাঝে ওজরাক বেড়াতে যায় নক্ষত্রের দেশে।

হাসতে-হাসতে বললুম, রীতিমতো রূপকথা!

কে জানে! —মির্জাসায়েব বললেন। —ওজরাক নাকি খেয়ালবশে কখনও তার পাহাড়পুরী থেকে নেমে আসে কান্দ্রা উপত্যকায়। যখনই আসে, এই পাঞ্জা ফেলে রেখে যায়। যেন জানিয়ে যায়, আমি এসেছিলুম।

—আপনি বিশ্বাস করেন এসব কথা?

—মোটেও করি না। কিন্তু ২৫ মার্চ রাত্রে যখন লেকের ধারে তাঁবুতে ছিলুম, ঝড় ওঠার সময় দূরে আকাশ থেকে একটা আলো নেমে আসতে দেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, উল্কা কিংবা কান্দ্রা অবজারভেটরির আবহাওয়া বেলুন। কে জানে কী!

—আর কারুর কাছে ওজরাকের পাঞ্জা আছে জানেন? দেখেছেন এমন পাঞ্জা?

—দেখেছি। গুজরদের সর্দার হালাকু একটা পাঞ্জা কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। দেখিয়েছিল আমাকে।

কর্নেল চাকতিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। কান করে শুনি, বিড়বিড় করে বলছেন, ওজরাকের পাঞ্জা...ওজরাকের পাঞ্জা...ওজরাক...ওজরাক...

তারপর সোজা হয়ে বসলেন। —মির্জাসাহেব! এগুলো হরফ নয়। প্রতীক চিহ্ন। পাঁচটা করে আঁকা-বাঁকা সাদা রেখা আসলে বজ্রচিহ্ন।

এই বলে উনি হন্তদন্ত উঠে গেলেন বুকশেলফের কাছে। একটা প্রকাণ্ড বই টেনে পাতা ওলটাতে থাকলেন। তারপর উজ্জ্বল হাসি নিয়ে সোফায় ফিরলেন। বললেন, আমার স্মৃতিশক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে দ্রুত। প্রকৃত বার্ধক্যের লক্ষণ চুলদাড়ি সাদা হওয়া বা বয়স বেশি হওয়াতে নেই। যাই হোক, এই বইটা হল রিচার্ড কেলির লেখা 'এ শর্ট ওয়াক ইন দি কারাকোরাম অ্যান্ড হিন্দুকুশ।' পর্যটক কেলি ১৮৭৯ সালে কাশ্মীর, আফগানিস্তান আর পামির অঞ্চলে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ওই সময় তিনি স্থানীয় লোকেদের কাছে ওজরাকের পাঞ্জার কথা শোনেন। তবে তিনি জিনিসটা দেখেননি।

মির্জাসায়েব জিগ্যেস করলেন, ওজরাকের গল্পও তাহলে শুনে থাকবেন কেলি। লিখেছেন কিছু?

কর্নেল জবাব দিলেন, হ্যাঁ। কেলির মতে, ওটা স্রেফ রূপকথা।

কর্নেলের হাত থেকে পাঞ্জাটা চেয়ে নিলুম। দেখতে-দেখতে বললুম, এটাকে পাঞ্জা বলার কারণ কী?

মির্জাসায়েব বললেন, পাঞ্জা এসেছে পাঞ্জ শব্দ থেকে। ফার্সি পাঞ্জ আর সংস্কৃত পঞ্চ একই শব্দ। কিন্তু পাঞ্জা বলতে বোঝায় হাতের পাঁচটা আঙুলের ছাপ। আগের

দিনে বাদশারা কোনও হুকুমজারি করলে কিংবা সরকারি চিঠিপত্তর পাঠালে তাতে পাঁচটা আঙুলের টিপছাপ মেরে দিতেন। সই জাল করা যায়। কিন্তু আঙুলের ছাপ জাল করলে ধরা পড়বেই। কারণ প্রত্যেকটি মানুষের আঙুলের ছাপ আলাদা। এই কালো চাকতির পাঁচটা বজ্রচিহ্নকে কান্দ্রার লোকেরা ওজরাকের পাঁচ আঙুলের ছাপ বলে বিশ্বাস করে।

কর্নেল মন্তব্য করলেন, ওজরাকের পাঞ্জায় বজ্রচিহ্ন থাকার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ওজরাক বজ্রদেবতা।

আমার মাথায় চমক খেলে গেল। বললুম, কর্নেল! ওজরাক শব্দটা বজ্রের অপভ্রংশ নয় তো?

তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, জয়ন্ত। কর্নেল বইটা রাখতে গেলেন শেলফে। রেখে এসে ফের বললেন, ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতে, ওইসব অঞ্চলের সব ভাষা ও উপভাষার উদ্ভব ঘটেছে একটা পুরনো ভাষা থেকে, যাকে বলা যায় ইন্দো-ইরানী মূল ভাষা। তাই ভারতীয় প্রধান ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে ওদের মিল দেখা যায় এত।

মির্জাসায়েব একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, ভাষাতত্ত্ব থাক, কর্নেলসায়েব! আমার নুরে আলম চুরির ব্যাপারে কী করছেন বলুন!

কর্নেল অভ্যাসমতো চোখ বুজে দাড়িতে আঙুলের চিরুনি টানছিলেন। সেই অবস্থায় বললেন, ইদানিং দেশের বিভিন্ন যাদুঘর বা প্রত্নশালা থেকে বেশ কিছু ঐতিহাসিক রত্ন এবং মূর্তি চুরির হিড়িক পড়ে গেছে। না—কোথাও ওজরাকের পাঞ্জা পড়ে থাকতে দেখা যায়নি। তবে চুরির পদ্ধতি অনেকটা একরকম। অ্যাসিটিলিন প্রয়োগ করেছে চোর। সেইসঙ্গে আরও একটা মিল এখন দেখতে পাচ্ছি। চুরি হয়েছে দুপুর রাতে এবং...

হঠাৎ নড়ে বসলেন কর্নেল। চোখ খুলে বললেন, কী আশ্চর্য!

মির্জাসায়েব বললেন, কী ব্যাপার?

—ঝড় বা ঝোড়ো হাওয়া!

—তার মানে?

—প্রত্যেকটি চুরি হয়েছে গভীর রাতে এবং সেই সময় ঝড় বইছিল।

আমি বললুম, ঝড়ের সময় মওকা বুঝেই চোর এসেছিল হয়তো!

কর্নেল উঠে পায়চারি করতে-করতে উত্তেজিতভাবে বললেন, শুধু ঝড় নয়, অদ্ভুত সব শব্দ। মির্জাসায়েব বলছিলেন, দারোয়ান যেন ঘুঙুরের শব্দ শুনেছে। প্রত্যেকটি চুরির রিপোর্টে এর উল্লেখ আছে। রক্ষীরা বলেছে, যেন কোথায় ঝমর-ঝম শব্দে ঘুঙুর বেঁধে কেউ নাচছিল।

আমি ও কান্দ্রার নবাব নিঃশব্দে দেখাদেখি করছিলুম পরস্পরের দিকে। বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছিলুম না।

॥ ওজরাকের ইন্দ্রজাল ॥

কান্দ্রা উপত্যকার চারদিকেই উঁচু সব পাহাড়। পুবদিকে একটা গিরিবর্ত্ম আছে, যার নাম 'হায়দার পাস', কান্দ্রার নবাবের এক পূর্বপুরুষের নামে। স্থলপথে কান্দ্রায় ঢুকতে হলে হায়দার পাস হয়ে যেতে হয়। কিন্তু শীতের দু-তিনটে মাস ওই গিরিবর্ত্ম বরফ জমে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ যুগে বিমানের দৌলতে কান্দ্রা যাতায়াতে আগের মতো বাধাবিপত্তি নেই। বারোমাসই যাতায়াত চলে। শীতের সময়টা বিমানে, বাকি সময় মোটর গাড়িতে।

এখন এপ্রিলে হায়দার পাস খুলে গেছে। কান্দ্রায় বসন্ত ঋতুর সমারোহ। তবে এই ভূস্বর্গ ভ্রমণে খুব কড়াকড়ি আছে সরকার থেকে। প্রতিরক্ষা দফতরের কড়া নজর পর্যটকদের দিকে। অবজারভেটরি, রেডার কেন্দ্র, স্পেস রিসার্চ ল্যাবরেটরি, বিমানবাহিনীর ব্যারাক এবং একটি বিমানক্ষেত্র—কান্দ্রা ভ্যালিতে এতসব ব্যাপার। কাজেই কড়াকড়ি থাকা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি কান্দ্রা অবজারভেটরিতে যে টেলিস্কোপটি বসানো হয়েছে, সেটা এশিয়ার বৃহত্তম। অবজারভেটরির ডিরেক্টর ডঃ শীলভদ্র সোম কর্নেল এবং আমাকে ঘুরেফিরে সব দেখাচ্ছিলেন। কর্নেলের সঙ্গে ওর পরিচয় আছে দেখে অবাক হইনি। আজকাল কর্নেলের কোনও ব্যাপারে অবাক হই না।

দেখাশোনা শেষ হলে ডঃ সোম আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর অফিসঘরে। এখান থেকে কান্দ্রা উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত নজরে পড়ে। কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়ার ভেতর থেকে বললেন, ডঃ সোম ২৫ এবং ২৬ মার্চের অবজার্ভেশন রিপোর্টটা এবার দেখতে চাই।

কর্নেল ফাইলে মনোনিবেশ করলেন। ততক্ষণে কফি আর স্ন্যাক্স এসে গেল। নবাববাড়ি লাঞ্চ সেরে আমরা বেরিয়েছি। এখন প্রায় তিনটে বাজে।

কফি খেতে-খেতে রিপোর্ট পাঠ শেষ করে কর্নেল মুখ তুলে একটু হাসলেন। —মাঝরাতের ঝড়টার কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল তাহলে!

ডঃ সোম বললেন, ছিল। ১০ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডের ঝড়। সারা কান্দ্রা ভ্যালির পাওয়ার ফেল করেছিল অতক্ষণ। আমাদের অবজারভেটরির সব যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। সূক্ষ্ম কিছু যন্ত্র একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো রিপ্লেস করতে হয়েছে। মেরামত করেও চালু করা যায়নি। কিন্তু তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, কসমিক ডাস্ট পাওয়া গেছে ছাদের ফুলগাছের পাতায় এবং খোলা ট্যাংকের জলে।

কসমিক ডাস্ট—মহাজাগতিক ধুলিকণা! —কর্নেল সোজা হয়ে বললেন।

ডঃ সোম হাসতে-হাসতে বললেন, যেন মহাজাগতিক ঝড়ের একটা বিক্ষিপ্ত প্রবাহ পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢুকে পড়েছিল সে রাতে!

কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, এখানকার রেডার স্টেশন কী বলে?

ডঃ সোম একটা ফাইল নিয়ে এলেন। চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ—রেডারে দশ সেকেন্ডের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে অজানা কোনও বিমানের সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। তারপর সেটা রেডার-স্ক্রিন থেকে সরে যায় ডানদিকে—নিচে। এই দেখুন, গতিটা ধনুকের মতো বাঁকা দেখানো হয়েছে।

কর্নেল ফাইলটা নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বললেন, বিমানক্ষেত্রে ওইসময় কোনও বিমান নামেনি তাহলে?

—না। ওঁরা বলেছেন, প্রায়ই চীনা বিমান ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং পালিয়ে যায়। এও কোনও উন্নতধরনের চীনা বিমান হওয়া সম্ভব। কারণ ম্যাগনেটিক ফিল্ডে প্রচণ্ড অভিঘাত ধরা পড়েছিল।

আমি বললুম, নবাব মির্জাসায়েব লেকের ধারে তাঁবু থেকে ওদিকে একটা আলো নামতে দেখেছিলেন।

ডঃ সোম চমকে উঠলেন। কর্নেল একটু হেসে বললেন, উফো! আন আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট!

ডঃ সোমও হাসতে লাগলেন। —ঠিক তাই! শুধু মির্জাসায়েব কেন, কান্দ্রা এলাকার লোকে প্রায়ই উফো দেখে। এস. আর. এল. থেকে তদন্ত করে দেখা গেছে, কোনওটা আমাদের আবহাওয়া বেলুন, কোনওটা উল্কা, আবার কোনওটা চীনা গুপ্তচর বিমান অথবা কোনও স্পাইং ডিভাইস।

কর্নেল আবার ফাইলে চোখ রেখেছিলেন। বললেন, কান্দ্রা ভ্যালির পশ্চিম পাহাড় কি সত্যি দুর্গম, ডঃ সোম?

—ভীষণ দুর্গম। কোনও মানুষের পক্ষে ওই খাড়া গ্রানাইট দেয়াল বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

—প্লেনে?

—প্লেনের পক্ষে আজকাল অসম্ভব তো কিছুই নেই। কিন্তু তার ওধারে চীনের অসংখ্য ঘাঁটি আছে। তাই প্লেনে ওদিকে ঘোরাঘুরি নিরাপদ নয়।

—আপনি ওজরাকের কথা শুনেছেন, ডঃ সোম?

ডঃ সোম হাসতে-হাসতে বললেন, ছেলেভুলোনো রূপকথা!

—মির্জাসায়েবের পরিচারকের মৃতদেহ ছাই হওয়ার ব্যাপারে কী বক্তব্য?

ডঃ সোম গম্ভীর হয়ে বললেন, নবাববাড়িতে চুরি হওয়ার কথা শুনেছি। ওসব ব্যাপার পুলিশের এক্তিয়ারে পড়ে। তবে এটুকু বলতে পারি, চুরির সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাও জড়িত।

—কিন্তু সেজন্য যে প্রচণ্ড ভোল্টেজ দরকার, তা নবাববাড়ির ডোমেস্টিক লাইনে নেই।

—দেখুন কর্নেল, কোনওভাবে যদি আর্থলাইন নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে

অনেকক্ষেত্রে হেভি ভোলটেজ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। আবার ট্রান্সফর্মার থেকে যে সাপ্লাই লাইনে এসেছে, তার আর্থলাইন নষ্ট হলে ট্রান্সফর্মারও জ্বলে যায়। নবাববাড়ির পেছনেই একটা ট্রান্সফর্মার আছে। সেটা জ্বলে গিয়েছিল শুনেছি। কাজেই ডেডবডি ছাই হওয়ার মধ্যে অলৌকিক কিছু থাকতে পারে না। অনেক সময় সাপ্লাই লাইনে আর্থলাইনের গণ্ডগোলের জন্য আলো প্রচণ্ড বাড়ে ও কমে—যাকে বলে ফ্লাকচুয়েশান! একবার আমার কোয়ার্টারেই এমন হয়েছিল। ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছিল। বাল্ব কেটে গিয়েছিল। টি ভি, ফ্রিজ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল উঠলেন। —চলি ডঃ, সোম! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রয়োজনে আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসব।

অবশ্যই আসবেন। —ডঃ সোম করমর্দন করলেন কর্নেলের সঙ্গে। তারপর আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, জয়ন্তবাবু! আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আশা করি কাগজে লিখবেন।

ডঃ সোমের কাছে বিদায় নিয়ে যখন বেরুলুম, তখন কান্দ্রা উপত্যকায় বিকেলের গোলাপি রোদ্দুর নেমেছে। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা নেমেছে ঘুরে-ঘুরে। মির্জাসায়েবের গাড়িতে আমরা এসেছিলুম। ড্রাইভারের নাম বদর খাঁ। একখানে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে সে হিন্দিতে বলল, দেখুন সায়েব! ওজরাকের কথা জিগ্যেস করছিলেন—ওই দেখুন ওজরাকের দেশ! আজব জাদু দেখুন!

কর্নেল মুখ বাড়ালেন। আমি বললুম, কই জাদু, বদর খাঁ?

বদর খাঁ বলল, পশ্চিমদিকে নজর দিন, সায়েব!

আমাকে গাড়ি থেকে নামতে হল। কারণ গাড়ির মুখ উত্তরে এবং কর্নেল বসেছেন বাঁদিকে, আমি ডাইনে। নেমে গিয়ে হতবাক হয়ে পড়লুম।

ওই অপার্থিব সৌন্দর্যের কোনও তুলনা নেই। পশ্চিমের পাহাড়গুলোর চুড়ো কোনওটা গির্জার মতো ছুঁচলো, কোনওটা পিরামিডের মতো তিনকোনা। আর তাদের ফাঁক গলিয়ে পিচকিরির মতো রঙবেরঙের আলোর দীর্ঘ-দীর্ঘ ফালি উপত্যকার সবুজ সমভূমিতে নেমে আসছে। পাহাড়গুলোর কাঁধে ঘন নীল কুয়াশার আলোয়ান চাপানো যেন। কিন্তু বড় মায়াময় ওই রামধনুর মতো অথবা প্রিজমের মতো বিচ্ছুরিত বর্ণালী! এমন আশ্চর্য রঙের খেলা আর কখনও দেখিনি।

দেখতে-দেখতে ওজরাকের ওপর যেন বিশ্বাস এসে গেল। ওখানে কোনও মায়াবী জাদুকর বাস করে, তা মিথ্যা নয়। তার খেয়ালি হাতের অপরূপ ওই ইন্দ্রজাল দেখে যে তারিফ করবে না, সে কোনও মূর্খ! আমি ভাবে গদগদ হয়ে বললুম, অপূর্ব খাসা! কর্নেল, ওজরাককে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে।

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখেই নামিয়ে ফেললেন। —নাঃ! খালি চোখেই রঙের খেলাটা দেখা যাচ্ছে। তবে ডার্লিং! তুমি যতই বলো, এর মধ্যে কোনও যাদু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আশা করি, দার্জিলিঙের টাইগার হিল থেকে তুমি সূর্যোদয় দেখেছ!

আপত্তি করে বললুম, এটা সূর্যাস্ত। তাছাড়া কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা! কর্নেল, শুধু রঙিন আলো হলেও কথা ছিল! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না ওজরাকের জাদুপুরীও ক্রমশ ভেসে উঠেছে! ওই দেখুন, যেন রঙবেরঙের সাতমহলা প্রাসাদ ভাসছে শূন্যে।

বদর খাঁ বিড়বিড় করে কী আওড়াচ্ছিল চোখ বুজে। এবার দুহাতে মুখ ঘষে তাকে গাড়িতে ঢুকতে দেখলুম। বলল, চলে আসুন সায়েব! বেশিক্ষণ দেখলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। ওজরাক হল গিয়ে শয়তানের চেলা। শয়তানের কাছে জাদু শিখে মানুষকে ভোলায় সে। সেদিন ঠিক এমনি সময়ে হালাকুর মেয়ে ভেড়া চরাতে গিয়ে ওজরাকের পাল্লায় পড়েছিল! জোর বেঁচে পালিয়ে এসেছে।

গাড়ি আবার এগোল। কর্নেল বললেন, বদর খাঁ! হালাকু থাকে কোথায়?

বদর খাঁ বলল, লেকের দক্ষিণে এখান থেকে ছ-সাত মাইল দূরে ওদের তাঁবু।

—সেখানে গাড়ি করে যাওয়া যায় না বদর খাঁ?

—লেক অবধি গাড়ি যাবে। তারপর আধামাইল পায়দল যেতে হবে।

—নিয়ে যাবে আমাদের?

বদর খাঁ হাসল। —হুজুর নবাবসায়েবের হুকুম আছে। যেখানে যেতে চাইবেন, এ বান্দা সেখানেই নিয়ে যাবে। তবে গুজরদের তাঁবুর এলাকায় সাবধানে যেতে হবে, সায়েব! ওদের কুকুরগুলো বড্ড বেতমিজ।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, কুকুর বশ করার ব্যাপারে আমিও এক ওজরাক, বদর খাঁ!

॥ রিয়া ও তার প্রতিবিম্ব ॥

কান্দ্রা লেকের কাছে গাড়ি থামিয়ে বদর খাঁ বলল, একটু অপেক্ষা করুন আপনারা। গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রেখে আসি। আজকাল এ তল্লাটে খুব গাড়ি চুরি হচ্ছে।

সে একটু তফাতে উইলোঝোপের আড়ালে গাড়িটাকে এমনভাবে রেখে এল, রাস্তা থেকে ঠাহর হচ্ছিল না ওখানে কোনও গাড়ি আছে। গাড়িটার রঙও অবশ্য ঘন সবুজ।

ফিরে এসে বদর খাঁ বলল, আপনাদের সঙ্গে টর্চ আছে তো? ফিরতে আঁধার হয়ে যাবে।

কর্নেল বললেন, আছে। এমনকী কুকুর বশ করা যন্ত্রও আছে!

বদর খাঁ খুব অবাক হয়ে পা বাড়াল। অবাক হলুম আমিও। নিশ্চয় রসিকতা করছেন কর্নেল। পাইনবনের ভেতর এখনই আবছা আঁধার জমেছে। পায়ে চলা রাস্তা ধরে বনটা পেরুলে খোলামেলায় পৌঁছলুম। এবার আর রাস্তার চিহ্ন নেই। এখানে-ওখানে পাথরের বোল্ডার পড়ে আছে। ঘন ঘাসের জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে সবখানে।

তার মাঝে-মাঝে কিছু গাছপালা। এটা মোটামুটি একটা সমতলভূমি বলা যায়। পশ্চিমের পাহাড়ের সেই আলোর যাদু আর চোখে পড়ছে না। সূর্য একটা তিনকোণা চূড়ার আড়ালে নেমে গেছে। তাই সারা তৃণভূমির ওপর পাহাড়ের বিশাল ছায়া নেমেছে। ঘাসের জঙ্গলের ভেতর গুজরদের তাঁবু চোখে পড়ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাদের খোঁয়াড় দেখা গেল। বেড়ায় ঘেরা বিশাল খোঁয়াড়ে অসংখ্য ভেড়া-ছাগল-দুম্বা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কর্নেল আমাকে গাছপালা চেনাচ্ছিলেন। —ওই দেখছ—ওটা ওক। ওইটে হল বুনো আখরোট। ওগুলো পপলার। আর ওই গাছটা লক্ষ করো—মালবেরি। যাকে বলে তুঁতফলের গাছ।

হঠাৎ বদর খাঁ থমকে দাঁড়াল। আঁতকে ওঠা গলায় বলল, কুকুর-সায়েব! কুকুর আসছে!

চমকে উঠে দেখি, খোঁয়াড়ের দিক থেকে তিনটে তাগড়াই কুকুর জিভ বের করে দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে। আমি পকেট থেকে ঝটপট রিভলবার বের করতেই কর্নেল বললেন, আঃ! কী করছ জয়ন্ত! রিভলবার লুকিয়ে ফেল শিগগির।

বলে উনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা কাচের টিউব বের করলেন। কুকুর তিনটে যখন প্রায় হাত দশেক তফাতে এসে গেছে, তখন সেই টিউব বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে এবং ছিপি খুলে ফেললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে তিনটে কুকুরই থেমে গেল। মুখ নিচু করে কেঁউ-কেঁউ শব্দ করতে থাকল। তারপর কর্নেল হাসতে-হাসতে একটুখানি এগিয়েছেন, আর তিনটে কুকুরই লেজ গুটিয়ে কুঁকড়ে পিঠটান দিল। বদর খাঁ খ্যা-খ্যা করে হেসে কুকুর তিনটেকে দুয়ো দিতে থাকল।

অবাক হয়ে বললুম, ব্যাপারটা কী, কর্নেল?

কর্নেল মুচকি হেসে পা বাড়িয়ে বললেন, আমার সাম্প্রতিক উদ্ভাবন। এর নাম দিয়েছি ফরমুলা-ডগ। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে উনিশ রকম রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে এটা তৈরি করেছি। এর এমনই উৎকট গন্ধ যে কুকুর কেন, কেঁদো বাঘও কেঁচো হয়ে পালিয়ে যাবে। অবশ্য মানুষের ওপর এখনও পরীক্ষা করিনি। এখনই করা যেতে পারে। —বলে টিউবটা আমার দিকে ঘোরালেন।

গন্ধ পেলুম কী না জানি, আঁতকে উঠে নাক বন্ধ কর পিছিয়ে এলুম। —দোহাই কর্নেল! ওই কুকুর তাড়ানো ফরমুলা-ডগ প্রয়োগের জন্য আরও মানুষ পাবেন।

কর্নেল ছিপি এঁটে টিউবটা প্যাকেটের ভেতর চালান কবলেন। বদর খাঁ নাকের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে বলল, বহৎ বদবু নিকালতা।

গুজরদের তাঁবুতে ততক্ষণে কুকুরের ব্যাপারটা ওরা টের পেয়ে গেছে হয়তো।

একদঙ্গল লোক বেরিয়ে আমাদের দেখছে। বদর খাঁ চেঁচিয়ে ডাকল, হালাকু! হালাকু! জলদি ইধার আও। কলকাত্তাসে সাবলোগ তুমহারা মুলাকাত মাংতা।

একজন প্রৌঢ় তাগড়াই গড়নের লোক ভিড় থেকে আমাদের দিকে দৌড়ে এল। তার মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, পরনে ঢিলে কোর্তা আর শালোয়ার। পা অবশ্য খালি, সেলাম দিয়ে বদর খাঁ-র দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বদর খাঁ বলল, নবাববাহাদুর এঁদের পাঠিয়েছেন। এঁরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

গুজর সর্দার আমাদের খুব খাতির দেখিয়ে তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুগুলো চামড়া সেলাই করে তৈরি। কোনওটার ওপর তেরপলও চাপান হয়েছে। খোলা জায়গায় উনুন পেতে মেয়েরা রাতের রান্নায় ব্যস্ত। কেউ চাপাটি বানাচ্ছে। কেউ প্রকাণ্ড পাত্রে দুধ জাল দিচ্ছে। ভিড় হটিয়ে হালাকু চামড়ার আসন পেতে আমাদের বসাল। আশেপাশে কোথাও কুকুরের লেজের ডগাটুকুও দেখতে পাচ্ছিলুম না।

কর্নেল লোকের সঙ্গে ভাব জমাতে ওস্তাদ! হালাকু সর্দারের সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দিয়েছেন। হালাকু ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে কথা বলছে। আমরা নবাববাহাদুরের মেহমান শুনে সে একেবারে ভক্তিতে গদগদ। বলল, এবার শীতকালটা কান্দ্রায় এসে ভালোই কাটল। যেখানেই ঘুরে বেড়াই, কান্দ্রার জন্য মন পড়ে থাকে আমাদের। পুরুষানুক্রমে কান্দ্রার নবাব আমাদের মা-বাপের মতো। এই যে ঘাসের জঙ্গল দেখছেন, তার মালিক ওঁরা। কোনও খাজনা কখনও দাবি করেননি। আমরা এসে তাই ভেট দিই। ছাগল-ভেড়া, কখনও মাখন দুধ-চর্বি—যা পারি দিই। তো নবাববাহাদুর কিছুতেই নিতে চান না। বলেন, মিলিটারিদের দিয়ে এসো। ওরাই নাকি এখন এই ঘাসের জঙ্গলের মালিক। আমি বিশ্বাস করি না, হুজুর।

কর্নেল বললেন, এবার গ্রীষ্মে কোথায় যাবে, সর্দার?

হালাকু বলল, পামির এলাকায় যাব। সেখানে চীনাদের রাজত্ব। সেখান থেকে যাব কাশগড়, তারপর উত্তরে মাকরান। সেখানে হুজুর, রুশ মুল্লুক। সেখান থেকে আবার কান্দ্রায় ফিরে আসব। ওসব মুল্লুকে শীতের সময় খালি বরফ আর বরফ। জানোয়ার কী খেয়ে বাঁচবে?

কর্নেল বললেন, আমি তোমার কাছে এসেছি ওজরাকের কথা শুনতে। তোমার কাছে নাকি ওজরাকের পাঞ্জা আছে।

হালাকু চোখ বড় করে তাকাল। তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। সে দুর্বোধ্য ভাষায় কাউকে কী বলল, তারপর উঠে তার তাঁবুতে ঢুকল। একটা লোক ব্যস্তভাবে আমাদের সামনে একপাঁজা কাঠ এনে আগুন ধরাল। বেশ ঠান্ডা টের পাচ্ছিলুম। আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসলুম আমরা। তারপর হালাকু বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

তার হাতে সেই ওজরাকের পাঞ্জা। কর্নেলের হাতে দিয়ে সে বলল, আমি খুব ভাবনায় পড়ে গেছি হুজুর। আজই ভাবছিলুম, পাঞ্জাটা যেখানে পেয়েছিলুম, ফেলে দিয়ে আসব নাকি। এটা আর কাছে রাখতে সাহস হচ্ছে না।

—কেন সর্দার?

হালাকু উদ্বিগ্ন মুখে বলল, আমার মেয়ে রিয়া দুদিন আগে ওজরাকের পাল্লায় পড়েছিল। খুব বেঁচে গেছে।

কথাটা বদর খাঁ বলেছিল। তখন অতটা গ্রাহ্য করিনি। তাই বললুম, ব্যাপারটা খুলে বলো তো সর্দার!

হালাকু বলল, পশ্চিমপাহাড়ের নিচে একটা নহর আছে। লেক থেকে নহরটা বেরিয়ে পশ্চিমপাহাড়ের নিচে দিয়ে চলে গেছে। এখন নহরে অল্প একটু জল আছে। আমরা নহরের ওপারে কখনও যাই না। রিয়া সেটা জানে। তবে ওর দোষ নেই। আমার একটা মদ্দা ভেড়া খুব বদমাশ। পাল থেকে প্রায়ই পালিয়ে যায়। সেটা নহরের ওপারে চলে গিয়েছিল। রিয়া সেটাকে ধরে আনতে গিয়েই ওজরাকের পাল্লায় পড়েছিল।

কর্নেল বললেন, তোমার মেয়ের মুখেই ব্যাপারটা শুনতে চাই সর্দার। তাকে ডাক।

হালাকুর ডাকে একটি কিশোরী এগিয়ে এল। ছিপছিপে গড়ন, পাকা আপেলের মতো গায়ের রং। পরনে সালোয়ার-কামিজ। চুলে লাল একটা রুমাল বাঁধা। হালাকু তাদের ভাষায় কিছু বলল।

রিয়া কাঁচুমাচু হাসছিল। কর্নেল পকেট থেকে একটা চকোলেটের প্যাকেট বের করে বললেন, নাও রিয়া! এটা তোমার জন্য এনেছি। হালাকুর ইশারায় রিয়া সেটা নিল। তারপর ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে যা বলল, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি রোমঞ্চকর। আমার তো বিশ্বাস করতেই বাধছিল। ঘটনাটা এই ঃ

সেদিন বিকেলে বাধ্য হয়ে গাড়োলটার (মদ্দা ভেড়া) জন্য সে নহর (খাল) পেরিয়ে ওপারে গিয়েছিল। হঠাৎ সে দেখল কী, অবিকল তার মতো একটি মেয়ে একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একই পোশাক, একই গড়ন। ভালো করে দেখার জন্য সে এগিয়ে গেল। তারপর ভীষণ অবাক হল। মেয়েটি হুবহু তার মতো দেখতে। আয়নার ভেতর নিজের মুখ তো সে দেখেছে। রিয়া গুজর-মেয়ে। ভীতু নয় সে। রেগে গিয়ে বলল, তুমি কে?

মেয়েটির গুজর ভাষায় বলল, তুমি কে?

রিয়া বলল, আমি রিয়া।

মেয়েটিও বলল, আমি রিয়া।

—মিথ্যে বোলো না। তোমার বাবার নাম কী?

—মিথ্যে বোলো না। তোমার বাবার নাম কী?

রিয়া পাথর তুলে তেড়ে যেতেই মেয়েটা যেন শূন্যে ছিটকে গেল। আকাশে ভেসে সে রিয়াকে যেন ভেংচি কাটতে লাগল। রিয়া পাথর ছুঁড়ল। মেয়েটি অমনি

যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তখন রিয়া ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে এল নহর পেরিয়ে।...

রিয়ার মুখে আদিম সরলতা। তবু কথাগুলো সে বানিয়ে বলছে কিনা বোঝা কঠিন। কর্নেল বললেন, হুঁ—আর গাড়োলটার কী হল?

জবাব দিল হালাকু। —রিয়ার মুখে এসব শুনে আর গাড়োলটার খোঁজে যেতে আমরা সাহস পাইনি। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে দলবেঁধে শিঙ্গা, ঢোল এসব নিয়ে সেখানে গেলুম। নহরের ধারে ওজরাকের পুজো দিলুম। আগুনে ঘি আর ভেড়ার রক্ত দিয়ে পুজো দেওয়ার নিয়ম। পুজো দিয়ে সাহস করে নহরের ওপারে গেলুম। বেশিদূর যেতে হয়নি। গাড়োলটা ঘাসের ভেতর মরে পড়েছিল। কিন্তু হুজুর, তাজ্জব ব্যাপার—যেই মরা জানোয়ারটাকে ওঠাতে গেছি, দেখি কী, পুরোটাই ছাই!

কর্নেল, আমি ও বদর খাঁ একসঙ্গে বলে উঠলুম, ছাই!

—হ্যাঁ—একদলা ছাই। অথচ দেখে বোঝার উপায় ছিল না। যেমনকার চেহারা, লোমের রং তেমনি ছিল। কিন্তু হাত ঠেকাতেই ছাই হয়ে গেল। আমরা ভয় পেয়ে পালিয়ে এলুম। ওজরাক বড় যাদুকর, হুজুর! সে তো মানুষ নয়, সে হল পরীদের রাজা। পশ্চিম-পাহাড়ে আছে পরীস্তান। তার বাস সেখানেই চিরকাল তার কথা শুনে আসছি আমরা।

বদর খাঁ মন্তব্য করল, ওজরাক তাহলে একজন জিন। কেতাবে জিনের কথা আছে বটে।

॥ ওজরাকের আবির্ভাব ॥

নবাবপ্রাসাদের ডাইনিং হলে ডিনার খেতে-খেতে কর্নেল হালাকুর মেয়ে রিয়ার ঘটনাটা মির্জাসায়েবকে শোনাচ্ছিলেন। মির্জাসায়েব বললেন, এবার মনে হচ্ছে ওজরাকের ব্যাপারটা হয়তো রূপকথা নয়। একজন মুসলিম হিসেবে অবশ্যই আমি জিন বিশ্বাস করতে বাধ্য। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, খোদাতালা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মতো জিনকেও সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য জিনের সৃষ্টি আগুন থেকে। তারা আকাশের অন্য একটা স্তরে বাস করে। আমার ধারণা, এর মধ্যে একটা তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। আধুনিক বিজ্ঞান অন্য গ্যালাক্সিতে পৃথিবীর মতো গ্রহ এবং প্রাণী থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করে না। ইসলামি শাস্ত্রে উল্লিখিত আগুনের দেহধারী জিন কি তাহলে অন্য কোনও গ্রহের উন্নত কোনও জীব? মুসলিম লোকশাস্ত্রে বলা হয়েছে, জিনরা পুরুষ। পরীরা হল তাদেরই স্ত্রীজাতি। জিন-পরীর ছটা লেগে নাকি মানুষের মারাত্মক অসুখ হয়। তার মানে, বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনও অজ্ঞাত গ্রহের ওইসব প্রাণীদের শরীর আলোর কণিকা দিয়ে হয়তো তৈরি। তা থেকে যে রশ্মি ঠিকরে পড়ে, পৃথিবীর মানুষের

পক্ষে তা ক্ষতিকর। তাই তাদের সংস্পর্শে গেলে মানুষ দুরারোগ্য অসুখ-বিসুখে ভুগে মারা পড়ে। আপনার কী মনে হয় কর্নেল?

কর্নেল একটু হেসে বলেন, পবিত্র কোরান আমিও পড়েছি মির্জাসায়েব! অবশ্য ইংরেজি অনুবাদে। কোরানে ঈশ্বর বলেছেন : আমি মানুষ ও জিন সৃষ্টি করেছি। তাছাড়া ১৮টি ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সির কথাও কোরানে বলা হয়েছে।

মির্জাসায়েব উৎসাহে চঞ্চল হয়ে বললেন, তাহলে দেখুন, আধুনিক বিজ্ঞানেও—

আমি ওঁর কথা কেড়ে বললুম, মহাভারত এবং রামায়ণেও বিস্তর ব্যাপার আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন, সৌভ নগরী—যা মহাকাশে ভাসমান এক পুরী। কৃত্রিম উপগ্রহ নয়? তারপর নারদের বাহন ঢেঁকি। রকেট ছাড়া আর কী হতে পারে? ঢেঁকির সঙ্গে রকেটের গড়নের আশ্চর্য মিল! তারপর পুষ্পক রথ হল বিমান। মহাভারতের যুদ্ধের বর্ণনা পড়লে তো মনে হয় পারমাণবিক অস্ত্রের লড়াই।

কর্নেল বলে উঠলেন, ডার্লিং, আমরা হয়তো দানিকেনের আজগুবি তত্ত্বের দিকে এগোচ্ছি। মির্জাসায়েব, বরং শাস্ত্র-পুরাণ থাক আপাতত। আপনার হতভাগ্য পরিচারক কিংবা হালাকুর পালছাড়া গাড়োল জিনের বাদশা ওজরাকের সংস্পর্শে এসে ছাই হয়ে গেছে কিনা এখনও প্রমাণ পাইনি। ক্রমশ আমার মাথায় একটা চিন্তা ভেসে আসছে। কেউ কি লেসার রশ্মি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে? কে জানে!

মির্জাসায়েব বললেন, কিন্তু ঝড়, পাওয়ার ফেল, আকাশ থেকে অদ্ভুত আলো নেমে আসা, ঘুঙুরের মতো শব্দ, তীব্র শিস—

—ওজরাক যদি জিনই হয়, সে আপনার এবং দেশের পাঁচটা প্রত্নশালার ধাতুরত্ন ও মূর্তি চুরি কেন করবে, ভেবে পাচ্ছি না মির্জাসায়েব। জিন যদি সত্যি থাকে, তার বয়স সম্ভবত বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনও ব্রহ্মাণ্ডে। ধরে নিচ্ছি, সে কান্দ্রার পশ্চিমপাহাড়ে এসে ঘাঁটি করেছে। কিন্তু প্রত্নদ্রব্য আর মূল্যবান রত্নে তার লোভ কেন হবে? এসব তো নেহাত পৃথিবীর জিনিস। এসবের চেয়ে মূল্যবান আজ বিস্ময়কর জিনিস আশা করি অন্য ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহে বিস্তর আছে।

শুনেছি, জিনেরা খুব খেয়ালি। ওজরাকও নাকি খেয়ালি জাদুকর।

মির্জাসায়েব আনমনে বললেন,—তবে আমার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত নুরে আলম রত্নের কথা ভাবুন। এ রত্ন নিশ্চয় অন্য কোনও গ্রহের জিনিস। ধাতু-বিজ্ঞানীদের অজানা এ রত্ন। আমার মনে হচ্ছে, ওজরাক এতদিনে হয়তো তা টের পেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে। কে বলতে পারে, আমার পূর্বপুরুষদের কেউ এ রত্ন পশ্চিমের পাহাড়ে কুড়িয়ে পাননি। রত্নটা হয়তো ছিল ওজরাকেরই।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, ওজরাক যদি জিন এবং মায়াবী জাদুকর, তাহলে রাত-দুপুরে তাকে চুরি করতে হয় কেন? মির্জাসায়েব, ন্যায়শাস্ত্রে কাকতালীয় যোগবলে একটা ব্যাপার আছে। কাক এসে তালগাছে বসল এবং অমনি একটা তাল

পড়ল। এই দেখে কেউ যদি ভাবে, কাক এসে বসাই তাল পড়ার কারণ, তাহলে সে ভুল করবে। যোগাযোগটা আকস্মিক।

মির্জাসায়েব ভুরু কুঁচকে বললেন, তার মানে?

কর্নেল সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। আপনি কালই প্লেনে দিল্লি চলে যান এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন ঃ 'নুরে আলম' চুরি গিয়ে আপনি আপনার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত বিখ্যাত কয়েকটি রত্ন আর রাখতে সাহস পাচ্ছেন না। তাই নীলামে বেচে দিতে চান। নীলামে যাঁরা কিনতে চান, তাঁরা যেন এক সপ্তাহের মধ্যে যোগাযোগ করেন।

—সে কী! আর তেমন রত্ন কীই বা আছে? আমার পরলোগকতা স্ত্রীর কিছু জড়োয়া অলঙ্কার ছাড়া আর কিছু তো নেই! বলেছিলুম না? আমি এখন নামেই নবাব!

—সত্যি কিছু বেচতে হবে না মির্জাসায়েব। শুধু বিজ্ঞাপন দিতে বলছি।

আমি মুখ খুলতে যাচ্ছিলুম, কর্নেল এমন চোখ কটমট করে তাকালেন যে ঢোক গিলে থেমে গেলুম। মির্জাসায়েব বললেন, ঠিক আছে। তাই হবে।

কর্নেল বললেন, কাল সকালে আমরা হালাকুর অতিথি হয়ে যাচ্ছি। ফিরে এসেই আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমার ইচ্ছা দুটো দিন অন্তত গুজরদের সঙ্গে কাটাব।...

কিছুক্ষণ পরে অতিথিশালায় শুতে এসে কর্নেলকে বললুম, আপনি যাই বলুন, ওজরাক অন্য গ্রহের কোনও উন্নত স্তরের প্রাণী। মানুষেরই উন্নত সংস্করণ—সুপারম্যান।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর বললেন, কেন ডার্লিং?

—রিয়ার প্রতিবিম্বের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? আপনি আমাকে ল অফ প্যারিটি এবং মিরর-ইমেজতত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন সেদিন। ওজরাক মিরর-ইমেজ সৃষ্টি করতে জানে। ওই ঘটনা শোনার পর আমার অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের গল্পটা মনে পড়ছে। অ্যালিস যেমন আয়নার ভেতরকার দেশে গিয়েছিল. রিয়াও হয়তো তেমনি—

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, উলটো মানুষদের দেশ, বলো জয়ন্ত। আয়নার ভেতরকার মানুষ একেবারে উলটো নয় কি? তার পিলে ডাইনে, লিভার বাঁয়ে, হার্ট ডানদিকে এবং তার চোখ, নাকের ফুটো, হাত, পা সবই উলটো। মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অবিকল উলটো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আছে কোথাও—হুবহু প্রতিবিম্ব যেন। সেই এলাকায় গিয়ে পড়লে মহাকাশচারী তার মহাকাশযান-সমেত উলটো হয়ে যাবে, অথচ সে তা টের পাবে না। তারপর সে যখন তার নিজের বিশ্বে ফিরে আসবে, অমনি হবে সাংঘাতিক কাণ্ড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সে তার যান-সমেত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তোমাকে দড়ি ও ছড়ির উপমা দিয়েছিলুম। আশা করি মনে আছে!

বললুম, হ্যাঁ— ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার পরস্পরের সংস্পর্শে এলে ধ্বংস

হবে। কর্নেল! রিয়া-বেচারি জোর বেঁচে গেছে বলা যায়। উলটো-রিয়ার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই কী হতো ভেবে দেখুন!

হুঁ, ঠিক তাই ঘটত। ওজরাক যেই হোক, খুব সাবধানী এবং কৌতুকপ্রিয়। —কর্নেল রাতের পোশাক পরতে ব্যস্ত হলেন। ফায়ারপ্লেসে আগুনের সামনে গিয়ে বসে ডাকলেন, এখানে এসো ডার্লিং!

আরাম করে বসলুম আগুনের সামনে। বললুম, আচ্ছা কর্নেল, মিরর-ইমেজ বলুন বা উলটো বস্তুই বলুন, বুঝলুম তার আণবিক গড়ন আপনার তত্ত্ব অনুসারে অসমানুপাতিক। কিন্তু তা অ্যান্টিম্যাটার কেন?

—কোনও অসমানুপাতিক আণবিক গড়নের বস্তুর মধ্যে পজিটিভ চার্জ করা ইলেকট্রন অর্থাৎ পজিট্রনের সঙ্গে নেগেটিভ চার্জ করা প্রোটনের সন্নিবেশ ঘটলে সেটি অ্যান্টিম্যাটার হয়ে যায়।

—তাহলে তো ম্যাটারকে অ্যান্টিম্যাটারে পরিণত করা সম্ভব?

—হ্যাঁ—তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভব।

—বাস্তবেও সম্ভব হয়েছে বইকি। রিয়ার প্রতিবিম্বের আর কী ব্যাখ্যা হয়? প্রকৃতির ডানহাত বাঁহাতের খেলার কথা বলছিলেন। মানুষ তো প্রকৃতির বহু নিয়ম জেনে বিস্তর খেলা খেলতে পেরেছে। প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেনি কি মানুষ?

—হুঁ—তা তো হয়েইছে।

প্রকৃতির লেফট হ্যান্ড টুইস্টের নিয়ম ওজরাক জানে।

কর্নেল হাসলেন। —ওজরাকের প্রতি তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে আশঙ্কা হচ্ছে, ডার্লিং! ওজরাক তোমাকে তুলে নিয়ে না যায়! সাবধান!

হাসতে-হাসতে বললুম, নিয়ে গেলে খুশিই হব। পৃথিবীটা গলে-পচে গেছে। এখানে আর থাকতেই ইচ্ছে করে না।

কর্নেল আগুনে আবার একটা কাঠ গুঁজে দিয়ে হেলান দিলেন। চোখ বুজে রইলেন। আমি হাই তুলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

নতুন জায়গায় গিয়ে সহজে ঘুম আসে না। কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি। এ রাতেও তাই। চোখ বুজে ঘুমাবার চেষ্টা করছিলুম। ঘুম আসছিল না। মাঝে-মাঝে চোখ খুলে দেখছিলুম, কর্নেল তখনও ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছেন হেলান দিয়ে। চোখ বন্ধ। ওখানেই ঘুমচ্ছেন নাকি! অবশ্য ওঁর ঘুমের লক্ষণ হল নাকডাকা। নাক যখন ডাকছে না, তখন ঘুমচ্ছেন না। চিন্তাভাবনা করছেন নিশ্চয়।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে সেটা টের পেলুম। বাইরে চাপা শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ঝড় হচ্ছে নাকি? কান্দ্রা উপত্যাকায় মাঝরাতে ঝড় আসে শুনেছি। তাহলে সেই ঝড়! কিন্তু ঘরের ভেতর এত অন্ধকার কেন? জানলার পর্দার মাথায় কাচের খানিকটা অংশে বাইরের আলো এসে প্রতিফলিত হতে দেখেছি। তার ফলে ঘরের আলো নেভালেও ঘরের ভেতর আবছা সবকিছু দেখা

যায়। কিন্তু বাইরে আলো নিভে গেছে। ঝড়ের শব্দটা বাড়ছে। ফায়ারপ্লেসের আগুনও নিভে গেছে। টেবিল-ল্যাম্পের সুইচ টিপলেও আলো জ্বলল না। কর্নেলের নাক ডাকছিল। ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

নাকডাকা থেমে গেল ওঁর। জড়ানো গলায় বললেন, কিছু না। ঘুমোও!

বললুম, ঝড় বইছে। পাওয়ার ফেল! আলো জ্বলছে না।

তারপর চমকে উঠলুম চাপা ঝমর-ঝম ঘুঙুরের শব্দে। একলাফে কর্নেলের বিছানার কাছে গিয়ে ওঁকে ধাক্কা দিতে-দিতে বললুম, ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে, ওই শুনুন!

এবার কর্নেল উঠে বসলেন। অন্ধকারে ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। ব্যস্তভাবে বললেন, কী আশ্চর্য! টর্চটাও জ্বলছে না দেখি। জয়ন্ত, তোমার টর্চটা দ্যাখো তো?

আমার বিছানা হাতড়ে টর্চ পেলুম। কিন্তু জ্বলল না। বললুম, আমার টর্চটাও যে জ্বলছে না!

কর্নেল বললেন, বেরিও না। জানলা খুলে দেখা যাক, ব্যাপারটা কী?

ঘুঙুরের শব্দটা সমানে শোনা যাচ্ছে। ঝমর-ঝম ঝমর-ঝম ঝমর-ঝম...একজন নয়, যেন অসংখ্য নর্তক-নর্তকী স্টেজে উদ্দাম নাচ জুড়েছে। ঘুঙুরের আওয়াজ অবশ্য চাপা, যেন বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে। কর্নেলকে জানলা ফাঁক করতে দেখলুম। তখন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আকাশ পরিষ্কার। ঝকমক করছে নক্ষত্র। অথচ জোরাল একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে শোঁ-শোঁ শনশন শব্দে। ঘুঙুরের শব্দটা কিন্তু বদ্ধ-ঘরের ভেতর যেমনটি শুনছিলুম, বাইরেও তেমনটি। ফিডলার কাঁকড়ার বেহালার বাজনা যেমন মাথার ভেতর বাজছে মনে হচ্ছিল, এও কতকটা তেমনি।

হঠাৎ অনেক দূরে একটা আলোর মতো জিনিস চোখে পড়ল। বললুম, ওটা কী কর্নেল?

কর্নেল জবাব দিলেন না।

আলোটা ভারি অদ্ভুত। মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে ভাসছে। একটু পরে বুঝতে পারলুম, ওটা নিজেই আলোকিত। কিন্তু অন্য কোনও জিনিসকে আলোকিত করছে না। তাহলে ওটা নিশ্চয় আলো নয়।

অথচ ওটা যেন ঘুরছে। দেখতে কতকটা সিলিং ফ্যানের গোলাকার অংশটার মতো। ঘুরছে বলছি, কারণ ওটার গায়ে কিছু লাল নীল সবুজ হলুদ ফুটকি দেখতে পাচ্ছি এবং ফুটকিগুলো স্থান বদল করছে।

মিনিট তিনেক পরে অদ্ভুত আলোর মতো জিনিসটা ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল। অনেক উঁচুতে পৌঁছে স্থির হয়ে রইল আধ মিনিট। তারপর হঠাৎ একটা ছুঁড়ে মারা ডিসকাসের মতো কাত হয়ে বিদ্যুৎবেগে দূরে চলে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল নক্ষত্রের মধ্যে।

খেয়াল করে দেখি, ঝড়টা থেমে গেছে। ঘুঙুরের শব্দও নেই। তারপর প্লেনের শব্দ শুনতে পেলুম। কর্নেল বললেন, মনে হচ্ছে বিমানবাহিনীর বিমান এতক্ষণে ওটার

খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। যাই হোক, জয়ন্ত! তাহলে ওজরাকের উড়ন-খাটোলা স্বচক্ষে দর্শনের সৌভাগ্য হল আমাদের। অবশ্য উফো-দর্শনও বলা যায়। তুমি কলকাতা ফিরে দৈনিক সত্যসেবকে দারুণ জাঁকাল একটি রিপোর্টাজ লিখবে, আশা করি। —বলে কর্নেল জানালা বন্ধ করলেন। অমনি বাইরে আলো জ্বলে উঠল।

বললুম, নিশ্চয় লিখব। —তারপর টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপলুম। আলো জ্বলল।

কর্নেল তাঁর বিছানায় গিয়ে চিত হলেন। বললেন, ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল দেখছি। আমাকে আবার গোড়া থেকে সাজাতে হবে।

জিগ্যেস করলুম, কী?

—ওজরাক এবং ওইসব চুরিচামারি নিয়ে একটা থিওরি দাঁড় করিয়েছিলুম।

দরজায় টোকার শব্দ এবং মির্জাসায়েবের উত্তেজিত ডাকাডাকি শুনে দরজা খুলে দিলুম। মির্জাসায়েব হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, কর্নেল? কর্নেল! বড় তাজ্জব ঘটনা—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, সব দেখলুম, মির্জাসায়েব! বড় রহস্যময় ব্যাপার।

—আমার বড় ভয় ভয় করছে, কর্নেল! ওজরাক আবার কেন এসেছিল?

—এ প্রশ্নের জবাবের জন্য আমাকে দুটো বা তিনটে দিন সময় দিন।

মির্জাসায়েবের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, উনি আশ্বস্ত হতে পারছেন না।...

॥ উলটো-কর্নেলের পাল্লায় ॥

সকালের ফ্লাইটে মির্জা-নবাব দিল্লি গেলেন কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। আমরা বিমানঘাঁটিতে ওঁকে বিদায় দিয়ে ডঃ সোমের কোয়ার্টারে গেলুম। বদর খাঁ গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকল। সে আমাদের কান্দ্রা লেকে পৌঁছে দেবে।

ডঃ সোম বললেন, সাংঘাতিক ব্যাপার, কর্নেল। কাল রাতে উফো নেমেছিল। তাকে তাড়া করে যাচ্ছিল এয়ারফোর্সের একটা মিগ বিমান। সেটা পশ্চিমের পাহাড়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সম্ভবত কোথাও ভেঙে পড়েছে। আজ সকালে দুটো হেলিকপ্টার গেছে খুঁজতে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনি উফো বলছেন!

ডঃ সোমও হাসলেন। —প্রতিরক্ষাবিজ্ঞানী রামস্বরূপ ব্রহ্মের মতে নাকি অত্যন্ত উন্নত ধরনের চীনা বিমান। চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন আরোহীবিহীন বিমান। বহু দূরের ঘাঁটিতে বসে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে চালানো যায় এই ম্যাগনেটিক প্লেনকে। ডঃ ব্রহ্মের ধারণা, ভূপৃষ্ঠের চৌম্বক প্রবাহের সংস্পর্শে এলেই স্বাভাবিক নিয়মে চুম্বকে চুম্বকে বিকর্ষণ ঘটে এবং বিপজ্জনক ঝড় সৃষ্টি হয়। পাওয়ার ফেল করে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

—আপনার মতামত কী?

ডঃ সোম দাঁতের ফাঁকে উচ্চারণ করলেন, আন-আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট। কারণ নিঃসংশয়ে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। অবশ্য 'উফো' বললেই সেটা অন্য গ্রহের মহাকাশযান বোঝায় না। শুধু বোঝায়, অজানা উড়ন্ত জিনিস।

কফি না খাইয়ে ছাড়বেন না ডঃ সোম। কথাবার্তার ফাঁকে কফি এল। কফি খেতে-খেতে ফোন বাজল। ডঃ সোম ফোনে কিছুক্ষণ কথা বলে গম্ভীর মুখে ফিরে এলেন আমাদের কাছে। বললেন, স্পেস রিসার্চ ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডঃ হোসেন ওজরাকের পাঞ্জা কুড়িয়ে পেয়েছেন।

কর্নেল ও আমি চমকে উঠলুম। কর্নেল বললেন, কোনও ডেডবডি?

—তা তো বললেন না! ছাদের সোলার প্যানেলের ভেতর পড়ে ছিল বজ্রচিহ্ন আঁকা চাকতি।

—কিছু চুরি গেছে কি?

ডঃ সোম আস্তে বললেন, এ এম ডি এস যন্ত্রটা কম্পিউটারসুদ্ধ উপড়ে নিয়ে গেছে চোর।

—জিনিসটা কী?

—অ্যান্টিম্যাটার ডিটেকশান সিস্টেম।

কর্নেল নড়ে বসলেন। আমি হকচকিয়ে গেলুম। কর্নেল বললেন, যন্ত্রটা আয়তনে নিশ্চয় ছোট ছিল? নইলে চোরের অসুবিধে হবার কথা।

—খুবই ছোট। একটা পকেট-রেডিওর মতো দেখতে। তার কম্পিউটারের আয়তন আরও ছোট। একটা মাউথ-অর্গানের সাইজ।

ডঃ সোম উঠে দাঁড়ালেন। —ডঃ হোসেনের ওখানে যেতে হচ্ছে এখনই। আপনারা ইচ্ছে করলে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।

কর্নেল বললেন, থাক। বরং পরে একদিন গিয়ে আলাপ করব ওঁর সঙ্গে। আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।...

বদর খাঁ কাল রাতের ঘটনা নিয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে-করতে গাড়ি চালাচ্ছিল। জিনের বাদশা ওজরাকের ভয়ে সে তটস্থ। রাতে ওজরাকের উড়ন-খাটোলা নামতে দেখেছে অনেকে। তাই নিয়ে সারা এলাকা জুড়ে নাকি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ-কেউ কান্দ্রা ছেড়ে চলে যাবার কথাও নাকি ভাবছে।

লেকের কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়ে বদর খাঁ বলল, আপনারা কখন ফিরবেন সায়েব?

কর্নেল বললেন, পরশু সকালে ঠিক এই সময় তুমি গাড়ি নিয়ে চলে আসবে এখানে। আমরা এই চেনার গাছের তলায় তোমার অপেক্ষা করব।

বদর খাঁ গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আমাদের দুজনের পিঠেই ছোটখাটো দুটো বোঁচকা। বিস্তর টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি। পাইন বনটা পেরিয়ে তৃণভূমিতে পৌঁছে

গুজরদের কুকুরগুলোর কথা মনে পড়ল। কিন্তু দূর থেকে নজর রেখেও তাদের লেজের ডগাটুকুও দেখতে পাচ্ছিলুম না।

' ঘাসের মাঠে কয়েকটা ঘোড়া চরছে। খোঁয়াড়টা শূন্য। ভেড়া-ছাগল-দুম্বার পাল চরাতে নিয়ে গেছে গুজর রাখালেরা। তাঁবুর সামনে বুনো আখরোট গাছের তলায় কিছু মেয়ে মাখন তৈরি করছে। মাটির পাত্রে দুধ জ্বাল দিচ্ছে কেউ। বুড়োরা চামড়ায় নুন মাখিয়ে রোদে দিচ্ছে। হালাকু সর্দার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এগিয়ে এসে আমাদের সে অভ্যর্থনা করল।

হালাকু একটু তফাতে ওক গাছের তলায় একটা নতুন তাঁবু দেখিয়ে বলল, ওই আপনাদের ডেরা হুজুর। আশা করি, কোনও তকলিফ হবে না। যে নহরের কথা বলেছিলুম, সেটা পেছনেই। খুব পরিষ্কার জল পাবেন। আর পাখির কথা বলেছিলেন, নহরের ওখানে হরেকরকম পাহাড়ি পাখি দেখতে পাবেন। যত খুশি, ফোটো খিঁচুন—ওরা ভয় পাবে না। নবাববাহাদুরও ওখানে এসে ডেরা পাতেন। গত মাসেও এসে কিছুদিন ছিলেন ওখানে।

তাঁবুটা ছাগলের চামড়া সেলাই করে তৈরি। কেমন একটা আঁশটেগন্ধ। কর্নেল আমার মুখের ভাবে সেটা টের পেয়ে বললেন, ভেব না ডার্লিং, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সয়ে যাবে।

গত সন্ধ্যার মতো দু-পাত্র টাটকা ছাগলের দুধ নিয়ে এল হালাকু। সঙ্গে তার মেয়ে রিয়া। সায়েবদের খাতির যত্নের ভার রিয়ার ওপর। যা দরকার, একে বলবেন।

হালাকু কাল রাতের উড়ন-খাটোলা নামার গল্প করতে লাগল। কর্নেল জিগ্যেস করলেন, ঠিক কোন জায়গায় নেমেছিল বলতে পার সর্দার?

জবাব দিল রিয়া। —আমি জানি। আগেরবারও সেখানে নেমেছিল। —বলে সে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে আঙুল নির্দেশ করল।

হালাকু অবাক হয়ে বলল, তুই কেমন করে জানলি?

রিয়া বলল, সেদিন সকালে পাল চরাতে গিয়ে পোড়া ঘাস দেখেছিলাম। তুমি আজকাল সব কথা ভুলে যাও। তাই শুনে তুমি বকাবকি করেছিলে না?

কর্নেল পাশে পড়ে থাকা একটা পাথরের ওপর উঠে চোখে বাইনোকুলার রাখলেন। দেখতে-দেখতে বললেন, হুঁ, রিয়া ঠিকই দেখিয়েছে। ওখানে মিলিটারি ভ্যান নিয়ে একদল অফিসার তদন্ত করতে এসেছে। আরে! ডঃ সোমও এসে গেছেন দেখছি। জোরাল তদন্ত হচ্ছে তাহলে।

নেমে এসে ফের বললেন, তাহলে এবেলা আর ওখানে যাওয়া হল না। সর্দার, বিকেলে তোমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে জায়গাটা দেখতে গেলে আপত্তি করবে না তো?

হালাকু একগাল হেসে বলল, হুজুর! মা-হারা একটি মোটে মেয়ে। তাকে আপনার জিম্মায় দিয়েছি। ইচ্ছে করলে টাউনে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখান, মেমসাব বানিয়ে দিন!

সে খুব হাসতে লাগল।

রিয়া গাল ফুলিয়ে বলল, আমি লেখাপড়া শিখব না। মেমসায়েবও হব না।

কর্নেল বললেন, তাহলে কী হতে চাও তুমি?

—কিচ্ছু না।

—বুঝেছি মাঠে-মাঠে জানোয়ারের পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেই তোমার ভালো লাগে।

রিয়া আস্তে বলল, খুব ভালো লাগে।

হালাকু বলল, ওর জন্ম হয়েছিল পামির এলাকার রিয়ায়। তাই ওর নাম রেখেছিলুম রিয়া। সেখানে এমনি ঘাসের মাঠ, হুজুর। ওই মুল্লুকে রিয়া কথার মানে ঝরনা।

রিয়ার সঙ্গে কর্নেলের খুব ভাব হয়ে গেল। আমার প্রতি তার লক্ষ কম। বুঝতে পারছিলুম, কর্নেলের দাড়িই ওকে বশ করে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লুম।

পেছনের নালাটা প্রায় ফুট তিরিশেক চওড়া। পাথরে ভর্তি। তার ফাঁকে ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জল বয়ে যাচ্ছে। একখানে ডোবার মতো গর্ত করে জল জমানো হয়েছে। কর্নেল কিছুক্ষণ পাখি দেখায় মন দিলেন। টেলিলেন্স লাগান ক্যামেরায় ছবিও তুললেন প্রচুর। নালার দুধারে রঙবেরঙের ফুলের ঝোপ। মনে হচ্ছিল, স্বর্গে চলে এসেছি। পাখির গান, ফুলের রং, গাছপালার সবুজ জেল্লা আর স্নিগ্ধ রোদ নিয়ে চারদিকে আশ্চর্য এক পবিত্র সরলতা। একঝাঁক পপলারের ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে যেতে-যেতে যেন অর্কেস্ট্রার বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে।

তুঁতগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। কর্নেলকে দেখলুম নহরের বুকে পাথরে পা রেখে রেখে ওপারে চলে গেলেন। তারপর চোখে বাইনোকুলার স্থাপন করে ঝোপের আড়ালে উধাও হলেন।

উধাও তো উধাও! ওপারে ঘাসের জঙ্গল প্রায় ফুট পাঁচেক উঁচু হয়ে দূরে পাহাড়ের গায়ে মিশে গেছে। যেন এক সবুজ সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ধূসর-নীল কঠিন শিলা। ওপর। মাঝে-মাঝে দ্বীপের মতো উঁচু গাছের জটলা এবং কোথাও গ্রানাইট শিলার ঢিপি।

কর্নেলের ছাইরঙাও টুপি একবারের জন্য চোখে পড়ল। বুঝলুম, কোনও বিরল প্রজাতির পাখির পেছনে ধেয়ে চলেছেন। তার মানে এবেলার মতো ওঁর আশা বৃথা।

সিগারেট ধরিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মন দিলাম। কর্নেলের এমন বাতিকগ্রস্থ আচরণ নতুন দেখছি না। পপলারশ্রেণীর ভেতর বাতাসের অর্কেস্ট্রা বেড়ে গেছে ততক্ষণে। রঙিন ফুলগাছগুলো তালে-তালে নাচ জুড়েছে। একসময় হঠাৎ আমার মাথার ওপর তুঁতগাছের ডালপালা থেকে একঝাঁক টিয়াপাখি বেসুরে চেঁচিয়ে উঠল এবং ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচাতে-চেঁচাতে পালিয়ে গেল।

তারপরই বাঁদিকে কয়েক হাত তফাতে কর্নেলকে দেখতে পেলুম। কিন্তু এমন কেন দেখাচ্ছে ওঁকে? মুখে কেমন পাগলাটে হাসি। চোখ দুটো রাঙা। বললুম, অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? কী হয়েছে?

কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তেমনি পাগলাটে হাসি ঠোঁটে রেখে একটু এগিয়ে এলেন। অবাক হয়ে বললুম, কথা বলবেন তো? অমন করছেন কেন?

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে চুরুট বের করলেন। দৃষ্টি কিন্তু আমার দিকেই। চুরুটটা ঠোঁটে রেখে লাইটার ধরাচ্ছেন, সেই সময় লক্ষ করলুম, চুরুটটা বাঁহাতে বের করেছেন এবং লাইটার ধরাচ্ছেন ডানহাতে।

এতকাল ওঁর অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত আমি। ডানহাতে চুরুট নিয়ে বাঁহাতে লাইটার জ্বালেন। দ্বিতীয়বার খটকা লাগল ওঁর কপালের দিকে তাকিয়ে। ওঁর কপালে বাঁদিকে একটু কাটা দাগ আছে। কিন্তু এখন দেখছি দাগটা ডানদিকে।

দেখামাত্র আঁতকে পিছিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠলাম, কর্নেল! আপনি উলটো মানুষ!

সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল অদৃশ্য। আমিও ঝোপজঙ্গল ভেঙে পাথরে আছাড় খেতে-খেতে একেবারে তাঁবুর সামনে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লুম। হালাকু দৌড়ে এসে বলল, কী হয়েছে হুজুর?

বললুম, কিছু না।...

॥ আবার এক মৃতদেহ ॥

ধাক্কাটা সামলে নিতে সময় লাগল। বার-বার মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা হয়তো আমি চোখ দিয়ে দেখিনি, মন দিয়ে দেখেছি। অর্থাৎ নিতান্তই দিবাস্বপ্ন! তুঁতগাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ বাতাসে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অকারণ দিনদুপুরে ভূত দেখার মতোই উলটো-কর্নেল দর্শনের কোনও মানে হয় না।

হালাকু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও। একটু ধাতস্থ হবার পর বললুম, তেমন কিছু না সর্দার! নহরের ওপারের জঙ্গলে বাঘের মতো কী যেন দেখলুম।

হালাকু হাতে-হাসতে বলল, এ মুল্লুকে শের কোথায় হুজুর? নিশ্চয় তাহলে বোজি কুহি দেখেছেন।

—বোজি কুহি? সে আবার কী জানোয়ার?

—বুনো পাহাড়ি ছাগল।

হালাকু নিশ্চয় আইবেক্সের কথা বলছে। সে কিছুক্ষণ 'বোজি কুহি' নিয়ে বকবক করল। তারপর চলে গেল তাদের তাঁবুর দিকে। একটা গাছের তলায় ভেড়ার মাংস কাটা হচ্ছে। আমাদের সম্মানে গুজরদের ডেরায় আজ ভোজ দেওয়া হবে। রান্নাবান্নার

আয়োজন চলেছে ওখানে। একটু পরে রিয়া এল সুন্দর নকশা আঁকা চীনা মাটির পাত্রে একগাদা শুকনো ফল নিয়ে। বলল, ছোটসায়েব, বাবা এই ফলগুলো দিয়ে পাঠাল। বড়সায়েব এলে দুজনে মিলে খাবেন আপনারা। রান্না হতে আজ বিকেল হয়ে যাবে কিনা।

থালাটা সে বাঁহাতে নামিয়ে রাখতেই আঁতকে উঠে বললুম, ও কী রিয়া! তুমি বাঁহাতে থালা রাখছ যে?

অপ্রস্তুত হয়ে ডানহাত ঠেকাল থালায়। মুখে কাঁচুমাচু হাসি।

তবু সন্দেহ গেল না। মায়াবী ওজরাক রিয়ার প্রতিবিম্বকে পাঠিয়েছে কিনা বোঝা দরকার। বললুম, আচ্ছা রিয়া, তুমি কোন হাতে খাবার খাও?

রিয়া খুব অবাক হয়ে ডানহাতটা দেখাল। তখন সন্দেহটা চলে গেল। শুকনো ফলের থালাটা তাঁবুর ভেতর রেখে একটা পাথরের ওপর বসে রইলুম। দৃষ্টি পশ্চিমে নহরের ওদিকে। কিছুক্ষণ পরে দুরে ঘাসের জঙ্গলে চলমান একটা ছাইরঙা টুপি দেখতে পেলুম। অমনি সতর্ক হয়ে উঠলুম।

টুপিপরা লোকটি ঘাসের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নহরের পাড়ে এল। হ্যাঁ। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তো বটেই। কিন্তু আসল, না জাল? প্রকৃত কর্নেল না দর্পণবিম্ব কর্নেল? সিধে কর্নেল, না, উলটো কর্নেল? ওজরাকের দেশের সীমান্তে এসে এবার থেকে পদে-পদে সতর্ক থাকা দরকার।

নহর পেরিয়ে সিধে বা উলটো কর্নেল হনহন করে এগিয়ে আসছেন। বুকে ক্যামেরা ও বাইনোকুলার তেমনি ঝুলছে। প্রজাপতি-ধরা লাঠি ও জাল অবশ্য নিয়ে বেরোননি। ওকতলায় পৌঁছে হাসিমুখে সেই সম্ভাষণ করেছেন, হ্যালো ডার্লিং, অমনি পকেট থেকে রিভলবার বের করে গর্জে উঠেছি, হ্যান্ডস আপ!

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন দুহাত তুলে।

বললুম, একটু নড়লেই গুলি ছুঁড়ব। দাঁড়ান, আগে পরীক্ষা করি। তারপর—

—জয়ন্ত! জয়ন্ত! কী আশ্চর্য!

সতর্কভাবে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কপালের দাগটা দেখলুম। ঠিক বাঁদিকেই আছে। তবু নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। বললুম, চুরুট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিন।

কর্নেল হো-হো হেসে হাত নামিয়ে বললেন, ডার্লিং, আমি উলটো-উলটো নই। একেবারে সিধে। হুঁ, বুঝেছি। কিছুক্ষণ আগে ওই ঘাসের জঙ্গলে আমিও একজন উলটো-জয়ন্তকে দেখে এলুম।

হকচকিয়ে গিয়ে বললুম, বলেন কী!

—তুমি কোথায় উলটো-কর্নেলকে দেখলে?

—ওই তো ওখানে!

কর্নেল পাথরটাতে বসে বললেন, উলটো-তুমি একেবারে রাশিয়ান ব্যালেনাচ

দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছ! ওঃ! সে কী নাচ তোমার। বলশয়ের স্টেজে অমন হংসনৃত্য নাচলে রুশ-নাচিয়েদের মাথা হেঁট হয়ে যেন।

—উলটো-আপনি কিন্তু বদ্ধপাগল!

—তা স্বাভাবিক। সিধে-আমির মধ্যে কিছু পাগলামি থাকা যখন সম্ভব।

—বাপস! মুখে পাগলাটে হাসি, চোখে পাগলাটে চাউনি!

ওজরাক যেই হোক, আমাদের নিয়ে তামাশা শুরু করেছে দেখছি। —কর্নেল চুরুট বের করে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে জ্বেলে নিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে ফের বললেন, আমার সব থিওরি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে, জয়ন্ত! এতকাল অসংখ্য রহস্যের মোকাবিলা করেছি এবং অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনার চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে পেরেছি। কিন্তু এবার যে রহস্যের সামনে এসে পড়েছি, তার সম্ভবত কোনও পার্থিব ব্যাখ্যা নেই!

অবাক হয়ে বললুম, আপনি কি তাহলে জিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেন, কর্নেল?

—জানি না। সত্যি কিছু জানি না।

আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুকে এমন হতাশাগ্রস্ত কখনও দেখিনি। সারা দুপুর তাঁকে ভীষণ গম্ভীর ও চিন্তাকুল দেখছিলুম। গুজরদের সামাজিক ভোজে গিয়ে উনি নামমাত্র আহার করলেন। প্রকাণ্ড চাপাটি, ভেড়ার মাংস, মধু, ছাগলের দুধ, শুকনো ফল—আয়োজনে কোনও ত্রুটি ছিল না। খাওয়ার পর উদ্দাম নাচগান শুরু করল ওরা। রিয়াও খুব নাচল। একফাঁকে আমরা দুজনে কেটে পড়েছিলুম। তাঁবুতে একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর কর্নেল বললেন, ইচ্ছে ছিল রিয়াকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করব। কিন্তু আর সাহস করে ঝুঁকি নিতে পারছি না। চলো, দুজনেই রওনা হই।

কথাটা বুঝতে পারলুম না। জিগ্যেস করেও কোনও জবাব পেলুম না কর্নেলের। শুধু মনে পড়ল, হালাকুকে কর্নেল সকালে বলছিলেন, রিয়াকে নিয়ে সেই 'উফো' নামার জায়গায় যাবেন।

মাইল-তিনেক পাথুরে মাটি আর ঘাসের জঙ্গল ভেঙে যেখানে পৌঁছলুম, সেখান থেকে পূর্বে কান্দ্রা শহর এবং এস. আর. এল., অবজারভেটরি ইত্যাদি পরিষ্কার দেখা যায়। পশ্চিমের পাহাড়ে আজও সেই আলোর অপরূপ নানারঙের খেলা দেখা যাচ্ছিল।

কর্নেল বললেন, কাল রাত্রে মনে হচ্ছিল উফো নামার জায়গাটা এতদূরে নয়। নেহাত চোখের ভুল। দেখতে পাচ্ছ জয়ন্ত, কতখানি জায়গায় ঘাস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে?

প্রায় তিরিশ বর্গমিটার জায়গা কালো হয়ে আছে। কর্নেল সাবধান করে না দিলেও ওই ছাইয়ের ত্রিসীমানায় যেতুম না। কর্নেল হাঁটু মুড়ে একপ্রান্তে বসে ছাই দেখতে-দেখতে বললেন, সকালে ডঃ সোম এবং আর যাঁরা এসেছিলেন, অনেক ছাই তুলে নিয়ে গেছেন দেখছি। তেজস্ক্রিয় তা থাকাও হয়তো সম্ভব ছাইয়ের মধ্যে।

—তাহলে অত কাছে বসে আছেন কেন? উঠে আসুন।

কর্নেল একটু হাসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, থাকলেও সে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ খুব সামান্যই হবে। ক্ষতি করার ক্ষমতা হয়তো খুবই কম।

চারদিকে চক্কর দিয়ে এলেন কর্নেল। মনে-মনে হিসেব কষে বললেন, উফোটা যদি চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন বিমানই হয়, আয়তনে খুবই ছোট। ব্যাস বড়জোর দশফুট—তার বেশি কিছুতেই নয়। তিনটে ঠ্যাং ছিল। ওই দেখ, তিনটে গর্ত। আকার কাল রাত্রে যা দেখেছি, কিছুটা কমলালেবুর মতো—ওপর ও নিচেটা চাপা।

—আমার তো মনে হচ্ছিল, ফ্যানের বডি-অংশটার মতো।

কতকটা তাই বটে। —কর্নেল ঘুরে পেছনে কী দেখছিলেন।—কী ওটা? —বলে এগিয়ে গেলেন। তারপর হেঁট হয়ে যে জিনিসটা কুড়িয়ে নিলেন, সেটা আমার পরিচিত। ওজরাকের পাঞ্জা!

কর্নেল পাঞ্জাটা দেখতে-দেখতে বললেন, ডঃ সোমদের এটা চোখে পড়া উচিত ছিল। পড়েনি কেন?

বললুম, ওঁরা চলে যাওয়ার পর ওজরাক হয়তো পাঞ্জাটা আপনার জন্য রেখে গেছে।

কর্নেল আমার রসিকতায় মন দিলেন না। পাঞ্জাটা পকেটস্থ করে বললেন, চলো তো ওদিকটা দেখে আসি।

আমরা সিধে নাকবরাবর পশ্চিমদিকে হেঁটে চললুম। চূড়ায়-চূড়ায় সেই বিচিত্র বর্ণালি এখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পিচকিরির ধারার মতো নেমে আসছে সবুজ তৃণভূমিতে। চোখ ধাঁধানো ওই অপার্থিব ইন্দ্রজাল মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। মাইলটাক এগিয়ে সেই নহর দেখতে পেলুম। একটু দ্বিধা হচ্ছিল। অস্বস্তি জাগছিল। কিন্তু কর্নেলকে অনুসরণ করতেই হল।

নহরের ওপারে কিছুদূরে গিয়ে পাহাড়ের ছায়ার মধ্যে পৌঁছলুম আমরা। আরও কিছুটা যাওয়ার পর চূড়ার বর্ণালী আর দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের সামনে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে কঠিন গ্র্যানাইট শিলার আকাশভেদী দেয়াল। নিচে বিশাল-বিশাল পাথরের চাঁই পড়ে আছে। যুগ-যুগ ধরে ভেঙে পড়েছে ওই দেয়ালের চাবড়া। সেগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে কর্নেল একখানে দাঁড়ালেন। তারপর বাইনোকুলারের সাধারণ লেন্সে আরও একটা লেন্স এঁটে দিলেন।

কিছুক্ষণ চূড়াগুলো খুঁটিয়ে দেবার পর বললেন, আশ্চর্য তো! এই পাহাড়ের কোনও চূড়াতেই একচিলতে বরফ জমেনি। এ তো অসম্ভব ব্যাপার! চারদিকের সব পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে আছে। শুধু এই অংশটায় বরফ নেই। অবাক লাগছে, ডঃ সোম এই বৈশিষ্ট্যের কথা তো বলেননি!

সূর্য কালো পাহাড়ের পেছনে নেমেছে। তাই চূড়াগুলোর শীর্ষরেখা রঙিন দেখাচ্ছে এবং আকাশেও খানিকটা জায়গা জুড়ে রঙিন ছোপ পড়েছে।

সেদিকে তাকিয়েছিলুম তন্ময় হয়ে। হঠাৎ কোথাও গুলির শব্দ শোনা গেল

কয়েকবার এবং কর্নেলের চাপা গলার ডাকে সম্বিৎ ফিরল। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি আসছি। তুমি বরং বাঁদিকে—

দ্রুত বললুম, কোথায় যাবেন? চলুন, আমি যাচ্ছি।

—না। তুমি এখানে পাথরের আড়ালে বসে বাঁদিকে লক্ষ রাখ। কাউকে দেখতে পেলে কি না আমাকে বল। ওদিকে লক্ষ রাখার জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

মাথামুন্ডু বুঝলুম না। একা থাকতে আমার অস্বস্তিও হচ্ছিল। কিন্তু বরাবর ওঁর কথা মেনে চলেছি, এখনও মেনে নিলুম। ভেবে পেলুম না, কে এমন জায়গায় এসে গুলি ছুঁড়ছে? কেনই বা ছুঁড়ছে?

কর্নেল গুঁড়ি মেরে এগিয়ে পাথর ও ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি ওঁর কথামতো একটা পাথরের আড়ালে বসে বাঁদিকে লক্ষ রাখলুম।

বসে আছি তো আছি। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখ জ্বালা করছে। দিন শেষের আবছায়া ক্রমে ঘন হয়ে যাচ্ছে। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কিন্তু কর্নেলের যেমন ফেরার নাম নেই, তেমনি বাঁদিকে তাকিয়ে এতক্ষণ কারুর টিকিটি পর্যন্ত চোখে পড়েনি। আঁধার জমে এলে অসহ্য লাগল। অস্বস্তিটাও বেড়ে গেল। এখন কর্নেল ফিরে এলে তিনি সিধে না উলটো কর্নেল তাও বোঝা কঠিন হবে যে।

তাছাড়া একেবারে ওজরাকের এলাকায় এসে পড়েছি। খপ করে ধরে মহাকাশে কোন অজানা গ্রহে নিয়ে গিয়ে ফেললে আর এই চিরচেনা পৃথিবীতে ফেরার চান্স নেই।

মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। টর্চ জ্বেলে নাড়তে-নাড়তে গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগলুম, কর্নেল! কর্নেল। —সত্যি বলতে কী, এ ডাকাডাকি নেহাত আতঙ্কের চোটেই।

কোনও সাড়া এল না। আরও বারকতক ডেকে হঠাৎ মাথায় এল, কর্নেলের নিশ্চয় কোনও বিপদ ঘটেছে। এতকাল কত সাংঘাতিক বিপদ থেকে, এমন কী মৃত্যুর মুখ থেকে ওই বৃদ্ধ আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন। আর আমি ওঁর বিপদের সময় আতঙ্কে পাগলের মতো কাণ্ড করছি!

পকেট থেকে গুলিভরা রিভলবার বের করে উনি যেদিকে গেছেন, সেদিকে এগিয়ে চললুম। এবার আমার মনে সাহস আর জেদ ফিরে এসেছে। ওজরাক হোক আর যেই হোক, একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ব না।

কিছুদুর এগিয়ে পাহাড়ের দেয়ালের ঠিক নিচে একখানে টর্চের আলো ফেলে চমকে উঠলুম। কেউ চিৎ হয়ে পড়ে আছে পাথরের ওপর। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি কর্নেল নন। অচেনা একজন লোক। চোখ বুজে নিস্পন্দ পড়ে আছে। পরনে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট আর চামড়ার জ্যাকেট। মুখের গড়নে কাশ্মীরী বলেই মনে হচ্ছিল।

বেঁচে আছে কিনা হাতের নাড়ি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ওর ডান হাতটা যেই তুলতে গেছি, এক মুঠো ছাই উঠে এল হাতে। ওমনি হাত ঝেড়ে পিছিয়ে এলুম।

টর্চের আলো কমে এসেছে ততক্ষণে। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে তাহলে। ভীষণ অসহায় বোধ করলুম। সেই সঙ্গে আতঙ্কটা আবার টেনে ধরল আগের মতো। এই হতভাগ্য লোকটিও নির্ঘাত ওজরাকের বলি! এখানে কেন এসেছিল সে? কর্নেলও কি এমনি ছাই হয়ে পড়ে আছেন কোথাও?

টর্চের আলো নিভিয়ে দিলুম। তারপরই একটু দূরে কর্নেলের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলুম। —জয়ন্ত নাকি?

আমার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। বোবাধরা গলায় বললুম, আপনি কর্নেল তো?

—হ্যাঁ, ডার্লিং! তুমি যা ভাবছ, তা নই।

টর্চ নিভে গেল। তখন আমার টর্চ জ্বেলে দেখি, কর্নেল এবং একজন লোক এগিয়ে আসছে। কপালের কাটা দাগটা দেখে নিতে ভুল করলুম না। প্রকৃত কর্নেলই বটে। উত্তেজিতভাবে বললুম, এখানে একটা ডেডবডি পড়ে আছে। একেবারে ছাই হয়ে গেছে পুড়ে। অথচ চেহারা অবিকৃত, পোশাকও!

কর্নেল বললেন, দেখেছি। কিন্তু তোমার ভয় পেয়ে ছুটোছুটি চ্যাঁচামেচি করা উচিত ছিল না। জোর বেঁচে গেছ। তোমাকে ওখানে বসে থাকতে বলেছিলুম।

আঁধারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না যে! তাছাড়া আপনার দেরি দেখে—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে! কাশিমসায়েব, আর এখানে নয়। চলুন। যেতে-যেতে কথা হবে। হতভাগ্য বশির খাঁয়ের ডেডবডি ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে, এটাই দুঃখ।...

॥ লাল-আপেলের খপ্পরে ॥

কাশিম খাঁ প্রতিরক্ষা দফতরের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন অফিসার। আর যে লোকটা পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে, সেই বশির খাঁ তারই একজন স্থানীয় এজেন্ট। বশির তাঁকে গোপনে খবর দিয়েছিল, পশ্চিম পাহাড়ের ওখানে কিছুদিন থেকে সন্দেহজনক লোকের গতিবিধি রতার নজরে পড়েছে।

আসলে বশির ছিল 'ডাবল-এজেন্ট'। চীন ও পাকিস্তানের সাহায্যে একটি দেশদ্রোহী গোষ্ঠী কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র করার জন্য বহুদিন থেকে চক্রান্ত করছে। সেই গোষ্ঠীর সাংকেতিক নাম 'লাল-আপেল'। বশির এদের কাছেও টাকা খেত।

গত রাত্রে 'উফো' নামার ফলে কান্দ্রা এলাকায় প্রতিরক্ষা দফতরের লোকেদের মধ্যে খুব উত্তেজনা ছিল। বশির এই সুযোগে কাশিম খাঁকে পশ্চিম পাহাড়তলিতে যেতে বলেছিল মিথ্যা খবর দিয়ে। সেখানে ওত পেতে বসে ছিল 'লাল-আপেলে'র একজন ঘাতক।

কিন্তু তারপরই ঘটেছিল ভারি অদ্ভুত ঘটনা।

কাশিম খাঁ যখন বশিরের কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছেছেন, দেখলেন বশির পাহাড়ের খাড়া দেয়ালের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁকে ইশারায় ডাকছে। এই রকমই অবশ্য কথা ছিল। কিন্তু কাশিম খাঁ ওর কাছে যাবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়ে একঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে বশির পড়ে গেল নিঃশব্দে। বিদ্যুতের ঝলকটা বড়জোর এক সেকেন্ডের জন্য।

কাশিম খাঁ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর দেখলেন, বশিরের বাঁদিকে একটা পাথরের আড়াল থেকে একজন লোক পড়ি-কী-মরি করে দৌড়ে পালাচ্ছে। তার মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। সঙ্গে-সঙ্গে কাশিম খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন লোকটা 'লাল-আপেল'। তাই রিভলবার তাক করে গুলি ছুঁড়েছিলেন।

কাশিম খাঁর তাড়া খেয়ে সে লুকিয়ে পড়েছিল। এই সময় কাশিম খাঁ কর্নেলকে ছুটে আসতে দেখেন। দিন-শেষের আবছা আলোয় কর্নেলকে দেখে তিনি ভাগ্যিস চিনতে পেরেছিলেন। নইলে কর্নেলকে গুলি খেয়ে পড়ে থাকতে হতো।

ততক্ষণে কাশিম খাঁ বশিরের মতলব বুঝতে পেরেছেন। কর্নেল এবং তিনি সেই 'লাল আপেলে'র ঘাতককে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি কর্নেলের খোঁজে সেখানে গিয়ে পড়ি।

কাশিম খাঁর রিভলবারের গুলি খেয়ে আমাকেও চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে হতো। ভাগ্যিস কর্নেল তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন।...

গুজরদের তাঁবুতে ফিরে আসার পথে কর্নেল এই কাহিনি আমাকে শুনিয়ে বললেন, জয়ন্ত! ওজরাক যেই হোক, মারাত্মক লেসার রশ্মিকে অস্ত্র হিসাবে সে ব্যবহার করছে। তবে আমরা লেসার অস্ত্র বলতে যা বুঝি, তার চেয়ে উন্নতমানের এবং সাংঘাতিক তার অস্ত্র।

—কিন্তু বশিরের ওপর তার রাগের কারণ কী?

কাশিম খাঁ হাসতে-হাসতে বললেন, বশির কোনও বেয়াদপি করে থাকবে তার সঙ্গে।

কর্নেল বললেন, আপনার জিপ তো লেকের কাছে। তাহলে কিছুক্ষণ আমাদের তাঁবুতে কাটিয়ে যান!

কাশিম খাঁ বললেন, আজ থাক, কর্নেল! দেরি হয়ে যাবে। এখনই ফিরে গিয়ে আমাকে এই ঘটনার রিপোর্ট দিতে হবে। তাছাড়া গুজরদের তাঁবুতে আমার খাওয়া ঠিক নয়। ওদের মধ্যেও 'লাল-আপেলে'র চর আছে।

—বলেন কী!

—সেইরকমই খবর আছে আমাদের হাতে। আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন।

একটু দূরে গুজরদের তাঁবুতে আলো দেখা যাচ্ছিল। কাশিম খাঁ বিদায় নিয়ে

অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের সাহসের প্রশংসা করতে হয়। এমন কাণ্ডের পর নার্ভ ঠিক রেখেছেন এবং অন্ধকারে ঘাসের জঙ্গল, আর পাথরের দুর্গমতা পেরিয়ে অকুতোভয়ে কেমন হেঁটে গেলেন।

ওকগাছটা ফাঁকা জায়গায় কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় একটা কাঠ পুঁতে মশাল জ্বেলে বেঁধে রেখেছে হালাকু। পাথরটাতে বসে বোধ হয় আমাদের তাঁবু পাহারা দিচ্ছে সে। হাতে বল্লম।

আমাদের দেখে সেলাম দিয়ে বলল, খুব ভাবনায় ছিলুম হুজুর। যাকগে, দেওতাজীর কৃপায় ভালোয়-ভালোয় ফিরতে পেরেছেন।...

রাত এগারটা অবধি ওদের তাঁবুর ওদিকে নাচগান চলল। শুকনো ঘাসের ওপর চামড়ার বিছানা আর বালিশে শুয়ে অনভ্যাসের দরুন ঘুম অসম্ভব ব্যাপার। কর্নেলের রীতিনীতি আলাদা। উনি গাছের ডালে শুয়েও নাক ডাকিয়ে ঘুমতে পারেন দেখেছি।

শুয়ে ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, খামোকা মির্জাসায়েবকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পাঠালুম। একগাদা টাকা গচ্চা যাবে। নিশুতি রাতে নবাবি রত্নালঙ্কারের লোভে কোনও চোর আসবে না। আসলে আমি ওজরাককে ভুল বুঝেছিলুম। ল অফ প্যারিটি...নেচারস লেফট হ্যান্ড টুইস্টের পদ্ধতি...

নাক ডাকার মধ্যে কর্নেল যেন ঘুমের দেশে যেতে যেতে প্রলাপ বকছেন। বিরক্ত হয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

নাক ডাকা থামল। বললেন, বলো ডার্লিং!

—কী শুধু ল অফ প্যারিটি-প্যারিটি করছেন! আসল ব্যাপারটা কী?

—মিরর-ইমেজ তৈরির কৌশল ওজরাক জানে।

—তা তো জানেই। সেটা আমি আর আপনি স্বচক্ষে দেখেছি দুজনে। রিয়াও দেখেছিল।

আবার নাক ডাকতে থাকল কর্নেলের। আমার খোঁচা খেয়ে জড়ানো গলায় শুধু বললেন, জেরক্স মেশিনের মতো একটা ডুপ্লিকেটিং মেশিনই যথেষ্ট। তার সঙ্গে আই আর প্রজেক্টর।

—কী বলছেন?

—ইমেজ রিফ্লেকশান প্রজেক্টর।

—কর্নেল! প্লিজ! খুলে বলুন।

তালে-তালে নাক ডাকতে থাকল। আর হাত বাড়িয়ে খোঁচাখুঁচি করেও জাগাতে পারলুম না। শরীর তো নয়, পাথর।

তাঁবুর সামনে হালাকু আগুনের কুণ্ড জ্বেলে দিয়েছিল। এখনও আগুন ধুগধুগ করছে। ওদের নাচগান থেমে গেছে। নিঃসাড় স্তব্ধ তৃণভূমিতে মাঝে-মাঝে রাতপাখির

ডাক শোনা যাচ্ছে। কখনও ঘুম জড়ানো গলায় কুকুরগুলো ডেকেই চুপ করে যাচ্ছে। হালাকু যে কম্বল দিয়েছে, সেটা খুবই কর্কশ। ভেড়ার লোম দড়ির মতো পাকিয়ে তৈরি। তার ওপর আঠা দিয়ে একরাশ পশম এঁটেছে। কিন্তু যত নরম হোক কিংবা গরম হোক, অস্বস্তিকর।

রাত বারোটার পর সেই পাহাড়ি ঝোড়ো হাওয়াটা শনশনিয়ে এসে গেল। ঘাসের জঙ্গলে ভুতুড়ে শব্দ হতে থাকল। আমাদের তাঁবুর মুখ পূর্বদিকে। ঝড়টা বইছে পশ্চিম থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁবুর তলা দিয়ে কনকনে বিচ্ছিরি হাওয়া ঢুকে তোলপাড় জুড়ে দিল। তাঁবুটাই মাঝে মাঝে উড়ে যাবার ভঙ্গি করছে। চুপচাপ কম্বলের ভেতর সেঁটে থাকলুম।

হঠাৎ খেয়াল হল, হালাকু বলে গেছে, কুণ্ডের আগুনটা যেন শোবার আগে নিভিয়ে ফেলি। কারণ, রাতের ঝড়টা এলে অঙ্গার উড়ে ঘাসের জঙ্গলে পড়বে এবং আগুন ধরে যাবে।

পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখি, ঝড়ের ধাক্কায় প্রায় নিভে যাওয়া আগুন চাঙা হয়ে উঠেছে এবং ফুলকি ছড়াচ্ছে চিড়বিড়িয়ে।

দেখামাত্র বেরিয়ে গেলুম। পাশেই জলভরা মাটির পাত্র আছে। পাত্র থেকে জল ঢেলে আগুনের কুণ্ডটা নিভিয়ে দিলুম। তারপর হেঁট হয়ে তাঁবুতে ঢুকতে যাচ্ছি, মাথার পেছনে খটাস করে আঘাত লাগল। প্রচণ্ড আঘাত। মাথা ঘুরে গেল। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হল, তাঁবুর কাঠেই হয়তো ধাক্কা লেগেছে।

তারপর কী হয়েছে, জানি না।...

চোখ খুলে কিছু বুঝতে পারছিলুম না। একটা বদ্ধ পাথরের ঘর, ঢালুমতো এবড়ো-খেবড়ো তার ছাদ এবং একটা গোল ঘুলিঘুলি দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। দুজন লোক একপাশে বসে ফ্লাস্ক থেকে চা বা কফি ঢেলে খাচ্ছে। তাদের মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। পাশে দুটো স্টেনগান পড়ে আছে।

অমনি মনে পড়ে গেল 'লাল-আপেল'-এর কথা। উঠে বসার চেষ্টা করলুম। কিন্তু মাথায় যন্ত্রণা। অনেক কষ্টে অবশ্য উঠতে পারলুম। লোকদুটো কুতকুতে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে পাত্রে চুমুক দিচ্ছিল। একজন দুর্বোধ্য ভাষায় অপরজনকে কিছু বলল। অপরজন মাথা নাড়ল। তখন প্রথমজন ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে আমাকে বলল, এই বাঙালি বুড়বাক। তুই কি খবরের কাগজের লোক?

বললুম, হ্যাঁ। তোমরা আমাকে ধরে এনেছ কেন?

—তোকে আমাদের লড়াইয়ের কথা লিখে তোর কলকাতার কাগজে পাঠাতে হবে।

—কী লড়াই তোমাদের?

—কাশ্মীরের লোক চায় স্বাধীন কাশ্মীর। তাই তারা লড়াই করছে।

হাসবার চেষ্টা করে বললুম, কাশ্মীরের লোক ভারতে থাকতেই চায়। কাশ্মীর ভারতেরই অংশ। তাই স্বাধীনতার পর এতকাল ধরে তারা ভোট দিয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো সরকার গড়ছে। স্বাধীন কাশ্মীর চাইলে তারা কেউ ভোট দিত না। ভোট বয়কট করত।

দ্বিতীয় লোকটি দাঁত খিচিয়ে বলল, ভোট দিচ্ছে তারা বাধ্য হয়ে।

—তোমাদের সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে নেই। কারণ তোমরা মিথ্যাবাদী।

দ্বিতীয় লোকটি আমার চোয়ালে ঘুষি মারল। প্রথম লোকটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, মেজাজ ঠিক রাখ দোস্ত। এই বুরবাক! শোন। কাশ্মীরী বুরবাকরাই ভোট দিচ্ছে। তুই আমাদের ন্যায্য লড়াইয়ের কথা লিখে দস্তখত করে দিবি। আমাদের লোক কলকাতায় তোর কাগজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

—আমি লিখলেও তা ছাপা হবে না।

দুজনেই একটু অবাক হল। প্রথমজন বলল, কেন ছাপা হবে না? তুই তো তোর কাগজের রিপোর্টার! যা পাঠাবি, তাই ছাপা হবে।

—না হবে না। খবরের কাগজ যা খুশি ছাপতে পারে না।

দ্বিতীয় লোকটি খাপ্পা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, বলেছিলুম দোস্ত, এভাবে কাজ হবে না! ওকে পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই, চল। ওকে ছেড়ে দিলে উলটে আমাদের বিরুদ্ধে লিখে সরকারকে খেপিয়ে দেবে।

প্রথম লোকটি কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে আমাকে দিল। ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজ। পড়ে আমার চক্ষুস্থির। আমি দৈনিক সত্যসেবকে খবর পাঠাচ্ছি : কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি, তারা স্বাধীন কাশ্মীর চায় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বুঝলুম, 'লাল-আপেলের' উগ্রপন্থীরা রীতিমতো শিক্ষিত এবং চতুর লোক। সব খবর ওদের নখদর্পণে। প্রথম লোকটি বলল, দস্তখত করে দে!

কাগজটা ছিঁড়ে ওর মুখে ছুড়ে মারলুম। সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও উঠে দাঁড়াল। সঙ্গীকে কিছু বলল। তারপর দুজনে আমাকে হ্যাঁচকা টানে ওঠাল। ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল।

দরজার সামনে একটা চাতাল মতো। সেখানে গিয়েই আমার বুক কেঁপে উঠল। মাথা ঘুরতে থাকল। চারদিকে খাড়া সব পাহাড় এবং সামনে অতল খাদ। সেই খাদের নিচে অন্ধকার থমথম করছে।

—তাহলে এবার নরকে গিয়ে রিপোর্টারি করো! —বলে দুজনেই আমকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। গড়িয়ে পড়লুম শূন্যে। আর্তনাদ করলুম কি? জানি না। শুধু টের পাচ্ছিলুম অনন্তকাল ধরে শূন্যে তলিয়ে যাচ্ছি এবং নিচে থমথমে অন্ধকার হাঁ করে আছে।...

॥ স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন নয় ॥

হঠাৎ কীসের ছোঁয়া লাগল। খুব আরামদায়ক নরম জিনিসে আটকে গেলুম, অথবা কোন অলৌকিক বিশাল করতল আমাকে লুফে নিল। কোনও ঝাঁকুনি পর্যন্ত লাগল না।

আস্তে-আস্তে চোখ খুলে তাকালুম। একটা বিস্ময়কর পরিবেশ! এটা একটা ঘরই বটে। কিন্তু চারপাশের দেওয়াল ও ছাদ অনুজ্জ্বল নানা রঙের আলো দিয়ে যেন তৈরি। এত রং, অথচ চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, আমি শূন্যে চিৎ হয়ে ভাসছি। পিঠের নিচে কিছু নেই।

আমার সামনে একটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষের গড়নের পুতুল। হ্যাঁ, পুতুলই বটে। সাদা কাচের পুতুল। তার সারা দেহে নানা রঙের আলোর স্রোত বইছে। তার পরনে কোনও পোশাক নেই, অথবা ওই হরেক-রঙা চঞ্চল আলোই তার পোশাক।

বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তার মুখটা পুতুলের মুখের মতো আঁকানো। চুলগুলো লাল। চোখ দুটো নীল। ঠোঁটদুটোও লাল। তার চোখের ওপর ভুরু বলতে কিছু নেই। অথচ কী সুন্দর তার চেহারা! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি ছবি।

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলুম। পারলুম না। যতবার পা দুটো নিচের মেঝের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, আবার ভেসে উঠছি। এবার মনে হল, আমি ভরশূন্য অবস্থায় আমি সম্ভবত! মহাকাশযানের ভেতর মহাকাশচারীদের এমনি অবস্থা টি.ভি.-তে কতবার দেখেছি।

তারপর টের পেলুম, ওই রঙিন পুতুলের মতো প্রাণীটা আমাকে কিছু বলছে। তার ঠোঁটদুটো কিন্তু নড়ছে না। অথচ আমার মাথার ভেতর তার কথা ভেসে উঠছে অনুভূতিমালার মধ্যে দিয়ে। সে বলছে, তোমার কোনও ক্ষতি করব না। ভয় পেও না। আর দেখ, আমি তোমার সঙ্গে স্নায়বিক তরঙ্গের ভাষায় কথা বলছি। তুমিও বলার চেষ্টা করো। আমি বুঝতে পারব। নাও, চেষ্টা করো।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। স্নায়বিক তরঙ্গের ভাষাটা আবার কেমন?

—বন্ধু! ব্রেনওয়েভের কথাই আমি বলছি। মনকে তোমার বক্তব্যের দিকে একাগ্র করতে হবে। তুমি যা বলতে চাইবে, তার সঙ্গে অন্য চিন্তাকে এনে ফেল না। চেষ্টা করে দেখ, পারবে।

মনকে একাগ্র করে চিন্তার মধ্যে বললুম, তুমি কে, বন্ধু?

—ওজরাক।

চমকে উঠলুম। —তুমিই তাহলে ওজরাক!

আমার স্নায়ুতরঙ্গে ওজরাকের হাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। চিন্তা দিয়ে বললুম, আমাকে কোথায় এনেছ?

—আমার পৃথিবীর ঘাঁটিতে। কান্দ্রার পশ্চিম পাহাড়ে।

—আর কোথায় আছে তোমার ঘাঁটি?

—তোমাদের জানা গ্রহ বৃহস্পতিতে।

—তোমার দেশ কোথায়?

—আলফা সেন্টৌরির একটি গ্রহে। এখান থেকে ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরে। এ অবশ্য তোমাদের হিসেব। তোমাদের সময়ের মাপের সঙ্গে আমাদের সময়ের মাপের কোনও মিল নেই।

—তুমিই কি পাঞ্জা ফেলে রাখ যেখানে সেখানে?

—হ্যাঁ। তোমাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টির জন্য। যদি কেউ যোগাযোগ করে, সেই ভেবে।

—কান্দ্রার নবাবের 'নুরে আলম' কি তুমিই নিয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ, জিনিসটা আমারই। অসাবধানে পড়ে গিয়েছিল। একটা লোক কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের সময়ের হিসেবে এ ঘটনা দুশো বছর আগেকার। যাই হোক, পরে জানতে পেরে রোবট পাঠিয়ে নিয়ে এসেছি।

—আমাদের বিভিন্ন যাদুঘর থেকে যেসব রত্ন আর মূর্তি চুরি গেছে, তাও কি তোমার কীর্তি?

—আমারই।

—কেন এসব করেছ?

—ওগুলোর বস্তু-প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করব বলে। কাজ হয়ে গেলেই ওগুলো ফেরত পাঠাব।

—প্রতিবিম্ব কেন সৃষ্টি করবে?

—দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে দেখাব। কিছু নিদর্শন নিয়ে যাওয়া তো উচিত।

—কিন্তু এস.আর.এল. থেকে অ্যান্টিম্যাটার ডিটেকশান যন্ত্র কেন নিয়ে এসেছ?

—দরকার হয়েছে। এ ধরনের জিনিস আজও আমরা তৈরি করতে পারিনি। তাই বহুবার অ্যান্টিম্যাটার গ্যালাক্সি—যাকে বলা যায় প্রতিবিশ্ব, সেখানে দৈবাৎ গিয়ে পড়ে আমাদের অনেকে ধ্বংস হয়েছে। আমাদের শরীর আলো-কণিকায় গড়া। কিন্তু অ্যান্টি-পার্টিকল নয়। আলফা-সেন্টৌরি এলাকা এই গ্যালাক্সিরই অন্তর্ভুক্ত। তবে তোমাদের যন্ত্রটার বস্তু-প্রতিবিম্ব তৈরি করে ফেরত পাঠাব রোবটের হাতে। অন্যের জিনিস আমরা নিই না। নিলে তা ফেরত দিই। রোবট এনেছি সেইজন্যই।

—তোমরাও তাহলে রোবট তৈরি করেছ?

—বন্ধু! আমরা একই গ্যালাক্সির প্রাণী। পরিবেশের দরুন আমাদের দেহের উপাদানে যতই তফাত থাক, একই গ্যালাক্সিতে একই ধরনের সভ্যতার বিকাশ ঘটবে,

এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তবে তোমরা এখনও পেছনে পড়ে আছ। আমাদের যন্ত্র-প্রাণী তোমাদের চেয়ে বহু উন্নত।

—তোমাদের খাদ্য কী?

—এনার্জি। নক্ষত্র থেকে এনার্জি সংগ্রহ করে আমাদের খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। ...তুমি হাসছ কেন বন্ধু?

—রিয়ার, আমার আর আমার বৃদ্ধ বন্ধুর প্রতিবিম্ব পাঠিয়েছিলে কেন?

—কৌতুক ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

—বশির খাঁকে মারলে কেন?

—আমার রোবটের পাল্লায় পড়েছিল। ওর নাম বুরাখ। বুরাখ এই ঘাঁটি পাহারা দেয়। ও যাকে ছোঁয়, সে মারা পড়ে। পৃথিবীতে এসে বুরাখ বড় নিষ্ঠুর আর বদরাগী হয়ে গেছে। ওকে সামলানো যাচ্ছে না।

—রিয়াদের মদ্দা ভেড়াটা কী দোষ করেছিল?

—বুরাখ গাড়োলটা দেখে অবাক হয়েছিল। তাই ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল।

—বুরাখের পায়ে কি ঘুঙুর বেঁধে রেখেছ?

—সে আবার কী জিনিস? ওটা যন্ত্রের শব্দ। আমার স্পেসশিপের মতো বুরাখও ম্যাগ্নেটিক এলিমেন্টে তৈরি।

—আমাকে উদ্ধার করল কে?

—বুরাখ। আমার হুকুমে।

—আমি পুড়ে ছাই হইনি যে?

—আমি ওর ধ্বংস-ক্ষমতা নিউট্রাল করে দিয়েছিলুম।

—আমাকে কি বন্দি করে রাখবে, বন্ধু?

—না। তোমার বস্তু-প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে নিয়ে তারপর তোমাকে রেখে আসব।

বলে ওজরাক পেছনের আলোর দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। এতক্ষণে আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকল। আবার চোখ বুজে এল। চেষ্টা করেও চোখ খুলতে পারলুম না। শূন্যে ভাসার আরামদায়ক অনুভূতি আমাকে ঘুমের দিকে টানছিল।...

॥ বিদায় বন্ধু ওজরাক! ॥

কেউ যেন দূর থেকে ডাকছিল। চোখ খুলে দেখি, ওজরাক দাঁড়িয়ে আছে। আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুতে তার স্নায়ুতরঙ্গের প্রতীকী ভাষা প্রতিধ্বনিত হল ঃ বন্ধু! বন্ধু! তোমার বস্তু-প্রতিবিম্ব দ্যাখো। কেমন হয়েছে বলো?

ভরহীন অবস্থায় ভেসে থেকে দেখলুম, অবিকল 'আরেক আমি' দাঁড়িয়ে আছে ওজরাকের পাশে। মুখ দিয়ে মানুষের ভাষায় বলার চেষ্টা করলুম, হাই জয়ন্ত চৌধুরী!

কোনও শব্দই বেরুল না। তখন হাত নাড়লুম। আমার প্রতিবিম্ব বাঁহাত নেড়ে একটু হাসল।

ওজরাক জানিয়ে দিল, বাতাস না থাকায় শব্দ হবে না। বাতাসের বদলে আমরা আলোকতরঙ্গ থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস নিই। আমরা কথা বলি স্নায়ুতরঙ্গের মাধ্যমে।

—বন্ধু ওজরাক! আমার প্রতিবিম্ব তো অ্যান্টিম্যাটার । তবু বিস্ফোরণ ঘটছে না কেন?

—শক্তিশালী কণিকা ট্যাকিওনের ফ্রেমে ঘিরে রেখেছি।

—ওই স্কেলের মতো জিনিসটা কী?

—ডুপ্লিকেটিং মেশিন। ওটা বস্তু-প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

—রিয়ার, আমার বা কর্নেলের প্রতিবিম্ব তৈরি করেছিলে ওতে?

—হ্যাঁ। তবে ওটার সঙ্গে আই. আর. প্রজেক্টর জুড়ে তবেই তোমাদের প্রতিবিম্ব পাঠাতে পেরেছিলুম।

—ইমেজ রিফ্লেকশান প্রজেক্টার! আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এই যন্ত্রটার কথা বলছিলেন বটে!

—বুড়ো লোকটিকে আমার খুব পছন্দ!

—ওঁকে ধরে আনতে বুরাখকে পাঠিয়ে দাও না কেন?

—হাতে সময় নেই। ডাক এসে গেছে। আমাকে রওনা দিতে হবে।

ওজরাকের চাঞ্চল্য অনুভব করছিলুম। আমার স্নায়ুতে প্রচণ্ড চাপ লাগছিল। সে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। এবার দেখতে পেলুম ওর হাতের তালু থেকে আঙুল পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পাঁচটা সাদা রেখা ঝিকমিক করছে। বজ্রের প্রতীক। ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে দিলুম। কোনও অনুভূতি জাগল না। মনে হল না কিন্তু আঁকড়ে ধরেছি বা স্পর্শ করেছি। যেন শূন্যে করমর্দন করছি। কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছি। তার হাতে আমার হাত। দুটো হাতই পরস্পর ঝাঁকুনি দিচ্ছি। স্নায়ুতরঙ্গের প্রতীকী ভাষায় বিদায় জানাচ্ছি পরস্পরকে।

তারপর ওজরাক আলোর দেয়ালের দিকে ঘুরল। অমনি একটা বেঁটে মূর্তি বেরিয়ে এল। সঠিক বর্ণনা অসম্ভব। বড়জোর বলা যায়, জল দিয়ে একটা বেঁটে ও চ্যাপ্টা পুতুল বানানো সম্ভব যদি হতো, এইরকমই দেখাত। ওজরাক চিন্তার ভাষায় আদেশ দিল, বুরাখ! আমার পৃথিবীর বন্ধুকে রেখে এসো।

বুরাখ আমাকে ধরল। তার শরীর তুলতুলে স্পঞ্জের মতো। আমার প্রতিবিম্ব মমির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে হাত নেড়ে চিন্তার ভাষায় বললুম, বিদায় জয়ন্ত চৌধুরী!

হতচ্ছাড়া দ্বিতীয় জয়ন্ত কেন জানি না, গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে রইল। নির্বাসনের দুঃখেই কি? ওজরাক হাত তুলল। বিদায় বন্ধু!

॥ ওজরাক, না মুসা!! ॥

কেউ ডাকছিল। চোখ খুলেই ভড়কে গেলুম। আমার ওপর ঝুকে আছে চিরচেনা দাড়িওয়ালা একটা মুখ। মুখে সস্নেহ হাসি—কেমন বোধ করছ, ডার্লিং? একটু অপেক্ষা করো। কাশিম খাঁ অ্যাম্বুল্যান্স আনতে গেছেন।

উঠতে গিয়ে টের পেলুম, শরীর প্রায় নিঃসাড়। মাথার পেছনে যন্ত্রণা। আস্তে বললুম, আমি কোথায়?

—কান্দ্রার তৃণভূমিতে।

—বুঝেছি! ওজরাকের রোবট বুরাখ আমাকে এখানে রেখে গেছে।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, ওজরাকের রোবট নয় জয়ন্ত, গুজর রাখাল ছেলেরা।

—অসম্ভব!

—উঁহু। দক্ষিণের পাহাড়ের ধারে গভীর খাদে একটা ডোবা আছে। জলের ধারে তুমি পড়েছিলে। রাখাল ছেলেরা এতদূর বয়ে এনে আমাকে খবর দিতে গিয়েছিল

এবার দেখলুম, চারপাশে ভিড় করে গুজররা দাঁড়িয়ে আছে। হালাকু এব রিয়াও আছে। হালাকু ভয় পাওয়া গলায় বলল, হুজুর! উনি ওজরাকের চেলা বুরাখের নাম করছেন! ওঝা ডাকাই উচিত ছিল।

রাগ করে বললুম, ওজরাক আমার বন্ধু। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে সে আলফা-সেন্টৌরি নক্ষত্রজগতের বাসিন্দা। সে এক আলোর মানুষ।

কর্নেল নির্বিকারভাবে বললেন, আলোর নয়, নেহাতই রক্তমাংসের। তার নাম মুসা।

—কী বলছেন! কে মুসা?

—একসময়কার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী। কাশ্মীরের লোক ল অফ প্যারিটি নিয়ে গবেষণায় সুনাম ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি পরে কট্টর ভারতবিরোধী হয়ে পড়েন। লাল আপেল দল তাঁরই গড়া।

বললুম, আমি বিশ্বাস করি না। ওজরাকের সঙ্গে আমার কত কথা হয়েছে সে—

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, তুমি পাহাড় থেকে ডোবার জলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ডার্লিং! অজ্ঞান অবস্থায় বোধ করি একটি উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছ। আমরা আজ দুপুরে পশ্চিম পাহাড়ের ভেতর লাল আপেল-নেতা মুসার গোপন ঘাঁটি আবিষ্কার করেছি। মুসা তাঁর ম্যাগ্নেটিক ফ্লাইং শিপে চেপে আকসাই চীনের দিকে পালিয়ে গেছেন। সঙ্গে রোবটটিকেও নিয়ে গেছেন। তবে তাঁর আবিষ্কৃত ম্যাটার ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ইমেজ রিফ্লেক্টার, কিছু লেসার অস্ত্র আর চুরি যাওয়া জিনিসগুলো উদ্ধার করতে পেরেছি।

অবাক হয়ে বললুম, রত্ন আর মূর্তি চুরি কেন করতেন মুসা?

—ডুপ্লিকেটারে ওগুলোর অসংখ্য বস্তু-প্রতিবিম্ব তৈরি করে বিদেশে বেচে দলের জন্য অর্থ সংগ্রহই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসা প্রথমে খেয়াল করেননি, বস্তু-প্রতিবিম্বের অ্যান্টি-ম্যাটার হওয়ার চান্স আছে। ওতে হাত দিলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। পরে ব্যাপারটা খেয়াল হওয়ায় স্পেস রিসার্চ ল্যাব থেকে অ্যান্টি-ম্যাটার ডিটেকশান সিস্টেম চুরি করেন।

—কীভাবে চুরি করতেন?

—ম্যাগ্নেটিক ফ্লাইং শিপ রেডার স্ক্রিনের পাল্লার বাইরে কোথাও রেখে মিসাইল সিস্টেমের সাহায্যে রোবটটিকে নির্দিষ্ট টার্গেটের দিকে পাঠাতেন। ধরো, কোনও জাদুঘরের রত্ন বা মূর্তি হাতাতে চান। আগে থেকে লাল-আপেলের চররা দর্শকদের ভিরে সেই যাদুঘরে গিয়ে জিনিসটা কোথায় আছে এবং কীভাবে সে ঘরে পৌঁছনো যাবে, সবকিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে। নকশা তৈরি করেছে। মুসা সেইসব তথ্য ও নকশার ডাটা কোড-ল্যাংগুয়েজে রূপান্তরিত করে রোবটের মাথার ভেতরকার কম্পিউটারে ফিড করিয়েছেন। রোবটটির বুকে টি ভি ক্যামেরা ফিট করে দিয়েছেন। এবার রোবটটি কম্পিউটারের সাহায্যে টার্গেটে পৌঁছে কাজ করবে। লেসার বিমের তাপে ঘরের তালা গলাবে। লকারে রত্ন থাকলে লকার গলিয়ে ফেলবে। মূর্তির বেলায় অবশ্য কাজটা সহজ। যদি রোবট ভুল করে, সেজন্য সাবধানী মুসা ফ্লাইং শিপে বসে টি ভি স্ক্রিনে লক্ষ রাখতেন। বেগতিক দেখলে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে রোবটকে সাহায্য করতেন। রোবটের সামনে মানুষ পড়লে রোবট লেসার বিম প্রয়োগ করে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আশা করি, পদ্ধতিটা বুঝতে পেরেছ?

—কিন্তু ঘুঙুরের শব্দ, শিস, ঝড়?

—ডঃ সোম ঠিকই বলেছিলেন। মুসার ম্যাগ্নেটিক ফ্লাইং শিপ এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের চৌম্বক প্রবাহের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটত এবং বিকর্ষণজনিত অভিঘাত বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ সৃষ্টি করত। ঝড় এবং ওইসব অদ্ভুত শব্দ তারই ফলাফল।

একটু চুপ করে থেকে বললুম, রিয়ার প্রতিবিম্ব, আমার বা আপনার প্রতিবিম্ব নিয়ে কী তামাশা করতেন মুসা?

কর্নেল হাসলেন, তামাশা নয়। ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্বের মরীচিকা প্রতিফলিত করে ভয় দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য, যাতে কেউ পশ্চিম পাহাড় তল্লাটে পা না বাড়াই! ওজরাকের কিংবদন্তীকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন মুসা।

—ওজরাকের পাঞ্জাও কি ওঁর তৈরি?

—না জয়ন্ত! ওগুলো ন্যাচারাল রক ফর্মেশন। হাজার-হাজার বছর আগে এই এলাকায় উল্কা পড়েছিল। উল্কার উপাদান আর ভূ-পৃষ্ঠের শিলা-উপাদানের বহু রাসায়নিক পদার্থ আছে। উভয়ের মিশ্রণে বিক্রিয়ার ফলে ওই চাকতিগুলো

ব্যাঙের ছাতার মতো সৃষ্টি হয়েছিল। শিলাছত্রাক বলতে পার। তবে মুসা এগুলো ওজরাক-রহস্যের নিদর্শন হিসেবে কাজে লাগাতেন। চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা আর কী!

সামরিক বাহিনীর অ্যাম্বুল্যান্স এসে গেল। গুজরদের ভিড় হটিয়ে কাশিম খাঁ এলেন। সঙ্গে স্ট্রেচার নিয়ে দুজন স্বাস্থ্যকর্মী। স্ট্রেচারে যখন আমাকে ওঠানো হয়েছে, চোখ গেল পশ্চিম পাহাড়ের দিকে। অমনি ওজরাকের ইন্দ্রজাল দেখতে পেলুম। কী অপরূপ বর্ণবিচ্ছুরণ! ধারায়-ধারায় নেমে আসছে অজস্র রঙের ঝরর্না। কান্দ্রার তৃণভূমিকে স্বর্গের সৌন্দর্যে সাজিয়ে তুলেছে। কে বলে ওজরাক নিছক স্বপ্ন? ওই তো দেখতে পাচ্ছি, আঁকাবাঁকা বর্ণালীরেখায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার পাঞ্জার ছাপ। যে আলোর আঙুল আমি দেখেছি, ওই তো তার বিস্ময়কর প্রতীক।

তারপরই আমার হাসি পেল। স্বপ্নের ওজরাক আমার প্রতিবিম্ব নিয়ে চলে গেছে ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরের আলফা সেন্টৌরি নক্ষত্রলোকে। এতক্ষণ কি সেখানে ওজরাকের ডাইনিংরুমে বসে দ্বিতীয় জয়ন্ত চৌধুরী খিদের চোটে গপগপ করে এনার্জি খাচ্ছে? সে কি বুঝতে পারছে, সে বাঁহাতে খাচ্ছে এবং তার পিলে পেটের ডানদিকে, যকৃত বাঁদিকে, হার্ট ডানদিকে—সে এক উলটো-মানুষ?

তা না বুঝলে সে বড্ড বোকা। স্নায়ুতরঙ্গের ভাষায় ওজরাকের উদ্দেশে বললুম, বন্ধু! জয়ন্তের ঘিলুতে অন্তত এক চামচ কসমিক ইনটেলিজেন্স মিশিয়ে দিও। সে বরাবর বড্ড বোকা।...

কোদণ্ডের টঙ্কার

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘরসদৃশ বিশাল ড্রয়িংরুমে ইদানিং রবিবারের আড্ডাটা দারুণ জমজমাট হয়ে ওঠে। পুলিশের গোয়েন্দা ও অপরাধ দফতরের হোমরাচোমরা লোকেরা তো আসেনই, কর্নেলের মতো রিটায়ার-করা সামরিক অফিসাররাও কেউ-কেউ এসে জোটেন। নিজের-নিজের লাইনে সবাই তাঁরা অভিজ্ঞ লোক এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কারুর কম নেই। কাজেই প্রত্যেকেরই যেন চেষ্টা থাকে, কে কত সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে অন্যদের টিট করতে পারবেন।

এ রবিবারের কথার সূত্রপাত সম্প্রতি গঙ্গাসাগর মেলায় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী এক স্মাগলারকে গ্রেফতার নিয়ে। ডিটেকটিভ দফতরের রণবীর মণ্ডল ঘটনার রোমাঞ্চকর জায়গায় সবে পৌঁছেছেন, ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বেমক্কা বলে উঠলেন, " ওয়েট, ওয়েট। এভাবে বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু মণ্ডলসায়েব তো ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কথা বলছেন। নেপাল বর্ডারে আমি সীমান্ত বাহিনীতে থাকার সময় এক সত্যিকার সন্ন্যাসীকে স্মাগলিংয়ের কারবারে জড়িত থাকার জন্য পাকড়াও করেছিলুম।'''

ক্রাইম ব্রাঞ্চের মণি চ্যাটার্জি মুচকি হেসে বললেন, "সত্যিকার সন্ন্যাসী? সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির এঁরা তো মশাই সংসারত্যাগী পুরুষ! এঁরা স্মাগলিং করতে যাবেন কোন দুঃখে?"

ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বললেন, "তা বলতে পারব না যা দেখছি, তাই বলছি। সন্ন্যাসীর বোঁচকার ভেতর পাওয়া গিয়েছিল একগাদা কোকেন, মারিজুয়ানা, এল এস ডি, কয়েক রকম নার্কোটিকস।"

ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের রঘুবীর শর্মা তাঁকে সমর্থন করে বললেন, "চ্যাটার্জিসায়েব! সত্যি বলতে কী, সাধু বলুন, সন্ন্যাসী বলুন, ফকির বলুন, কেউ সংসারত্যাগী নন।"

চ্যাটার্জি বললেন, "কেন নন?"

শর্মা হাসলেন। "মশাই, কোনও মানুষের পক্ষে কি সত্যিই সংসার ত্যাগ করা সম্ভব? একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝবেন। ওঁরা আসলে নিজেদের ব্যক্তিগত সংসার ত্যাগ করেছেন, তার মানে পরিবার বা আত্মীয়স্বজনকে ছেড়েছেন। কিন্তু তার বদলে অন্যান্য মানুষকে নিয়েই তাঁদের চলতে হয়। আমাদের মতোই তাঁদের ট্রেনে-বাসে চাপতে হয়।"

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়ি চুলকে মন্তব্য করলেন, "প্লেনেও।"

"হ্যাঁ, প্লেনেও," শর্মা জোর দিয়ে বললেন। "তাছাড়া তাঁদের পেটে খেতেও হয়। না খেলে তো বাঁচা যায় না।"

মণ্ডল বললেন, "শুনেছি, কোনও-কোনও সাধু নাকি স্রেফ বাতাস খেয়ে থাকেন।"

কর্নেল এক কোনায় বসে আপনমনে আতশকাচ দিয়ে এক টুকরো হাড়ের

মতো দেখতে কী একটা জিনিস পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে ফোড়ন কাটলেন, "সাপকে বায়ুভুক বলা হতো প্রাচীনকালে। কথাটা ভুল।"

"ভুল তো বটেই," শর্মা দাপটের সঙ্গে বললেন, "শুধু বাতাস খেয়ে কোনও প্রাণীর পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। কাজেই যা বলছিলুম, নিছক খাদ্যের জন্যও সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরদের সংসারের নাগালে থাকতেই হয়।"

চ্যাটার্জি বললেন, "কী বলছেন! হিমালয়ের দুর্গম স্থানে কত সাধু থাকেন।"

ইকবাল সিং হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনার কথায় লজিক নেই। যদি দুর্গম স্থানে সত্যি কেউ থাকেন, তাঁকে দেখল কে? তাছাড়া হিমালয় বাস্তবিক তত দুর্গম নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের পা তার সবখানেই পড়েছে। আমি দেখেছি, হিমালয়ে যত সাধু থাকেন, সকলের ডেরা কোনও-না-কোনও তীর্থে অথবা তীর্থপথের ধারে। তীর্থপথের আনাচে-কানাচেও কাউকে থাকতে দেখেছি। শর্মাসায়েব ঠিকই বলেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সংসারত্যাগী বলা হয় বটে, কিন্তু সংসারী মানুষদের ছাড়া তাঁদের চলে না। অবশ্য বলতে পারেন, ছোট সংসার ছেড়ে বড় সংসারে ঢোকেন তাঁরা।"

মণ্ডল বললেন, "তা না হয় মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সাধুদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য?"

"মানুষের সমস্ত ক্ষমতা লৌকিক,"—শর্মা বললেন, "সাধুরা কেউ-কেউ ম্যাজিক দেখান আসলে।"

ইকবাল সিং তাঁকে সমর্থন করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, "ম্যাজিক কী বলছেন মশাই! কোনারকের ওখানে এক সাধুকে এক হাত উঁচুতে, স্রেফ শূন্যে বসে ধ্যানস্থ দেখেছি।"

শর্মা এবং সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। মণ্ডল বললেন, "বলেন কী। হঠযোগীরা এমন করেন শুনেছি।"

চ্যাটার্জি বললেন, "নিজের চোখকে তো মশাই অবিশ্বাস করতে পারব না, সে আপনারা যাই বলুন। সমুদ্রের ধারে পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল। সাধুবাবা মিনিট-দুয়েক ওইভাবে শূন্যে থাকার পর মাটিতে নামলেন।"

একটু তফাতে আমার পাশে বসে ছিলেন প্রাইভেট গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার। কে. কে. হালদার নামে ইদানিং পরিচিত। ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। পেল্লায় গোঁফ। পুলিশের সি. আই. ছিলেন মফস্বলে। রিটায়ার করে প্রাইভেট ডিকেটটিভ এজেন্সি খুলেছেন গণেশ অ্যাভেনিউতে, তিনতলা একটা বাড়ির ছাদে অ্যাজবেসটসের চাল চাপানো একটা ছোট্ট ঘর। রাস্তা থেকে সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ে ঃ হালদার ডিটেকটিভ এজেন্সি। তলায় ইংরেজিতে লেখা ঃ রহস্যের ধাঁধায় পড়লে, চলে আসুন।

হালদারমশাই আজ কর্নেলের আড্ডায় কেন এসেছেন জানি না। কর্নেলের কাছে বোধ করি কোনও ব্যাপারে পরামর্শ নিতেই এসে থাকবেন। হোমরা-চোমরাদের কথার

মধ্যে এতক্ষণ নাক গলাতে ভরসা পাচ্ছিলেন না হয়তো। কিছুক্ষণ থেকে ওঁকে উসখুস করতে এবং ঘন-ঘন নস্যি নিতে দেখছিলুম। বাথরুমে বারবার হাঁচতে যাচ্ছিলেন, সে অবশ্য হলফ করে বলতে পারি। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন স্যার—"

ব্রিগেডিয়ার সিং বললেন, "না, না। বলুন, কী বলতে চান।"

হালদারমশাই বললেন, "চ্যাটার্জিসায়েব তো শূন্যে সাধুবাবাকে ধ্যান করতে দেখেছেন। আমি সম্প্রতি কোদণ্ডগিরির জঙ্গলে গিয়েছিলুম বেড়াতে। সেখানে আমার এক ভাগ্নে ফরেস্ট অফিসার। খুব তেজী আর সাহসী—"

শর্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আহা! কী দেখেছেন, তাই বলুন!"

হালদারমশাই মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, "স্বচক্ষে দেখে এলুম স্যার, এক সাধুবাবা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, আবার দৃশ্য হচ্ছেন। এখুনি অদৃশ্য হচ্ছেন, আর তখুনি দৃশ্য হচ্ছেন। এই অশরীরী, এই শরীরী। একবার দেখছি নেই, একবার দেখছি আছেন।"

বলার ভঙ্গিতেই ঘরে অট্টহাসির ধুম পড়ে গেল। তারপর শর্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে যেন? আপনি?"

"অধমের নাম কে. কে. হালদার," হালদারমশাই কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "তবে চিনবেন বইকি স্যার! আপনিই তো আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির লাইসেন্সের দরখাস্তে কাউন্টারসাইন করেছিলেন। নইলে লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হতো।"

শর্মা হাসতে-হাসতে বললেন, "তাই বলুন! আপনিই সেই গোয়েন্দা হালদার? বুঝেছি। এবার এইসব গুলতাপ্পি ঝেড়ে মক্কেলের সংখ্যা বৃদ্ধির মতলব করেছেন বুঝি?"

বিব্রত হালদারমশাই জিভ কেটে বললেন, 'ছি, ছি! এ কী বলছেন স্যার! এই জয়ন্তবাবুকে জিগ্যেস করুন, ওঁদের দৈনিক সত্যসেবকে এ-খবর বেরিয়েছে কি না।"

চ্যাটার্জি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেছিলুম বটে।"

শর্মা আমার দিকে চোখের ঝিলিক তুলে বললেন, "বাঃ! তাহলে জয়ন্তকেও ম্যানেজ করে ফেলেছেন! সত্যি, আপনার কোনও তুলনা হয় না হালদারমশাই!"

আমি ঝটপট বললুম, "কখনও না। খবরটা নিউজ এজেন্সি থেকে পাওয়া। তাছাড়া হালদারমশাইও ব্যাপারটা যে দেখে এসেছেন, এ আমি এইমাত্র শুনছি।"

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "নিউজ এজেন্সির যে রিপোর্টার এই খবর জোগাড় করেছে, তার সঙ্গে হালদারমশাইয়ের যোগাযোগ ঘটেছিল কি না আমরা অবশ্য জানি না।"

হালদারমশাই কী বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠলেন। "মাই গুডনেস! সাড়ে দশটা বাজে। করছি কী আমি? সি. পি.-র সঙ্গে জরুরি কনফারেন্স! মিঃ শর্মা, মিঃ মণ্ডল,- কী ব্যাপার? আপনাদের তাড়া দেখছি না যে!"

দুজনেই "তাই তো" বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিন পুলিশ-জাঁদরেল

কর্নেলের উদ্দেশে "বাই" হেঁকে বেরিয়ে গেলেন। ব্রিগেডিয়ার সিংও হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন। তিনিও কর্নেলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ষষ্ঠী ডাইনিং ঘরের দরজায় পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছিল। বলল, "যা বাব্বা! আবার যে কোফি করলুম একগাদা। খাবে কে এত?"

কর্নেল হাড়ের মতো জিনিসটা আর আতশকাচ রেখে বললেন, "কোফি করেছিস?"

"আজ্ঞে বাবামশাই।"

কর্নেল হালদারমশাইয়ের উদ্দেশে বললেন, "কী হালদারমশাই, সাধুকে তো অদৃশ্য হতে দেখেছেন। কিন্তু কখনও কোফি খেয়েছেন কী? এ বস্তু একমাত্র ষষ্ঠীই বানাতে পারে।"

যষ্ঠী ট্রে নিয়ে আসছিল। জিভ কেটে বলল, "কঁফি! কঁফি!"

"ঠিক আছে। কঁফিই খাওয়া যাক।" কর্নেল উঠে আমাদের কাছে এসে বসলেন।

কর্নেলের এ-পরিহাসে মন নেই হালদারমশাইয়ের। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কী রকম অপমানিত হলুম দেখুন কর্নেল! আপনার মতো বহুদর্শী জ্ঞানী লোক আমার কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। আর এই সব পুঁচকে ছোকরা অফিসার—আমার ছেলের বয়সি সব!"

"দুঃখ করবেন না হালদারমশাই," কর্নেল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন। তারপর নিজের হাতে কফি ঢেলে প্রচুর দুধ মিশিয়ে পেয়ালা এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। "বাস্তব কিছু-কিছু ঘটনা অনেককে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। জানেন তো, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান?"

বললুম, "কোদণ্ডগিরির সাধুর ব্যাপারটা আপনি বাস্তব ঘটনা বলছেন নাকি?"

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হালদারমশাই সড়াত শব্দে গরম কফি টেনে ব্যস্তভাবে গিলতে-গিলতে বললেন, "বাস্তব মানে? স্বচক্ষে দেখে এসেছি আমি। মাত্র একটা ঝরনার এধার-ওধার। ওধারে পাথরের ওপর সাধুবাবা, এধারে পাথরের আড়ালে আমি।"

"দিনে, না রাত্তিরে?"

"রাত্তিরে। তবে জ্যোৎস্না ছিল। পরিষ্কার ঝলমলে আলো। তাছাড়া শুধু ওখানে নয়, পরে ট্রেনেও।"

ফোন বাজলে ওঁর কথায় বাধা পড়ল। কর্নেল হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে সাড়া দিলেন। তারপর বললেন, "কে? কে. কে. হালদার? হুঁ, আছেন। ধরুন, দিচ্ছি।"

হালদারমশাই খপ করে ফোন কেড়ে নিয়ে চড়া গলায় বললেন, "দুলাল নাকি?... কী? পালিয়ে গেছে? হতভাগা বাঁদর ছেলে! তোকে পই-পই করে বলা আছে... না, না। কোনও কথা শুনতে চাইনে তোর। যেমন করে পারিস, খুঁজে ধরে নিয়ে আয়। নইলে... হ্যাঁ, হ্যাঁ। আশেপাশে... কাছাকাছি... যত্ত সব!"

শব্দ করে ফোন রেখে হালদারমশাই গোঁজ হয়ে বসলেন। কর্নেল মৃদু স্বরে বললেন, "পাখি নাকি?"

"হুঁঃ!"

"কথা-বলা পাখি?"

"হুঃ!"

বুঝতে পারছিলুম, হালদারমশাই রেগে আগুন হয়ে আছেন এবং আনমনে হুঁঃ দিচ্ছেন শুধু। এবার কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "কথা-বলা পাখিটা কী কোদণ্ডগিরির জঙ্গল থেকে এনেছিলেন হালদারমশাই?"

কৃতান্ত হালদার তড়াক করে ঘুরে বললেন, "আরে, ওটার ব্যাপারেই তো আসা আপনার কাছে। এখন দেখুন তো কী করি! আমার ভাগ্নে দুলালকে নজর রাখতে বলে এসেছিলুম। পর-পর দু'রাত্তির বাড়িতে চোর আসছে। অদ্ভুত ব্যাপার, চোর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শিস দেয়। তখন পাখিটাও শিস দেয়। বড় রহস্যময় ব্যাপার নয়, কর্নেল?"

"রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে। তা পাখিটা পালাল কীভাবে?"

"দুলাল বলল, বাইরে কে ডাকছিল। গিয়ে দ্যাখে, কেউ না। তারপর ফিরে এসে দ্যাখে, বারান্দার খাঁচা খোলা। অথচ দেখুন, বারান্দায় গ্রিল আছে।"

"বাড়িতে আর কোনও লোক নেই?"

"আজ্ঞে না।" হালদারমশাই নস্যির কৌটো বের করে অনেকটা নস্যি নাকে গুঁজে হাঁ করে রইলেন। কিন্তু হাঁচি এল না।

কর্নেল বললেন, "পাখিটা কি কাকাতুয়া, না ময়না?"

"ময়না"। হালদারমশাই করুণ মুখে বললেন, "ওটার ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করতে আসা কর্নেল স্যার! আপনি ঠিকই ধরেছেন। কোদণ্ডগিরির জঙ্গলে একটা আদিবাসী ফেলে ফাঁদ পেতে পাখিটা ধরেছিল। কথা বলতে পারে দেখে কিনে নিয়েছিলুম।"

"তাহলে নিশ্চয় কারুর পোষা পাখি। উড়ে গিয়ে জঙ্গলে বেড়াচ্ছিল।"

"ঠিক বলেছেন। কিন্তু সেটা কোনও রহস্য নয়। রহস্য হল পাখিটার বুলি। প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলুম, বলছে ঃ মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিলড বাই গঙ্গারাম। গঙ্গারাম কেন গঙ্গারামকে কিল করবে, এটা একটা রহস্য নয় স্যার?"

"অবশ্যই।" কর্নেল পর্যায়ক্রমে টাক এবং সাদা দাড়িতে ঘন-ঘন হাত বুলোতে থাকলেন।

বুঝলুম, রহস্যটা মনে ধরেছে আমার বৃদ্ধ বন্ধুর। তাতে আরও একটু যোগান দেবার ইচ্ছেয় বললুম, "রাত্তিরে চোর এসে শিস দিচ্ছিল বললেন হালদারমশাই!"

হালদারমশাই বললেন, "আর পাখিটাও পালটা শিস দিচ্ছিল! মজাটা বুঝুন একবার।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "সুতরাং রহস্য ঘনীভূত হল বলা যায়।"

আমি বললুম, "হালদারমশাই, এর সঙ্গে সেই অদৃশ্য হতে পারে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুর ব্যাপারটার কোনও যোগাযোগ নেই তো?"

হালদারমশাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বললেন, "আছে বলেই তো কর্নেলস্যারের কাছে আসা। ট্রেনে পাখিটাকে লুকিয়ে আনছিলুম। নইলে রেলবাবুরা আপত্তি করতেন। তো মাঝরাত্তিরে হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, এক সাধু আমার বাংকের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। তড়াক করে উঠে বসেছি। আর অবাক কাণ্ড, সাধু অদৃশ্য। বেমালুম হাওয়া।"

কর্নেল বললেন, "আশা করি, স্বপ্ন দেখছিলেন না?"

"কখনও না। ট্রেন জার্নিতে আদপে আমার ঘুম হয় না।"

আবার ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিয়েই কৃতান্ত হালদারকে দিলেন। হালদারমশাই আগের মতো চড়া গলায় বললেন, "দুলাল? ...কী? লোম? সাদা লোম? বলিস কী?... যাচ্ছি। এখনই যাচ্ছি।"

ফোন ছেড়ে উত্তেজিতভাবে হালদারমশাই বললেন, "কর্নেল এখুনি আমার সঙ্গে চলুন দয়া করে। খাঁচায় আর বারান্দা জুড়ে একগাদা সাদা লোম দেখতে পেয়েছে দুলাল। কী সাংঘাতিক রহস্য বুঝুন।"

॥ দুই ॥

"এই লোমরহস্য আমার তত সাংঘাতিক মনে হচ্ছে না। হালদারমশাই," কর্নেল সাদা লোমগুলো পরীক্ষা করতে-করতে বললেন। "এগুলো নিছক বাঁদরের লোম। তবে সাধারণ বাঁদর নয়, খুদে বাঁদর। স্কুইরেল মাংকি বলে যাদের।"

কৃতান্ত হালদার অবাক হয়ে বললেন, "স্কুইরেল মানে তো কাঠবেড়ালি।"

"হ্যাঁ। কাঠবেড়ালির সঙ্গে অনেকটা মিল আছে বটে। বাঁদরটা দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা। দিব্যি পকেটে রাখা যায়।"

"কিন্তু এখানে কোত্থেকে এল অমন উদ্ভুট্টে জীব? কিছু যে বোঝা যাচ্ছে না স্যার!"

কর্নেল গ্রিল-দেওয়া বারান্দায় একটু ঘোরাঘুরি করে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললেন, "পাখিটার কিছু পালক পড়ে আছে দেখেও বুঝতে পারছেন না?"

"আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে, কর্নেল!" বারান্দায় একটা চেয়ারে হতাশভাবে বসে পড়লেন হালদারমশাই। "ডাক্তার পরের রোগ ধরে চিকিৎসা করেন! কিন্তু নিজের রোগ হলে অন্য ডাক্তার ডাকেন। কেন ডাকেন, হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি। উরেব্বাস! বিস্তর রহস্য ঘেঁটেছি, এবার আমাকেই রহস্য-রোগ এসে জাপটে ধরেছে।"

কর্নেল হাসলেন। "স্কুইরেল মাংকির লোম আর ময়নাপাখির পালক পড়ে থাকাটা মূল রহস্যরোগ নয়, হালদারমশাই! নেহাত উপসর্গ।"

কখন থেকে মুখ খেলার জন্য উসখুস করছিলুম। এবার বললুম, "ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি মনে হচ্ছে।"

কর্নেল বললেন, "বলো ডার্লিং!"

"কেউ একটা ট্রেন্ড খুদে বাঁদর পাঠিয়ে পাখিটা খাঁচা থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। মিথ্যা করে বাইরের দরজায় কলিং বেল টিপেছে। দুলাল দেখতে গেছে কে ডাকছে, আর এদিকে তার বাঁদর গ্রিলের ভেতর দিয়ে ঢুকে খাঁচা খুলে পাখিটা ধরেছে। পাখি আর বাঁদরে একটু ধস্তাধস্তি হওয়া স্বাভাবিক। তাই এসব লোম আর পালক।"

কৃতান্ত হালদার লাফিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। "সাবাস জয়ন্তবাবু! সাবাস! দেখছেন? এই সামান্য ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় আসছিল না।"

কর্নেল ততক্ষণে বাইরে চলে গেছেন। বাড়িটা একতলা এবং পুরনো পূর্ব শহরতলি এলাকার নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত। আশেপাশে পোড়ো জঙ্গলে জমি, একটা পুকুর আর প্রচুর গাছপালাও রয়েছে। কিছু নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে এখানে-ওখানে। তার ওধারে একটা বিস্তীর্ণ মুসলিম গোরস্থান। এমন জায়গায় শুধু চোর কেন, ভূতপেরেতদেরও দিনদুপুরে হানা দেওয়া স্বাভাবিক।

হালদারমশাইয়ের ভাগ্নে শ্রীমান দুলালের বয়স পনেরো-যোলোর বেশি নয়। সবে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। মামার মতোই লম্বাটে ছিপছিপে গড়ন। মুখচোরা ছেলে বলে মনে হচ্ছিল। এই কাণ্ডের পর বেচারা ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে খালি। আমার কথা শোনার পর সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাইরের দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন রাস্তা দেখছি, পাখিটার চ্যাঁচামেচি কানে এসেছিল যেন। এতক্ষণে মনে পড়ল।"

ভাগ্নেকে ভেংচি কেটে হালদারমশাই বললেন, "অ্যাঁতক্ষণে মঁনে পঁড়ল! স্কুলে তুই স্ট্যান্ড করিস না হাতি করিস! মুখস্থ বিদ্যের শিরোমণি! রিয়্যাল লাইফে তুই স্ট্যান্ড করতে পারবি ভেবেছিস? সে-গুড়ে বালি।"

দুলালকে কাছে টেনে নিয়ে বললুম, "আহা! মিছিমিছি ওকে বকবেন না হালদারমশাই! আপনি বাড়িতে একা থাকলেও একই ব্যাপার ঘটত না কি?"

বুঝতে পেরে হালদারমশাই ধাতস্থ হলেন। গোঁফ চুলকে বললেন, "কিন্তু মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিলড বাই গঙ্গারাম। ব্যাপারটা কী বলুন তো! পাখিটা এমন উদ্ভুট্টে কথা শিখল কী করে? ধরে নিচ্ছি, কেউ শিখিয়েছে। কিন্তু গঙ্গারাম গঙ্গারামকে খুন করে কীভাবে? সুইসাইড মনে হয় না আপনার?"

বললুম, "হ্যাঁ, সুইসাইড ধরে নিলে একটা অর্থ দাঁড়ায়।"

কর্নেল বাইরে থেকে ঘুরে এসে বললেন, "এখানে আর কোনও সূত্র মিলবে

না, হালদারমশাই! কোদণ্ডগিরিতে গেলে কিছু সূত্র মিলতেও পারে। পাখিটা যখন সেখানেই পেয়েছিলেন!"

হালদারমশাই বললেন, "তা না হয় যাওয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারাম ইজ কিলড বাই গঙ্গারাম ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা, তাতে জয়ন্তবাবু আর আমি একমত হয়েছি কর্নেল স্যার!"

কর্নেল আনমনে বললেন, "পাখির কথা ঠিকমতো বুঝতেও ভুল হতে পারে। আমি একবার শুনতে পেলে হয়তো বুঝতে পারতুম, ঠিক কী বলছে।"

দুলাল নড়ে উঠল। "আমি টেপ করে রেখেছি। শুনবেন?" বলে দৌড়ে সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর একটা টেপরেকর্ডার নিয়ে এল।

কৃতান্ত হালদার খি-খি করে হেসে বললেন, "ওর জন্মদিনে আমার ছোটবোন—মানে ওর মাসি প্রেজেন্ট করেছে। দেখছেন কাণ্ড? পাখির কথা টেপ করে বসে আছে।"

টেপ চালিয়ে ছিল দুলাল। প্রথমে কিছুক্ষণ কাক আর চড়ুইদের ডাক শোনা গেল। তারপর শোনা গেল দুলালের গলা। "নাও বিগিন মিঃ ব্ল্যাকি! বিগিন!...ও নো-নো! প্লিজ মিঃ ব্ল্যাকি!" তারপর শিসের শব্দ। ময়নাপাখির গায়ের রং কালো। ঠোঁট টুকটুকে হলুদ। দুলাল ওকে মিঃ ব্ল্যাকি নাম দিয়েছিল তাহলে! একটু পরেই ব্ল্যাকির কথা শোনা গেল : "মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিলড বাই গঙ্গারাম।" একবার নয়। বার পাঁচ-ছয় একই কথা।

কর্নেল বললেন, "আরেকবার টেপটা চালাও তো দুলাল।"

দুলাল টেপটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিল রিভার্স বোতাম টিপে। তারপর প্লে বোতামটা টিপল। আবার সেইসব শব্দ। দুলালের কথা। তারপর পাখির গলা।

কর্নেল চোখ বুঝে শুনছিলেন। দুলাল টেপ বন্ধ করে বলল, "আবার চালাব কর্নেলদাদু?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "না। হালদারমশাই, আপনি ভুল শুনেছেন।"

"ভুল?" হালদারমশাই বললেন। "সে কী! গঙ্গারামই তো বলল। তাই না জয়ন্তবাবু?"

সায় দিয়ে বললুম, "তাই তো মনে হল।"

কর্নেল বললেন, "পাখিটা বলছে, মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিলড বাই বংকারাম।"

"বংকারাম! এমন নাম আবার হয় নাকি? গঙ্গারাম নাম শুনেছি বটে।"

"হয় ডার্লি!" কর্নেল একটু হাসলেন। "কোদণ্ডগিরি তো ওড়িশায়। ওড়িশায় বংকাবিহারী, বংকারাম এসব নাম খুব কমন।"

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন, "তাহলে তো আর দেরি করা উচিত নয়, স্যার! এখনই কোদণ্ডগিরি রওনা দিতে হয়।"

একটু পরে হালদারমশাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। আমার সাদা ফিয়াট গাড়িটা আস্তেসুস্থে চালিয়ে আনছিলুম। দুদিন থেকে গণ্ডগোল করছে গাড়িটা। যখন-তখন অদ্ভুত শব্দ করতে-করতে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু ঠেলে দিলে আবার স্টার্ট নিচ্ছে অবশ্য। ওবেলা গ্যারেজে না দিলেই নয়।

আজ হালদারমশাইয়ের বাড়ি আসার সময় কোনও গণ্ডগোল করেনি। কিন্তু ফেরার পথে সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে পৌঁছেই ঘড়ঘড় করতে-করতে থেমে গেল। একটু হেসে বললুম, "কর্নেল! ঠেলতে হবে।"

কর্নেল গুম হয়ে বসে ছিলেন। চোখ বন্ধ এবং দাড়িতে আঙুলের চিরুনি। বুঝতে পারছিলুম, গোয়েন্দাপ্রবর গঙ্গারাম বনাম বংকারাম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমার কথায় চোখ খুলে বেজায় চমকানো গলায় বললেন, "কী বললে?"

"ঠেলতে হবে।" বলে দরজা খুলে সবে নেমেছি, অবাক হয়ে দেখলুম কর্নেলও হন্তদন্ত নামলেন বটে, কিন্তু নেমেই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে হঠাৎ দৌড়তে শুরু করেছেন। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর দেখি উনি সামনের বাসস্টপে সদ্য এসে দাঁড়ানো একটা বাসের পাদানিতে উঠে পড়লেন। তারপর বাসটা ছেড়ে গেল।

এতকাল ধরে ওঁর বিস্তর উদ্ভুটে আচরণ দেখে আসছি। কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি। রাগ করার মানে হয় না, বিশেষ করে এমন একটা ক্ষেত্রে। ফুটপাথের বাসিন্দা একদঙ্গল ছেলে আমার অবস্থা দেখে দৌড়ে এল। তাদের কিছু বলতে হল না। তারা গাড়িটা ঠেলতে শুরু করল। গাড়ি স্টার্ট নিলে তাদের বখশিশ দিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে চললুম।

ছুটির দিন আজ। কাগজের আপিসে যাওয়ার তাড়া নেই। খেয়েদেয়ে অভ্যাসমতো ভাতঘুম দিয়ে যখন উঠে পড়লুম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। মার্চের মাঝামাঝি বেশ গরম পড়েছে। লোডশেডিং না হয়ে গেলে ছটা অবধি বিছানায় পড়ে থাকতুম।

ব্যালকনিতে বসে তারিয়ে-তারিয়ে চা খাচ্ছি, আমার রাঁধুনি-কাম-কাজের ছেলে ফটিক এসে বলল, "সেই দাড়িওলা সায়েব এসেছেন দাদাবাবু!"

তারপর কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম, "ডার্লিং, আশা করি এ-বুড়োর ওপর থেকে রাগটা এতক্ষণে পড়ে গেছে। হুঁ, মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, প্রিয় ভাতঘুমখানা চমৎকারই হয়েছে। রাগের পক্ষে নিরেট একখানা ঘুমই যথেষ্ট। যাই হোক, ঝটপট তৈরি হয়ে নাও। কোদণ্ডগিরি এক্সপ্রেস ট্রেন সওয়া ছটায় ছাড়বে হাওড়া থেকে। ভাগ্যিস মিঃ রাঘবনকে ফোনে পেয়েছিলুম। আস্ত একখানা কুপের ব্যবস্থা করা গেছে।" কর্নেল আমার কাঁধে থাবা হাঁকড়ালেন। "উঠে পড়ো, উঠে পড়ো! হালদারমশাই এতক্ষণে স্টেশনে পৌঁছে হাপিত্যেশ করছেন আমাদের জন্য।"

কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ভাবলুম, তখন অমন করে হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইব। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর তখনকার মতো

চোখ বুজে দাড়িতে আঙুলের চিরুনি চালাচ্ছেন এবং বলা যায় না, তখনকার মতোই যদি হঠাৎ 'রোখকে' বলে ট্যাক্সি থামিয়ে আবার বেমক্কা অদৃশ্য হয়ে যান। ওঁকে বিশ্বাস নেই। অতএব চেপে গেলুম।

দশ দম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটে কৃতান্ত হালদার দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বললেন, "পাখি, বাঁদর, সাধু! সব একত্র, সব!"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "একবার শরীরী, একবার অশরীরী? এই আছে, এই নেই!"

হাত প্রচণ্ড নেড়ে হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, "আপন গড। একটু. আগে এক সাধু আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকাতে-তাকাতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। তার কাঁধের ঝোলার স্পষ্ট দেখলুম এতটুকু একটা বাঁদরের মুন্ডু উঁকি মেরে আছে।"

বললুম, "আর পাখি?"

কর্নেলের পেছন-পেছন হালদারমশাই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে তেমনি ফিসফিসিয়ে বললেন, "পাখিটা নির্ঘাত ঝোলার ভেতর আছে। এটা অঙ্কের ব্যাপার, বুঝলেন না? সাধু আর বাঁদর যেখানে, পাখি সেখানে থাকতে বাধ্য। আর জানেন? সাধু একা নয়, তার সঙ্গে একজন চেলাও আছে দেখলুম।"

কোদণ্ডগিরি এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল প্ল্যাটফর্মে। আমাদের কুপটা পেছনে গার্ডের কামরার লাগোয়া। সামনে একটা গুডস কম্পার্টমেন্ট। ছোট্ট কুপে মাত্র তিনটে বাংক। জিনিসপত্র রেখে আমি ও কর্নেল বসে পড়লুম। হালদারমশাই সাধুবাবাকে খুঁজতে গেলেন। গাড়ি ছাড়ার এখনও মিনিট-দশেক দেরি আছে। ভাবলুম, ট্রেন ছাড়লে তবে কর্নেলের অমন করে ছুটে গিয়ে বাসে ওঠার ব্যাপারটা তুলব। কর্নেল আর-যাই করুন চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবেন না নিশ্চয়।

কর্নেল চুরুটের বাক্স বের করে পছন্দসই একটা চুরুট বেছে নিলেন। তারপর লাইটার জ্বেলে চুরুটটা ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে হঠাৎ বললেন, "ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়কের কথা তোমার মনে থাকা উচিত, ডার্লিং!"

একটু অবাক হয়ে বললুম, "খুব মনে আছে। ফোরেনসিক এক্সপার্ট সেই ওড়িয়া ভদ্রলোক তো?"

"শুধু ফোরেনসিক এক্সপার্ট নন উনি, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ওঁর অগাধ জ্ঞান। যেমন ধরো, আণবিক জীববিজ্ঞান, জ্যোতিঃ-পদার্থবিজ্ঞান। এমনকী, সম্প্রতি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর ওঁর একটা গবেষণাপত্র বিদেশে খুব হইচই সৃষ্টি করেছে। এমন অল-রাউন্ডার জিনিয়াস সচরাচর দেখা যায় না—বিশেষ করে যুগটা যখন স্পেশালিস্টদেরই, তখন এতগুলো বিদ্যায় যিনি সমান স্পেশালিস্ট তাঁকে এতদিন কেন নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি, জানি না।"

কর্নেলের বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বললুম, "দেবে'খন। কিন্তু হঠাৎ ডঃ পট্টনায়কের কথা কেন?"

কর্নেল হাসলেন। "সম্প্রতি ডঃ পট্টনায়ক কলকাতা এসেছেন। সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে ফোরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং ডিটেকটিভ ট্রেনিং সেন্টারটা তুমি দেখে থাকবে, জয়ন্ত। আজ রবিবার বারোটায় ওঁর সেখানে একটা লেকচার দেওয়ার কথা ছিল।"

"কী কাণ্ড!" হাসতে-হাসতে বললুম। "তাই হঠাৎ অমন করে দৌড়ে গেলেন—"

আমার কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, "তুমি যেই বললে 'ঠেলতে হবে' অমনি প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমেডিসের মতো আমার মাথা খুলে গিয়েছিল। সেই ইউরেকা ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল আর কি! তক্ষুনি ফোরেনসিক ল্যাবরেটরির হলে পৌঁছে ডঃ পট্টনায়কের কানে-কানে বললুম, রহস্য ফাঁস করেছি ডঃ পট্টনায়ক! PUSHPA শব্দটা আসলে PUSH PANEL A অর্থাৎ এ-মার্কা প্যানেলটা ঠেলতে হবে। খামোখা পুষ্প বা ফুল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম।"

"কিন্তু জিনিসটা কী?"

"জিনিসটা আজ সকালে তুমি আমার হাতে দেখেছ, ডার্লিং!"

"ভ্যাট! ওটা তো একটুকরো হাড় বলে মনে হচ্ছিল, কিংবা পাথুরে ফসিল!"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "মোটেও না জয়ন্ত! ছোট্ট মাউথ অর্গানের মতো জিনিসটা আসলে একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র। দুটো প্যানেলে ভাগ করা, এ এবং বি। এ-কে ঠেলে দিতেই ওটা চালু হয়ে গেল। কিন্তু আমার বা ডঃ পট্টনায়কের তো জানা নেই মূল কোন যন্ত্রকে এটা চালিত করে দূর থেকে। তাই সঙ্গে-সঙ্গে বি প্যানেলটা ঠেলে নিষ্ক্রিয় করে দিলুম। হ্যাঁ, তোমাকে বলা উচিত, এই অদ্ভুত যন্ত্রটা মাস দুই আগে পট্টনায়কই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন পার্বতী নদীর বালির চড়ায়। বালিতে প্রায় পুরোটা ঢাকা অবস্থায় ছিল। কিন্তু সিলিকন ধাতুর পাতে মোড়া। তাই ময়লা হয়ে গেলেও নষ্ট হয়ে যায়নি।"

"পার্বতী নদীর নাম তো কখনও শুনিনি! সেটা আবার কোথায়?"

"কোদণ্ডগিরি এলাকায়।"

"কী?" আমি নড়ে বসলুম এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, "সুতরাং হালদারমশাই আসার আগেই কোদণ্ডগিরি যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছিলুম ভেতর-ভেতর। যথাসময়ে জানতে পারতে। আশা করি, কাল সকালের মধ্যে ডঃ পট্টনায়কও প্লেনে ভুবনেশ্বর পৌঁছে যাবেন। কোদণ্ডগিরি টাউনশিপে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। তারপর কাজে নামব আমরা।"

এই সময় হালদারমশাই হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে পড়লেন। চাপা গলায় বললেন, "সাধু, পাখি, বাঁদর—সব একত্র। সামনে দুটো কম্পার্টমেন্টের পরেরটায় উঠেছে। কর্নেলস্যার! রহস্য একেবারে জমজমাট।"

॥ তিন ॥

হালদারমশাই বলেছিলেন, ট্রেন জার্নিতে তাঁর নাকি আদপে ঘুমই হয় না। অথচ সারা পথ দেখলুম, দিব্যি নাক ডাকিয়ে ওপরের বাংকে ঘুমোচ্ছেন। ভোর সাড়ে-ছটায় কোদণ্ডগিরি স্টেশনে যখন ট্রেন ঢুকছে, তখন উনি ঘুমে কাঠ। ওঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া মাত্র তড়াক করে উঠে বসলেন এবং বললেন, "খড়গপুর এল মনে হচ্ছে।"

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, "না হালদারমশাই, কোদণ্ডগিরি এসে গেছি। নিন, উঠে পড়ুন।"

হালদারমশাই "অ্যাঁ" বলে দমাস করে বাংক থেকে লাফ নিলেন। ট্রেন তখনও থেমে যায়নি। সেই অবস্থায় দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে আর একটা ঝাঁপ দিলেন। আছাড়ও খেলেন দেখলুম। তারপর আর ওঁকে দেখতে পেলুম না। বুঝলুম সাধু, পাখি ও বাঁদরের খোঁজেই উধাও হলেন।

সত্যিই উধাও। প্ল্যাটফর্মে বিস্তর ঢোঁড়াঢুঁড়ি করেও আর ওঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। অগত্যা ওঁর বোঁচকা আমাকেই বইতে হল। কর্নেলকে কিন্তু একটুও উদ্বিগ্ন মনে হল না। নির্বিকার মুখে বললেন, "চলো জয়ন্ত, আমাদের এখন প্রায় বারো কিলোমিটার পাড়ি জমাতে হবে। হালদারমশাইয়েরই ভাগ্নেবাড়ি। কাজেই যথাসময়ে উনি পৌঁছে যাবেন।"

একটা অটো-রিকশা ভাড়া করে আমরা রওনা দিলুম। আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও ভালো ঠেকছিল না। হালদারমশাই কোনও বিপদে পড়েননি তো? কর্নেল সেটা আঁচ করে মৃদু হেসে বললেন, "ভেবো না জয়ন্ত! হালদারমশাই সারা জীবন পুলিশে চাকরি করেছেন। তত নিরীহ মানুষ নন।"

তবু আমার উদ্বেগ রয়ে গেল। স্টেশনের আশেপাশে খনি এলাকা। চারদিকে রুক্ষ টিলাপাহাড় আর কলকারখানা। অনেকটা গিয়ে তারপর সবুজের ছোপ চোখে পড়ল। পুরনো কোদণ্ডগিরি আসলে একটা গ্রাম। তার পাশ দিয়ে হাইওয়ে চলে গেছে। পার্বতী নদীর ব্রিজ পেরিয়ে টাউনশিপ শুরু। এটাই নতুন কোদণ্ডগিরি এবং চেহারা-চরিত্রে আধুনিক শহর। এবার উঁচু পাহাড় চোখে পড়ছিল। টাউনশিপটা সেই সব পাহাড়ের মাঝখানে এক উপত্যকায় গড়ে উঠেছে।

টাউনশিপ ছাড়িয়ে আবার পার্বতী নদী চোখে পড়ল। একেবারে নদীর ধারেই একটা টিলার গায়ে সুন্দর ছবির মতো একটা বাংলোবাড়ি দেখিয়ে কর্নেল বললেন, "ওই দ্যাখো জয়ন্ত, ওটাই কোদণ্ডগিরি ফরেস্ট কনজারভেটর প্রদীপ রায়ের বাংলো। আমাদের হালদারমশাইয়ের অসংখ্য ভাগ্নের একজন।"

বলে উনি বাইনোকুলারে সম্ভবত পাখি খুঁজতে থাকলেন। হাইওয়ে ছেড়ে আমাদের অটো-রিকশা প্রাইভেট রোডে ঢুকল। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে টিলায় উঠেছে।

গেটের কাছে একজন শক্তসমর্থ গড়নের এবং সাদা স্পোর্টিং শার্ট, শর্টস ও টেনিস জুতো পরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার টুপিও সাদা। আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ইনিই প্রদীপ রায়।

প্রদীপবাবু একটু হেসে বললেন, "একটু আগে মামাবাবু ফোন করছিলেন স্টেশন থেকে। একটা কাজে আটকে গেছেন। পৌঁছুতে সামান্য দেরি হতে পারে। অবশ্য আপনাদের খবরও মামাবাবু জানিয়ে দিয়েছেন। আমি দুঃখিত, কাল থেকে আমার জিপটা গ্যারেজে। নইলে আপনাদের আনার জন্য পাঠিয়ে দিতুম।"

তাহলে গোয়েন্দাগিরিতে পুরোপুরি নেমে পড়েছেন হালদারমশাই। হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। বাংলোর দক্ষিণ-পূর্ব কোনার সবচেয়ে সুন্দর ঘরখানায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন প্রদীপবাবু। দ্রুত ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিলেন আমাদের। তারপর কফির পেয়ালা হাতে গল্প করতে থাকলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের আসার কথা গতকাল বিকেলেই ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দিয়েছেন হালদারমশাই। ভুবনেশ্বর থেকে ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়কের আসার কথাও বলেছেন।

আমরা দক্ষিণের বারান্দায় বসেছিলুম। পার্বতী নদী এই টিলার পূর্ব ও দক্ষিণ দিয়ে বইছে। কিছুটা এগিয়ে বাঁক দিয়ে পাহাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। নদীটা মাঝারি গড়নের। বিশেষ জল নেই, খালি বালি আর পাথরে ভর্তি। ওপারে ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল। কাছে এবং দূরে প্রায় সব পাহাড়ই জঙ্গলে ঢাকা। ওই জল পুরোটাই সংরক্ষিত এবং পশুপাখিদের অভয়ারণ্য। তাই গাছ কাটতে দেওয়া হয় না। প্রদীপবাবু বলছিলেন, তবু লুকিয়ে গাছ কেটে নিয়ে যায় লোকে। চোরাশিকারিদেরও খুব উপদ্রব। কালই একটা শম্বর মেরেছিল। নিয়ে যেতে পারেনি ফরেস্ট গার্ডদের তাড়া খেয়ে। শেষে শম্বরের মাংসটা আদিবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল। এই জঙ্গলকে ওরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই চোরাশিকারি বা গাছ-চোরদের দেখলে ওরা নিজেরাই তাড়া করে, আবার খবরও দিয়ে যায় চুপিচুপি।

কর্নেল হঠাৎ বললেন, "আপনার মামাবাবু একটা ময়নাপাখি কিনেছিলেন এখানে। পাখিটা নাকি অদ্ভুত কথা বলে!"

প্রদীপবাবু বললেন, "হ্যাঁ—পাখিটা চুরি গেছে শুনলুম। ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত, জানেন? দিন-পনেরো আগে মামাবাবু এসেছিলেন বেড়াতে। যাবার দিন জঙ্গলে কোথায় একটা আদিবাসী ছেলের কাছে পাখিটা কেনেন। পাখিটা আর কোনও কথা বলে না। খালি বলে, 'মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিলড বাই গঙ্গারাম।' গঙ্গারাম কে, কে জানে। আর গঙ্গারাম গঙ্গারামকে খুন করল, এর মানেই বা কী?"

কর্নেল বললেন, "উঁহু, ভুল শুনেছেন। কথাটা হবে 'আই অ্যাম কিলড বাই বংকারাম।" গঙ্গারাম নয়।"

॥ চার ॥

প্রদীপবাবু চমকে উঠে বললেন, "বংকারাম! কী আশ্চর্য!"

কর্নেল বললেন, "চেনেন নাকি বংকারামকে?"

"চিনতুম—খুবই চিনতুম," প্রদীপবাবু অবাক হয়ে বললেন। "ওঁকে এখানকার লোকে বাবু বংকারাম সেনাপতি বলে জানত। রাজাগজা লোক বললেই চলে। পুরনো কোদণ্ডগিরিতে ওঁর বাড়ি। ওঁর পূর্বপুরুষেরা নাকি এই কোদণ্ডগিরি পরগনার শাসক ছিলেন। পরে রাজত্ব ঘুচে গিয়েছিল ইংরেজের কোপে পড়ে। সেটা ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার ঘটনা। যাই হোক, বাবু বংকারাম ছিলেন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। পুলিশের খাতায় খুনে-ডাকাত বলে নাম লেখা ছিল। কিন্তু পুলিশ ওঁকে কিছুতেই ধরতে পারছিল না। গত বছর মার্চ মাসে জঙ্গলের ভেতর একটা ঝরনার কাছে দেখি, একটা খাকি পোশাক পরা লোক রাইফেল হাতে নিয়ে বসে আছে। এ জঙ্গলে শিকারের পারমিশান দেওয়া হয় না। তাই সোজা গিয়ে চার্জ করলুম। লোকটা আমাকে গ্রাহ্যই করল না। বলল, 'আমি কে জানো? বাবু বংকারাম সেনাপতির নাম শুনেছ? আমি সেই!' শুনে তো ভয় পেয়ে গেলুম। ওঁকে ঘাঁটাতে সাহস হল না। তাছাড়া আমি নিরস্ত্র এবং একা ছিলুম। তাই চুপচাপ চলে এলুম। দিন-দুই পরে হঠাৎ বাবু বংকারাম সন্ধ্যার সময় আমার এই বাংলোয় হাজির। তাঁকে খাতির করে বসালুম। বাবু বংকারাম বললেন, আমার ওপর খুব খুশি হয়েছেন। কারণ পুলিশের কানে তুলিনি যে, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখন আসল কথাটা হল, জঙ্গলের ভেতর ওঁর কিছু গোপন কাজকর্ম আছে। জঙ্গলের রেঞ্জার বা গার্ডদের যেন আমি সাবধান করে দিই, ওঁকে কেউ দেখতে পেলেও যেন না ঘাঁটায় এবং পুলিশের কানে না তোলে। আদিবাসীরা ওঁর ভক্ত। কাজেই তারা ওঁর বিরুদ্ধে কিছু করবে না।"

প্রদীপবাবু দম নিয়ে ফের বললেন, "তার কিছুদিন পরে সেই ঝরনার ধারে বাবু বংকারামের ডেডবডি পাওয়া গেল।"

কর্নেল নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, "ডেডবডি?"

"হ্যাঁ। গলায় একটা মিহি নাইলনের দড়ির ফাঁস আটকানো। জিভ বেরিয়ে রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, দড়িটা অন্তত সাত-আট মিটার লম্বা। কেউ যেন অতটা দূর থেকে হ্যাঁচকা টানে শ্বাস রুদ্ধ কর ওঁকে মেরে ফেলেছে।"

আমি বললুম, "আত্মহত্যা নয় তো?"

প্রদীপবাবু জোর গলায় বললেন, "কখনও নয়। অমন মিহি দড়ি—প্রায় সুতোই বলতে পারেন, তা দিয়ে আত্মহত্যা করা যাবে কীভাবে? গাছের ডালে বেঁধে ঝুলে পড়লেই তো ছিঁড়ে যাবে। তাছাড়া জায়গাটা ফাঁকা। ঝোপঝাড় অবশ্য আছে প্রচুর। কিন্তু কাছাকাছি দশ-বারো বর্গমিটারের মধ্যে কোনও উঁচু গাছই নেই।"

কর্নেল বললেন, "রাইফেলটা?"

"ওঁর রাইফেলটার কথা বলছেন কী? নাঃ, ওটা পাওয়া যায়নি। যে ওঁকে ফাঁস আটকে মেরেছিল, সম্ভবত সেই নিয়ে পালিয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ, কাজটা গোপেশ্বর নামে ওঁর এক স্যাঙাতের। সেও সাংঘাতিক লোক।"

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাখিটার কথা যদি সত্যি হয়, গঙ্গারামকে বংকারাম খুন করেছিল এবং শেষে বংকারামকেও কেউ খুন করল।"

আমি বললুম, "গঙ্গারামের অনুগত গোপেশ্বর প্রতিশোধ নিয়ে থাকবে।"

প্রদীপবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "মামাবাবু যদি পাখিটার কথা বুঝতে ভুল না করতেন, তাহলে বাবু বংকারামের হত্যা-রহস্য নিয়ে উঠে পড়ে লাগতেন।"

কর্নেল বললেন, "আপাতত আপনার মামাবাবু গঙ্গারামের হত্যা-রহস্য নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। দেখা যাক, কত দূর এগোতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, শেষপর্যন্ত বংকারামের হত্যা রহস্যেই জড়িয়ে পড়বেন হালদারমশাই—বিশেষ করে সাধু, পাখি আর বাঁদরের নাগাল যখন পেয়ে গেছেন।"

"সাধু, পাখি আর বাঁদর? সে আবার কী?"

কর্নেল সংক্ষেপে ঘটনাটা বললেন। শোনার পর প্রদীপবাবু খুব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সাধুর ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি আশ্চর্য, জানেন? ইদানিং সারা এলাকা জুড়ে খালি ওই নিয়ে আলোচনা। যাকে জিগ্যেস করবেন, সেই বলবে, সে স্বচক্ষে দেখেছে এক সাধুবাবা হঠাৎ তার সামনে দেখা দিয়েই নাকি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।"

কর্নেল বললেন, "আপনার মামাবাবুও নাকি দেখেছেন স্বচক্ষে!"

"হ্যাঁ,—মামাবাবু নাকি জঙ্গলের ভেতর সেই ঝরনার কাছে দেখেছেন। আর লোকেরা দেখেছে রাস্তাঘাটে, বাড়ির দরজায়, কিংবা নিরিবিলি গাছতলায়। এমনকী, আমার রাঁধুনি হলধর ঠাকুর দেখেছে কিচেনের জানলার বাইরে। ডাকব নাকি ওকে?" প্রদীপবাবু হাসতে লাগলেন।

"না, থাক," কর্নেল বললেন। "ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

প্রদীপবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "সমস্যা হচ্ছে, মামাবাবুকে অবিশ্বাস করতে বাধছে। নইলে নিছক গুজব বলেই উড়িয়ে দিতে পারতুম। মামাবাবু অবশ্য ভুল দেখতে পারেন, তাও ঠিক। তবে ঝরনার ওখানে পাহাড়ের ওপর এক সাধুকে নাকি আমাদের গার্ডরা কয়েকবার দেখেছিল। অদৃশ্য হতে দেখেনি যদিও। কিন্তু—"

কর্নেল বললেন, "কিন্তু?"

প্রদীপবাবু একটু হাসলেন। "ওই ঝরনা সম্পর্কে এখানে খুব ভয়ঙ্কর সব গল্প আছে। জায়গাটা নাকি ভূতের বাথান। রাতবিরেতে আলো-টালো দেখা যায়। হ্যাঁ, আলো আমি নিজেও দেখেছি কয়েকবার। কিন্তু কাল দিনদুপুরে একটা ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়ে গেছি।"

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন, "বলুন।"

"কালকের ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য, জানেন?" প্রদীপবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন। 'তখন প্রায় একটা বাজে। সবে খাওয়াদাওয়া করে এই বারান্দায় এসে বসেছি, হঠাৎ দেখি কী—" বলে উনি হাত বাড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আঙুল নির্দেশ করলেন। "ওই যে ছুঁচল অদ্ভুত গড়নের পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন—নিচের দিকটা কতকটা পিরামিডের মতো আর মাথাটা গির্জার চূড়া বা মিনারের মতো উঠে গেছে?"

দেখতে-দেখতে বললুম, "কী আশ্চর্য! আমি তো ওটা পাহাড়ের ওপর বাদশাহি আমলের কোনও মসজিদের মিনার বলে ভাবছিলুম। আগ্রার কাছে ঠিক এমনি একটা স্থাপত্য দেখেছি।"

প্রদীপবাবু বললেন, "না। ওটা একটা প্রাকৃতিক স্থাপত্যই বলতে পারেন। লক্ষ করে দেখুন, পাহাড়টা যেন বাণলাগানো বিশাল একটা ধনুক। কোদণ্ড মানে ধনুক। স্বয়ং শিবের ধনুক। আর গিরি হল পাহাড়। ওই পাহাড়টারই নাম তাই কোদণ্ডগিরি। তাই থেকে এলাকা এবং জনপদটার নামও হয়েছে কোদণ্ডগিরি। তা গতকাল বেলা একটা নাগাদ হঠাৎ দেখি কী, ওই ছুঁচলো চুড়ো থেকে একটা গোলমতো প্রকাণ্ড জিনিস আকাশে ছিটকে গেল। ছাইরঙা মস্ত বড় একটা গোলা যেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সেটা ভেসে রইল আকাশে। তারপর নেমে এল চুড়োর মাথায়। তারপর আর দেখতে পেলুম না। ভাবলুম চোখের ভুল নাকি!"

কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "একটা বাজে তখন?"

"হ্যাঁ। প্রায় একটা।"

"জিনিসটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছিলেন!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ছাইরঙের গোলাকার জিনিস?"

"হ্যাঁ, প্রকাণ্ড। এখান থেকে ওই পাহাড়টার দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। ঝরনাটার আছে ঠিক তার নিচেই।"

"মিঃ রায়, আপনি নিশ্চয় চন্দ্র-অভিযানের লুনার মডিউলের ছবি দেখেছেন, কিংবা আমাদের দেশ মহাকাশে যেসব কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে, তাদেরও ছবি দেখেছেন?"

প্রদীপবাবু চোখ বড় করে বললেন, "মাই গুডনেস! আপনি—"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "আপনি সম্ভবত ওই ধরনেরই কোনও জিনিস দেখে থাকবেন। এমনও হতে পারে, জিনিসটা আধুনিক কোনও আকাশযান। তথাকথিত উড়ন্ত চাকি বা ফ্লাইং সসারের মডেলে তৈরি।"

"সে কী!" প্রদীপবাবু নড়ে বসলেন।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "কাল বেলা একটা নাগাদ কয়েক সেকেন্ডের জন্য

দেখেছেন তো?" বলে পা বাড়ালেন ঘরের দিকে। "আমার ধারণা, আমি আপনাদের হয়তো একটা বিস্ময়কর ম্যাজিক দেখাতে পারব। অন্তত নিরানব্বুই শতাংশ চান্স আছে।" কর্নেল পরদা তুলে ঘরে ঢুকে গেলেন।

একটু পরে বেরিয়ে এলেন। হাতে গতকাল সকালে দেখা সেই হাড়ের টুকরো অথবা মাউথ অর্গান অথবা 'রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র' নিয়ে। চেয়ারে বসে বললেন, "দেখা যাক, কী ঘটে। মিঃ রায়, জয়ন্ত! তোমরা ওই ছুঁচল পাহাড়টার দিকে লক্ষ রাখ। রেডি—ওয়ান, টু, থ্রি!"

আমাদের চোখের সামনে সকালবেলার উজ্জ্বল রোদে পাঁচ কিলোমিটার দূরের ওই পাহাড়ের ছুঁচল ডগা থেকে একটা গোলাকার ধূসর রঙের প্রকাণ্ড জিনিস ছিটকে গেল আকাশে। স্থির ভেসে রইল। কর্নেল বললেন। "বেশিক্ষণ এই ম্যাজিক দেখানো ঠিক নয়। আরও কারুর চোখে পড়তে পারে। অতএব ম্যাজিকের খেলা সাঙ্গ হল। জয়ন্ত, এই খেলাটার নাম দিলাম, কোদণ্ডের টঙ্কার।"

গোলাটা নেমে এসে যেন চূড়ায় মিশে গেল। শ্বাস ছেড়ে বললুম, "হুঁ—PUSH PANEL A এবং PUSH PANEL B-এর জাদু। কোদণ্ডের টঙ্কার।"

"ঠিক বলেছ ডার্লিং!" বলে কর্নেল প্রদীপবাবুর দিকে ঘুরলেন। প্রদীপবাবু হতবাক হয়ে বসে আছেন।

উনি মুখ খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময় ওঁর মালী এসে সেলাম দিয়ে বলল, "গেটের কাছে এই চিঠিটি লটকানো ছিল, স্যার।" প্রদীপবাবু চিঠিটা খুলে পড়ে ভীষণ গম্ভীর মুখে কর্নেলকে এগিয়ে দিলেন। উঁকি মেরে দেখি, ইংরেজিতে যা লেখা আছে, তার মানে হল : 'তোমার আঙ্কেলকে আমরা আটকে রেখেছি। রাত দশটায় ঝরনার কাছে একা দেখা করবে। তখন কথা হবে। সাবধান, গণ্ডগোল বাধানোর মতলব করলে আঙ্কেলের মুন্ডু উপহার পাবে।'

॥ পাঁচ ॥

বেনামী চিঠিটা পেয়ে প্রদীপবাবু খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। কর্নেল ওঁকে আশ্বাস দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়ক দুপুরের আগে এসে পৌঁছুতে পারবেন বলে মনে হয় না। ততক্ষণ একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে হয়েছিল কর্নেলের। রাস্তায় একটা খালি অটো-রিকশা পাওয়া গিয়েছিল। পুরনো কোদণ্ডগিরিতে পৌঁছে কর্নেল হিন্দিতে রাস্তার একটা লোককে জিগ্যেস করলেন, "বাবু বংকারাম সেনাপতির বাড়িটা কোথায়?"

লোকটা অবাক হয়ে আমাদের দেখতে-দেখতে বলল, "বাবু বংকাবাবু তো মারা গেছেন গত বছর।"

"জানি। তাঁর বাড়িতে তো লোকজন আছে।"

লোকটা আরও অবাক হয়ে বলল, "কেউ নেই। আর বাড়ি তো শুধু নামেই। চলে যান সিধে রাস্তা ধরে। জঙ্গলের ভেতরে ভাঙা দালানবাড়ি দেখতে পাবেন।"

গ্রামটা এক সময় হয়তো সমৃদ্ধ ছিল। এখন প্রায় জনহীন ছন্নছাড়া বসতি। যারা বাস করছে, তাদের বোধহয় অন্য কোথাও যাবার সুযোগ নেই। আগাছার জঙ্গল, ধ্বংসস্তূপ, তার মধ্যে একটা করে কুঁড়েঘর। কিছুটা যাওয়ার পর ডান দিকে গাছপালা আর ঝোপের ভেতর একটা ভাঙা দেউড়ি দেখা গেল। লতাপাতায় ঢাকা দেউড়ির পাশ দিয়ে সাবধানে এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলুম আমরা। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ঘরগুলোর বুকে ঘন আগাছা গজিয়ে উঠেছে। কর্নেল চারদিক দেখতে দেখতে আনমনে বললেন, "আশ্চর্য তো!"

জিগ্যেস করলুম, "আশ্চর্যটা কী?"

কর্নেল একটু হাসলেন। "ডাকাত হওয়ার আগে বাবু বংকারাম নিশ্চয় এই বাড়িতে বাস করতেন। কিন্তু থাকার মতো আস্ত কোনও ঘর তো দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ করে দ্যাখো জয়ন্ত, এসব ঘর অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ভেঙে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"তাই হচ্ছে বটে, কিন্তু এই ভূতের আস্তানায় আপনার হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না।"

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে পা বাড়ালেন। একটু তফাতে একটা ফোঁকর দেখা যাচ্ছিল। ফোঁকরটা লতাপাতায় প্রায় ঢাকা পড়েছে। আমি বারণ করার আগেই কর্নেল গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়লেন। অগত্যা আমি ওঁকে অনুসরণ করলুম। একটা সুড়ঙ্গপথই বলা যায়। দিনদুপুরে আঁধার হয়ে আছে। একটু পরে সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটা ছোট চত্বরে পৌঁছলুম আমরা। কর্নেল বললেন, "এদিকটাই ছিল বাড়ির অন্দরমহল।"

এখানেও একই অবস্থা। উঁচু সব ধ্বংসস্তূপ চারপাশে। আগাছা আর লতাপাতার ঝালরে ঢাকা। বুনো ফুলের কড়া গন্ধ মউ-মউ করছে এই ধ্বংসপুরীতে। পাখ-পাখালির ডাকও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কর্নেলের এখন পাখি দেখার মন নেই। এমনকী ওঁর দাড়ি ঘেঁসে প্রজাপতিও আনাগোনা করছে, যেন দেখতেও পাচ্ছেন না। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে ওপাশ থেকে একটা বটগাছের ডালপালা ঝুঁকে এসেছে আমার মাথার ওপর। হঠাৎ ওপর থেকে কী একটা জিনিস ধুপ করে আমার ঘাড়ে পড়ল। আঁতকে উঠে লাফ দিতেই গলায় হ্যাঁচকা টান এবং সঙ্গে-সঙ্গে দম আটকে এল। গোঁ-গোঁ করতে-করতে পড়ে গেলুম ঘাসের ওপর।

তারপর কানে এল গুলির শব্দ। তারপর মাথার কাছে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম, "জয়ন্ত! জয়ন্ত!"

আস্তে-আস্তে উঠে বসলুম। তাকিয়ে দেখি, কর্নেলের হাতে কতকটা কাঠবেড়ালির মতো দেখতে একটা খুদে বাঁদর। পিটপিট করে তাকাচ্ছে বাঁদরটা। কর্নেল তার কাঁধটা শক্ত করে ধরে রেখেছেন। তাই বাঁদরটার নড়াচড়ার সাধ্য নেই। আমাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কর্নেল বললেন, "জোর বেঁচে গেছ ডার্লিং! আর একটু দেরি হলে বাবু বংকারামের অবস্থা হতো তোমার। যাই হোক, গলার ফাঁসটা এবার খুলে ফেলো।"

এবার শিউরে উঠে দেখলুম, আমার গলায় মিহি নাইলনের সুতো জড়ানো। ব্যাপারটা বুঝতে এক সেকেন্ডও দেরি হল না। কাঁপা-কাঁপা হাতে গলা থেকে সুতোটা খুলে ফেললুম।

কর্নেল বললেন, "ভাগ্যিস বাঁদরটাকে আগে দেখতে পেয়েছিলুম। তোমার মাথার ওপর ওই ডাল বেয়ে এগিয়ে আসছিল। ফাঁসটা নিয়ে যেই তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে, আমিও এক লাফে এগিয়ে ওকে ধরে ফেলেছি। তবে ফাঁস ধরে যে টান দিয়েছিল, তাকে দেখতে পাইনি। আন্দাজে রিভলভারের গুলি ছুঁড়ে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি। লোকটা সম্ভবত বটগাছের গুঁড়ির ওপর কোথাও বসে ছিল। কারণ তার লাফিয়ে পড়া আর দৌড়ে যাওয়ার ধুপ-ধুপ শব্দ শুনতে পেয়েছি।"

উঠে দাঁড়ালুম। মাথা ঝিমঝিম করছে। কুৎসিত বাঁদরটার দিকে তাকাতেও আতঙ্ক হচ্ছে। ওই ব্যাটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে ফাঁসটা আটকে দিয়েছিল আর ওর শয়তান মনিব নাইলনের শক্ত এই সুতোটার অন্য প্রান্ত থেকে ছিপে খ্যাঁচ মেরে মাছ বেঁধানোর মতো হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। মানুষ মারার বিদঘুটে ফন্দি বটে! এমনি করেই তাহলে বাবু বংকারামকে দম আটকে খুন করা হয়েছিল।

সুতোটা প্রায় দশ-বারো মিটার লম্বা। ল্যাসোর এক খুদে সংস্করণ আর কী! গুটিয়ে পকেটে রাখলুম, কর্নেলের জাদুঘরে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে উপহার দেব এটা। সঙ্গে একটা চিরকুটে লেখা থাকবে ঃ এই নিরীহ সুতোটি প্রখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীকে যমের বাড়ির দরজা অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "এই সেই ময়নাচোর স্কুইরেল মাংকি, ডার্লিং! হালদারমশাইয়ের সাধু, পাখি, আর বাঁদরের মধ্যে বাঁদরটা হাতে এল। বাকি রইল পাখি আর সাধু। একটুর জন্য সাধু ফসকে গেছে। তবে আশা করি, আবার তার দেখা আমরা শিগগির পাব। শুধু পাখিটার জন্য ভাবনা হচ্ছে।"

বললুম, "আমার আর এক সেকেন্ডও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না কর্নেল। তাছাড়া শ্বাসনলিতে ব্যথা করছে।"

কর্নেল বললেন, "ঠিক আছে। চলো, ফেরা যাক। পরে আবার এসে বাবু বংকারামের ডেরা খোঁজা যাবে।" তারপর খুদে প্রাণীটাকে জ্যাকেটের ভেতরকার পকেটে ঢুকিয়ে বোতাম আঁটলেন। বাঁদরটা নড়ল না একটুও।

গ্রামের রাস্তায় ফিরে যাবার সময় একটা ভিড় চোখে পড়ল। একটা কুঁড়েঘরের সামনে পুরুষ, স্ত্রীলোক, কাচ্চাবাচ্চা ভিড় করে কী যেন দেখছে। উঁকি মেরে দেখি, একটা কালো মরা পাখি পড়ে আছে মাটিতে। সেটাই সবাই ভিড় করে দেখছে। কর্নেলের দিকে তাকালুম। খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন গোয়েন্দাপ্রবর। একজনকে জিগ্যেস করলেন, "কী ব্যাপার, মরা পাখি দেখার জন্য এত ভিড় কেন?"

সে বলল, "সায়েব, এটা একটা ময়নাপাখি।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। পাখিটা মরল কী করে?"

একজন বুড়ো বল, "হুজুর, পাখিটা আমার নাতনি কুড়িয়ে পেয়েছে মাঠে। তখনও ধুঁকছিল। এনে মুখে জল দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করল। বাঁচল না। এ পাখিটা আমরা চিনতে পেরেছি। সেজন্য এই ভিড়।"

"পাখিটা কার?"

"বাবু গঙ্গারাম দাস বলে একটা লোক ছিল, এ তারই পাখি। পাখিটা ভালো বুলি বলতে পারত, হুজুর! ওড়িয়া, হিন্দি আবার ইংরেজিতেও নাকি বুলি বলত। বাবু গঙ্গারাম দাস ছিল লেখাপড়া জানা লোক। বড্ড খেয়ালি আর দিলদরিয়া ছিল তার মেজাজ। গরিব লোকদের প্রতি খুব দয়া ছিল তার।"

আমি চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল জিগ্যেস করলেন, "তিনি এখন কোথায় আছেন?"

বুড়ো বলল, "জানি না হুজুর! বাবু গঙ্গারাম থাকত বাবু বংকারামের বাড়িতে। শুনেছি ওরা নাকি ছিল মাসতুতো ভাই। বছর খানেক আগে বাবু বংকারাম জঙ্গলে ঝরনার ধারে খুন হয়েছে। বাবু গঙ্গারাম তারপর থেকে নিপাত্তা। পুলিশ তাকে আর গোপেশ্বর নামে একটা লোককে খুনি বলে সন্দেহ করেছিল বটে, কিন্তু আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না, অমন নিরীহ আর দয়ালু লোক গঙ্গারাম মানুষ খুন করতে পারে! খুনোখুনির কাজ গোপেশ্বর পারত বটে। সেও ছিল এক সাংঘাতিক ডাকাত। বাবু বংকারামের স্যাঙাত।"

কর্নেল পাখিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ পাখি যে বাবু গঙ্গারামের, তোমরা চিনলে কেমন করে?"

সবাই হইচই করে উঠল জবাব দেওয়ার জন্য। সবাইকে থামিয়ে বুড়ো বলল, "ওই যে দেখছেন পাখিটার একটা পায়ে রূপোর আংটা। বাবু গঙ্গারাম সবসময় পাখিটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ওই আংটার সঙ্গে ছিল সরু চেন। চেনটা থাকত বাবু গঙ্গারামের গলায় জড়ানো। মনে হচ্ছে, আংটা থেকে চেন ছিঁড়ে কীভাবে পাখিটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এতদিন।"

কর্নেল হাঁটু ভাঁজ করে ঝুঁকে পাখিটাকে ভালো করে দেখতে গেছেন, অমনি তাঁর জ্যাকেটের ভেতর থেকে দুটো বোতামের মাঝখান দিয়ে বজ্জাত খুদে বাঁদরটা সুড়ুত করে পিছলে পড়ল। তারপর লোকগুলোর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে চোখের

পলকে কুঁড়েঘরের চালে চড়ে বসল। এবার তাজ্জব হয়ে দেখলুম, বাঁদরটা মরা পাখিটাকে হাতিয়ে নিয়েছে।

সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। কর্নেলও হতভম্ব। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। আমিও তাই। তারপর লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "ভুণ্ডুরাম! ভুণ্ডুরাম!"

চ্যাঁচামেচিতে হয়তো ভয় পেয়েই বাঁদরটা পাখিটা নিয়ে এক লাফে কুঁড়েঘরের পেছনের দিকে উধাও হয়ে গেল। ওর গতি আর ভঙ্গি অবিকল কাঠবেড়ালির মতো। কর্নেল বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে বললেন, "পাকড়ো। পাকড়ো! বখশিশ মিলেগা!"

বখশিশের লোভে হইচই করতে-করতে অনেকে ছুটে গেল। বুড়ো কর্নেলকে আশ্বস্ত করে বলল, "চুপ করে বসে থাকুন হুজুর! খাটিয়া এনে দিচ্ছি। ভুণ্ডুরামকে ওরা এখুনি ধরে ফেলবে। ওটা তো একটা পোষা বাঁদর।"

সে ঘর থেকে দুটো খাটিয়া এনে দিল। আমরা বসলুম। তারপর কর্নেল জিগ্যেস করলেন, "বাঁদরটাও তোমাদের চেনা দেখছি!"

বুড়ো হাসতে-হাসতে বলল, "হুজুর কি ভুণ্ডুরামকে কিনে আনলেন ভগিয়ার কাছ থেকে?"

কর্নেল বললেন, "বাঁদরটা আমি ভগিয়ার কাছে কিনিনি। অন্য একজনের কাছে কিনেছি।"

বুড়ো অবাক হয়ে বলল, "সে কী! ভগিয়া ভুণ্ডুরামকে তাহলে বেচে দিয়েছিল! কার কাছে বলুন তো হুজুর?"

কর্নেল বললেন, "নাম জানি না। বাবু বংকারামের বাড়ির ওখানে একটা লোক—"

বুড়ো কথা কেড়ে বলল, "বুঝেছি। বেঁটেমতো, মাথায় টাক আছে তো? নব।"

"ভগিয়া কে?"

"নবর ভাই। ভগিয়া যে সারাদিন ভুণ্ডুরামকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তাই নব বলত বটে, বাঁদরটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসবে, নয়তো কাউকে বেচে দেবে।"

"ভগিয়া এমন জাতের বাঁদর পেল কোথায়?"

"জঙ্গল থেকে নাকি ধরে এনেছিল। খেলা শিখিয়েছিল। যা বলত, তাই শুনত ভুণ্ডুরাম।"

"ভগিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?"

"বলা কঠিন। শুনেছি, সে নাকি এক সাধুবাবার চেলা হয়েছে। কোথায়-কোথায় ঘোরে সাধুবাবার সঙ্গে।"

"এক সাধুবাবা নাকি অদৃশ্য হতে পারেন—তাঁরই চেলা হয়নি তো ভগিয়া?"

বুড়ো মুখ বেঁকিয়ে বলল, "সে সাধুবাবা স্বয়ং শিব। ভগিয়া তার চেলা হবে? তাহলে পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠবে না? হুজুর, ভগিয়ার সাধুবাবা আর কেমন হবে?

ভগিয়ার মতোই হবে। কেউ-কেউ বলে, সাধুটা নাকি গোপেশ্বর। পুলিশের ভয়ে সাধু সেজে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।"

লোকগুলো হইচই করে ফিরে এল। ফাঁসুড়ে ভুণ্ডুরামকে ধরে এনেছে ওরা। মরা পাখিটাকে এখনও বজ্জাতটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। কর্নেল বাঁদরটাকে আগের মতোই জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করলেন এবং একটা হাত চেপে রাখলেন, যাতে আর না পালাতে পারে। মরা পাখিটাকে আমি রুমালে জড়িয়ে নিলুম কর্নেলের আদেশে।

ওদের বখশিশ দিয়ে বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে কর্নেল হঠাৎ আমাকে চাপা গলায় ইংরেজিতে বললেন, "জয়ন্ত, দূরে একটা লোককে দৌড়ে আসতে দেখছি। মনে হচ্ছে, লোকটা ভগিয়ার দাদা নব। ওই দ্যাখো। সামনে বড় রাস্তার মোড়ে একটা অটোরিকশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৌড়নোর জন্য তৈরি হও। ওয়ান, টু, থ্রি— রান!"

পেছনের লোকগুলো নিশ্চয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে আছে। জীবনে এমন দৌড় কখনও দৌড়ইনি, কিংবা পঁয়ষট্টি বছরের খ্রিসমাস সান্টাক্লজ চেহারার এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককেও দৌড়তে দেখিনি।

অটো-রিকশোয় চেপেই কর্নেল বললেন, "ডবল ভাড়া সর্দারজি! তুরন্ত চলিয়ে, ইধার টাউনশিপ হোকে সিধা।"

ড্রাইভার কী বুঝল কে জানে, তখুনি স্টার্ট দিয়ে বাহনটাকে রকেটের বেগে ছুটিয়ে দিল পার্বতী নদীর ব্রিজের দিকে। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে সে মুচকি হেসে বলল, "ইধার গোপেশ্বর ডাকু রহতা হ্যায়! কভি ইধার মাত আইয়ে জি।"

প্রদীপবাবুর বাংলোবাড়িতে পৌঁছে দেখি, সবে ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়ক ভুবনেশ্বর থেকে নিজেই জিপ চালিয়ে হাজির। কর্নেল পকেট থেকে ভুণ্ডুরামকে বের করলে উনি চমকে গিয়ে বললেন, "স্কুইরেল মাংকি মনে হচ্ছে? কোথায় পেলেন?"

কর্নেল হালদারমশাইয়ের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করলেন। কথা শেষ হলে পট্টনায়ক বললেন, "কী আশ্চর্য! কাল দুপুরে কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবরেটরি হলে যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন যদি গঙ্গারামের ব্যাপারটাও বলতেন, তখনই সব জানিয়ে দিতুম আপনাকে।"

কর্নেল বললেন, "চেনেন নাকি গঙ্গারামকে?"

"ভীষণ চিনি," ডঃ পট্টানায়ক উত্তেজিতভাবে বললেন। "ভদ্রলোক ছিলেন বাঙ্গালোর স্পেস রিসার্চ সেন্টারের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী। খুব খেয়ালি স্বভাবের মানুষ। হঠাৎ চাকরি ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে যান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওল্ড কোদণ্ডগিরিতে বাবু বংকারামের বাড়িতে এসে জুটেছিলেন।"

"বাবু বংকারামের নাকি মাসতুতো ভাই উনি।"

"হতে পারে," ডঃ পট্টনায়ক বললেন। "কেন এখানে এসেছিলেন, তাও আঁচ করতে পারছি। জঙ্গলের ভেতর কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে নিশ্চয় গোপনে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা করছিলেন। একটু আগে মিঃ রায়ের কাছে যা শুনলুম তাতে ওঁর সাফল্যের প্রমাণও পেয়েছি। এমন একটা রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি।

"হ্যাঁ। রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা সত্যি বিস্ময়কর।"

কিন্তু এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা দরকার। এত টাকা কোথায় পেলেন জি. আর. ডি.?" ডঃ পট্টনায়ক একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁ,—ডঃ গঙ্গারাম দাস জি. আর. ডি. নামেই বিজ্ঞানীমহলে পরিচিত ছিলেন।"

কর্নেল বাঁদরটার পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, "তাহলে কি বাবু বংকারামকে ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করার জন্য উনিই প্ররোচিত করেছিলেন? হয়তো বাবু বংকারামকে কোনও লোভ দেখিয়েছিলেন।"

প্রদীপবাবু এসে বললেন, "লাঞ্চ রেডি। দেড়টা বাজতে চলল। এবার দয়া করে উঠে পড়ুন।"

॥ ছয় ॥

খাওয়াদাওয়ার পর মরা ময়নাপাখিটা নিয়ে কর্নেল এবং ডঃ পট্টনায়ক কী সব পরীক্ষায় বসলেন। ডঃ পট্টনায়কের সঙ্গে সবসময় একটা খুদে পোর্টেবল ল্যাবরেটরি থাকে। দেখতে সেটা একটা প্রকাণ্ড সুটকেসের মতো। টেবিলে সেটা খুলে বসেছেন।

ফাঁসুড়ে ভুণ্ডুরাম এখন প্রদীপবাবুর জিম্মায়। ওকে বন্য প্রাণী গবেষণাগারের হেফাজতে দেওয়া হবে। রাত জেগে ট্রেন জার্নি, তার ওপর যমের দুয়ার থেকে ফেরার ধাক্কায় আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। শ্বাসনলির ব্যথাটা গরম জলের গার্গলে অনেকটা কমেছে। সবে চোখ বুজে আসছে ভাতঘুমে, এমন সময় কর্নেল এবং ডঃ পট্টনায়কের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। কর্নেল বললেন, "কী আশ্চর্য! এ যে দেখছি একটা নকশা!"

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, "হ্যাঁ,—ব্লুপ্রিন্ট বলতে পারেন। নিশ্চয় গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট। তা না হলে পাখির পায়ে রূপোর আংটার মধ্যে রোল করে লুকিয়ে রাখা হবে কেন? এটা কিন্তু সাধারণ কাগজ নয়। গুপ্তচররা ব্যবহার করে এগুলো। এক বর্গফুট কাগজও রোল করে নখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। এবার বোঝা গেল, পাখিটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ফাঁদে আটকে আদিবাসী ছেলেরা ওকে ধরে। হালদারমশাই কিনে নিয়ে যান। তাঁর বাড়ি থেকে পাখিটা উদ্ধার করে আনার সময় আবার হাত ফসকে পালিয়েছিল। পালাতে গিয়ে বিদ্যুতের শক খেয়ে শেষে মারা পড়ে।"

কর্নেল বললেন, "মাঠে পড়েছিল নাকি পাখিটা। ওখানে বিদ্যুতের তার গেছে দেখছি।"

"ডি সি বিদ্যুতের শকে ছিটকে পড়াই সম্ভব। এ সি হলে তারে আটকে থাকত।"

"বুঝেছি। হালদারমশাইয়ের সঙ্গে সাধু আর তার চেলা যখন ধস্তাধস্তি করছিল, তখনই পাখিটা পালিয়ে থাকবে।"

"হালদারমশাইয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি?" কর্নেল হাসলেন। "বেনামি চিঠিতে বলা হয়েছে, ওঁকে ওরা আটকে রেখেছে। তার মানে ধস্তাধস্তিটা খুব সাংঘাতিকই হয়েছে। হালদারমশাই তো সহজে বন্দি হবার পাত্র নন। ওঁকে কায়দা করতে হাত ফসকে পাখির পালানো স্বাভাবিকই।"

ডঃ পট্টনায়ক আবার নকশাটার ওপর আতশকাচ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, "কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে, এটা কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে জি. আর. ডি.-র ল্যাবরেটরি এবং স্পেস রিসার্চ সেন্টারের ব্লুপ্রিন্ট। ওই গোপন জায়গায় যাবার হদিশও এতে আছে যেন। এই চিরুনির মতো চিহ্নটা দেখুন। এটা সম্ভবত ঝরনা। আর তার উলটোদিকে এই লাল ফুটকিটা কি সেই লাল রঙের প্রকাণ্ড পাথরটাই—যেটা আমি দেখে গিয়েছিলুম জানুয়ারিতে এসে?"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। আড়াইটে বাজতে চলল। দিনের আলো থাকতে-থাকতে বেরিয়ে পড়াই ভালো। জয়ন্ত, তুমি যাবে নাকি?"

তড়াক করে উঠে বসলুম। বললুম, "যাব না মানে? দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার লক্ষ-লক্ষ পাঠক হা-পিত্যেশ করে বসে আছে না?"

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, "হাঁটা-পথেই যাব। অবশ্য পথ বলা ভুল। জানুয়ারিতে এসে কোদণ্ডগিরি পৌঁছতে খুব হন্যে হয়েছিলুম। একবার হাতির পালের সামনে, আর একবার চিতাবাঘের সামনেও পড়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের এক বিশেষজ্ঞ। তিনি তো আতঙ্কে মারা পড়ার দাখিল।"

প্রদীপবাবু এসে ওঁর কথা কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন, "জানুয়ারিতে এসেছিলেন আপনারা? জঙ্গলে বেড়াতে নাকি?"

"না মিঃ রায়। নিছক বেড়াতে এলে তো আপনি জানতে পারতেন। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না। আমরা এসেছিলুম একটা সরকারি তদন্তে। কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে নাকি অদ্ভুত সব আলো দেখা যায়। আগুনের গোলাও দেখা যায়। আমার ধারণা ছিল, ওখানে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস আছে ভূগর্ভে। কিন্তু এসে কিছুই হদিশ করতে পারিনি। আর পাহাড়টায় চড়াও একেবারে অসম্ভব। পুরোটা গ্রানাইট শিলায় তৈরি। যাই হোক, ফেরার পথে পার্বতী নদীর ধারে বালির চড়ায় ওই রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।"

প্রদীপবাবু বললেন, "আগুনের গোলার কথা আমিও শুনেছিলুম।"

কর্নেল বললেন, "আজ সকালে দেখতেও পেলেন।"

প্রদীপবাবু চমকে উঠে বললেন, "কিন্তু ওটা তো আগুনের গোলা নয়। ছাই-রঙের একটা গোলক।"

"রাতে ওটা থেকে রশ্মি ঠিকরে পড়ে। তাছাড়া মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ রাতের আকাশে আগুনের গোলার মতো দেখাতে পারে।"

প্রদীপবাবুও আমাদের সঙ্গ ধরলেন। এতে খুশিই হলেন কর্নেল এবং ডঃ পট্টনায়ক। প্রদীপবাবু কোদণ্ডগিরি জঙ্গলের নাড়িনক্ষত্র জানেন। রাস্তা ভুল হবার চান্স থাকবে না।

পাহাড়ি জঙ্গলের সৌন্দর্য তুলনাহীন। তাছাড়া এখন বসন্তকাল। কত রকম ফুল ফুটেছে চারদিকে। মিঠে গন্ধে মউ-মউ করছে বনপথ। পাখ-পাখালি গান ধরেছে মনের সুখে। কিন্তু এসব দিকে আমাদের কারুর মন নেই। প্রদীপবাবু সতর্কতার জন্য একটা শটগান হাতে নিয়েছেন। বুনো জন্তুর পাল্লায় পড়লে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যই। এ জঙ্গলে পশুপাখি হত্যা নিষিদ্ধ।

একবার হাতির চিৎকার কানে এল। প্রদীপবাবু বললেন, "পার্বতী নদীতে দিনের শেষে খেলতে নেমেছে হাতির পাল। বাতাস ওদিক থেকে বইছে। কাজেই আমাদের গন্ধ পাবে না ওরা।"একখানে টিলার ওপর মহুয়া গাছে ভালুক দেখিয়ে দিলেন। বহু দূরে একবার যেন বাঘের গর্জনও শুনলুম।

পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব পেরুতে ঘণ্টা-দেড়েক লেগে গেল। এর কারণ রাস্তা বেশ দুর্গমই। চড়াই উতরাই বিস্তর। ঝরনা এড়িয়ে আমরা কোদণ্ডগিরির পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাহাড়টা অন্তত হাজার-দশেক ফুট উঁচু। দূর থেকে শর লাগানো ধনুক বা পিরামিডের মতো মনে হয় বটে, কাছ থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু মিনারের মতো খাড়া ছুঁচালো চূড়াটা চোখে পড়ছিল। পাহাড়ের নিচে বিশাল-বিশাল পাথর পড়ে আছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে পাথর আর ঝোপ। তারপর উঁচু গাছের জঙ্গল। তাই এখানে বিকেলের গোলাপি রোদ ছড়িয়ে আছে।

কর্নেল ও ডঃ পট্টনায়ক সেই নকশা আঁকা চিরকুট খুলে পরামর্শ করছিলেন। হঠাৎ কর্নেল বললেন, "লাল ফুটকি? হুঁ, দেখুন তো ডঃ পট্টনায়ক! ওই লাল পাথরটাই তো?"

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, "হ্যাঁ,—ওটাই। চলুন, দেখা যাক।"

কর্নেল বললেন, "সাবধান! সবাই গুঁড়ি মেরে পাথরের আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে চলুন।"

লাল পাথরটার কাছে পৌঁছে আবার দুজনে নকশা দেখে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় পরামর্শ করলেন। তারপর কর্নেল বললেন, "সবাই হাত লাগান। দেখা যাক, পাথরটা সরানো যায় নাকি।"

লালপাথরটা কিন্তু তত ওজনদার নয়। একটু ঠেলতেই সরে গেল। যত সরল ওটা, তত নিচের দিকে একা গর্ত দেখা যেতে থাকল। কর্নেল বললেন, "এই তো দেখছি সুড়ঙ্গের মুখ। একে-একে নামা যাক। টর্চ জ্বালতে হবে মনে হচ্ছে।"

প্রথমে কর্নেল, তারপর ডঃ পট্টনায়ক, তারপর আমি, শেষে প্রদীপবাবু গর্তে নামলুম। ধাপে-ধাপে সিঁড়ি একটু নেমে যাওয়ার পর ওপরের দিকে উঠে গেছে। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ টের পাচ্ছি। টর্চের আলোয় কালো পাথরের ধাপ ক্রমশ উঠছে তো উঠছেই। আমরাও উঠছি। অনেকখানি ওঠার পর কিছুটা করিডোরের মতো সমতল জায়গা। অবাক হয়ে লক্ষ করলুম, সামনে আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে। কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার পা বাড়ালেন। করিডোরের মতো জায়গাটা প্রায় দু'মিটার চওড়া। আলোটা আসছে বাঁদিক থেকে। করিডোর বেঁকে গিয়ে আবার সিঁড়ির মুখে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির মাথায় হলুদ একবিন্দু আলো। ঠিক আলো নয়। অদ্ভুত একটা রশ্মি যেন। কর্নেল ধাপে পা রেখেছেন, অমনি গমগমে গলায় কেউ বলে উঠল, "সাবধান গোপেশ্বর! আর এক পা এগোবার চেষ্টা করো না। বুঝতে পেরেছি, তুমি এতদিনে আমার ল্যাবরেটরিতে ঢোকার নকশা পেয়েছ। আমার দুর্ভাগ্য গোপেশ্বর, পাখিটা শয়তান বংকারাম চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল। তাছাড়া আমার আর. সি. এস. যন্ত্রটাও চুরি করেছিল ডাকাত হতচ্ছাড়া। ওকে খুন করে তুমি সব হাতিয়েছ আমি জানতুম। কাল দুপুরে এবং আজ সকালে আমার স্পেসশিপ দু-দুরবা ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি জানি, তুমি আর. সি. এস. তো হাতিয়েছ। উপরন্তু ওটা ব্যবহার করার কৌশলও জেনে গেছ। শোনো গোপেশ্বর, আমি তোমাকে ঢুকতে দেব একটা শর্তে।"

কর্নেল বলে উঠলেন, "বলো গঙ্গারাম!"

"তোমার বাঁদিকে একটা ঘুলঘুলি দেখতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"নকশা আর আর. সি. এস. যন্ত্রটা ওখান দিয়ে ঢুকিয়ে দাও।"

"তাহলে ঢুকতে দেবে তো গঙ্গারাম?"

"দেব।"

দেখলুম ডঃ পট্টানায়ক কর্নেলকে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না ওঁকে। নকশা আর সেই রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র ঘুলঘুলির ভেতর ফেলে দিলেন। অমনি হা-হা হাসির শব্দ এসে আমাদের কানে ধাক্কা দিল। হলদে আলোর ফুটকিটা নিতে গেল। নেপথ্য থেকে নিষ্ঠুর কথা গম-গম করে ভেসে এল, "গোপেশ্বর, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।"

কর্নেল চিৎকার করে বললেন, "ডঃ দাস, আমি গোপেশ্বর নই। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার! আমার সঙ্গে আছেন আপনার পুরনো বন্ধু ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়ক, সাংবাদিক

জয়ন্ত চৌধুরী এবং এই জঙ্গলের কনজারভেটর প্রদীপ রায়। আপনি আগে দেখুন, আমরা কারা। তারপর শাস্তি দেবেন।"

ডঃ পট্টনায়কও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "জি. আর. ডি.! আমি পট্টনায়ক।"

অন্তত এক মিনিট পরে কথা ভেসে এল, "গোপেশ্বর কোথায়?"

"আমরা জানি না ডঃ দাস," কর্নেল বললেন। "দয়া করে আমাদের ঢুকতে দিন। সব বলব।"

"আপনারা আসুন।"

আবার হলুদ আলোর ফুটকি দেখতে পেলুম। সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠতে থাকলুম। শেষ ধাপের পর আবার একটা করিডোর। বাঁ দিকে একটা কালো দরজা খুলে গেল। একে-একে ভেতরে ঢুকলুম। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশাল এক ল্যাবরেটরি। একপাশে রকেটের মতো দেখতে একটা প্রকাণ্ড সাদা চোঙা ছাদ ফুঁড়ে চলে গেছে। সেখানে রেলিং ঘেরা। অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে নানারকম। শোঁ-শোঁ...ব্লপ্‌ব্লিপ্‌...কিটকিট...বিচিত্র সব শব্দ। কিন্তু কোনও লোক দেখতে পাচ্ছি না।

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, "জি. আর. ডি., কোথায় তুমি?"

অমনি সামনে একটু তাকাতে চোখ-ধাঁধানো নীল আলো খেলে গেল এক সেকেন্ডের জন্য। তারপর দেখি, সেখানে লম্বা রোগা ফর্সা, একমাথা সাদা চুল, গেরুয়া আলখাল্লার মতো পোশাক পরা এক সৌম্য চেহারার প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। "কী পট্টনায়ক, অলৌকিক কীর্তি ভাবছ নাকি? তোমাকে বলেছিলুম পট্টনায়ক, যে-কোনও পদার্থকে ভরহীন ফোটনে পরিণত করা যায় এবং তা চর্মচক্ষে অদৃশ্য মনে হবে। তুমি বলেছিলে, ফোটনে পরিণত হলে তা আলোর সমান গতিবেগ পাবে এবং তাই বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক, ঠিক। কিন্তু লেসার রশ্মি দিয়ে ফ্রেমের মতো ঘিরে রাখতে পারলে তা ছড়াবে না এবং ফোটনগুলোকে আবার আগের মতো ভরযুক্ত পদার্থ-কণিকায় রূপান্তরিত করা যাবে। এখন স্বচক্ষে দেখলে তো পট্টনায়ক, সেই অসম্ভব আমি সম্ভব করেছি?"

"দেখলুম ভাই! তোমার কোনও তুলনা হয় না।"

বিজ্ঞানী গঙ্গারাম দাস কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একসময় খবরের কাগজ পড়তুম। তখন আপনার অনেক কীর্তিকলাপ কাগজে পড়েছি। বসুন, বসুন। আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি।"

আমরা বসলুম। ডঃ দাস বিশাল টেবিলের ওধারে বসলেন। তারপর বোতাম টিপলেন। তখুনি খটখট শব্দে একটা ছোট্ট মানুষের গড়নের রোবট এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ডঃ দাস বললেন, "চা, কফি, কোল্ড ড্রিংক্স—যা খেতে যান, সেই বোতাম টিপুন। পেয়ে যাবেন।"

কর্নেল কফির বোতাম টিপলেন। খট করে একটা কাগুজে পেয়ালা পড়ল রোবটের পেটের নিচের খোঁদলে। তারপর গড়গড় করে কফি বেরিয়ে পেয়ালা ভর্তি হয়ে গেল।

আমরা সবাই কফিই নিলুম। তারপর রোবটটা চলে গেল। ডঃ পট্টনায়ক বললেন, "পাহাড় কেটে এই ল্যাবরেটরি বানিয়েছ দেখে অবাক লাগছে জি. আর. ডি.! এ যে দৈত্যের কীর্তি! কী করে বানালে?"

জি. আর. ডি. বললেন, "আমি তো বানাইনি, ভাই। এটা বংকারামের পূর্বপুরুষের তৈরি গোপন দুর্গ। এটার জন্যই ওর সঙ্গে ভাব করেছিলুম। ওকে মিথ্যা লোভ দেখিয়েছিলুম, দুর্গের ভেতর ওর পূর্বপুরুষের গুপ্তধন আছে। উদ্ধার করে দেব। কিন্তু ও চিরকালের বজ্জাত। যখন বুঝল আমি ল্যাবরেটরি বানাচ্ছি, তখন থেকে বদমায়েশি শুরু করল। গোপেশ্বর নামে ওর এক ডাকাত-স্যাঙাত আছে। তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করল শয়তানটা। যাকগে, গোপেশ্বর ওকে খুন করেছে। তবু আর. সি. এস. এবং নকশাটা হাতাতে পারেনি।"

কর্নেল সংক্ষেপে আগাগোড়া সব ঘটনা বললেন। ডঃ পট্টনায়ক আর. সি. এস. যন্ত্রটা কোথায় পেয়েছিলেন, তাও বললেন। ডঃ, দাস খুব হাসতে লাগলেন শুনে। শেষে গম্ভীর হয়ে বললেন, "কিন্তু মিঃ রায়ের মামা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। গোপেশ্বর ডাকু সাংঘাতিক লোক। ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, ঝরনার ধারে রাত দশটায় ব্যাটা আসবে বলেছে তো? তখনই আমি ওকে ধরতে রোবট পাঠিয়ে দেব। রোবটের টিপুনি খেয়ে সে কবুল করবে মিঃ হালদারকে কোথায় আটকে রেখেছে। তারপর ব্যাটাকে পুলিশের কাছে জিম্মা দেবেন মিঃ রায়।"

কর্নেল বললেন, "একটা কথা ডঃ দাস। পাখিটাকে অমন কথা কেন শিখিয়েছিলেন?"

বিজ্ঞানী মুচকি হেসে বললেন, "বংকারাম যদি আমাকে সত্যি খুন করে, তাহলে অন্তত পাখিটা সাক্ষী দিতে পারবে, এই ভেবেই। ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে।"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এবং ল্যাবরেটরি দেখে আমরা বিদায় নিলুম। এবার আমাদের উলটো দিকে ঝরনার ধারের গোপন দরজা খুলে বের করে দিলেন ডঃ দাস। তারপর আমাকে চমকে দেবার জন্য আবার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, বুঝলুম হালদারমশাই তাহলে ঠিকই দেখেছিলেন।

বাংলোয় ফিরে আমরা আবার অবাক। হালদারমশাই জলজ্যান্ত বসে রয়েছেন। শুধু মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। বললেন, "আমার নাম কে. কে. হালদার। আমাকে আটকে রাখবে ওই পুঁচকে দুটো লোক? রেলইয়ার্ডে সাধু আর তার

চেলাকে ফলো করছিলুম। হঠাৎ ওরা মালগাড়ির আড়ালে লুকিয়ে গেল। আসলে ওত পেতে বসেছিল, বুঝলেন? যেই গেছি, লাফিয়ে পড়েছে। শেষে মাথায় ডাণ্ডার বাড়ি। জ্ঞান হলে দেখি, মালগাড়ির ওয়াগনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। গায়ে জোর আসতে দেরি হচ্ছিল, তাই। নইলে কখন বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসতুম। যাক গে, এবার আপনাদের খবর বলুন, কর্নেল স্যার?" হালদারমশাই মাথার ব্যান্ডেজে হাত বুলোতে থাকলেন।

কর্নেল বললেন, "আপাতত খবর হল, আজ রাত দশটায় আপনার সেই সাধু ওরফে গোপেশ্বর আর তার চেলা ভগিয়া ঝরনার ধারে রোবটের হাতে বন্দি হবে।"

হালদারমশাই বললেন, "রোবট? যাঃ!" খি-খি করে বেজায় হাসতে লাগলেন গোয়েন্দা কৃতান্ত হালদার।

কালো গোখরো

ঘাসের ভেতর থেকে আচমকা একটা গোখরো সাপ ফোঁস করে ফণা তুলল। অমনি এক লাফে পিছিয়ে এল শানু। পাড়াগাঁয়ের ছেলে। সাপ কখনও দ্যাখেনি তা নয়। কিন্তু এমন করে বিষাক্ত সাপের মুখোমুখি কখনও হয়নি। তাছাড়া নদীর ধারে এই জঙ্গুলে নিরিবিলি জায়গায় সে প্রায় রোজই আসে। এই খোলামেলা ঘাসের জমি পেরিয়ে নবাবি আমলের পোড়ো-মসজিদটার উঁচু চত্বরে যায়। সেখানে বসে স্কুলের বই পড়ে। সামনে পরীক্ষা। এদিকে বাড়িতে বড্ড বেশি হইচই।

কিন্তু এখানে একটা গোখরো সাপ থাকতে পারে, সে-কথা শানুর মাথায় আসেনি। আর সাপটাও কী প্রকাণ্ড! রোদ্দুরে ঝলমল করছে তার বিশাল চক্কর। লক-লক করছে সরু জিভ। নিষ্পলক নীল চোখে সে শানুকেই দেখছে যেন।

তারপরই তেমনি আচমকা কোত্থেকে এক-টুকরো ইট এসে পড়ল ফণা-তোলা সাপটার মাথায়। সঙ্গে-সঙ্গে নেতিয়ে পড়ল সেটা। লেজটা ঘাসের ভেতর প্রচণ্ড নড়তে থাকল।

শানু অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। তারপর আবার একটুকরো ইট এসে পড়ল সাপটার ওপর। ছটফটানি থেমে গেল ক্রমশ। তখন শানু দেখল, ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, আর কেউ না, স্বয়ং আবদুলচাচা, নবাবগঞ্জ গ্রামের লোকে যাকে বলে আবদুলখ্যাপা।

শানুর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটল। বলল, ''আবদুলচাচা!'

একটু খ্যাপাটে চালচলনের জন্য গাঁয়ের লোকে তাকে আবদুলখ্যাপা বলে বটে কিন্তু সবাই যেমন জানে, তেমনি শানুও জানে, লোকটা সত্যি-সত্যি খ্যাপামানুষ নয়। আসলে সে বড় খামখেয়ালি। এ গাঁয়ে তার ঘরদোর বলতে কিছু নেই। কখনও কোথাও ছিল কিনা সেটাই বিশ্বাস হয় না লোকের। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ফাইফরমাশ খেটে বেড়ায়। পয়সাকড়ি পায়-টায় না। শুধু দুমুঠো খেতে পেলেই সে খুশি। যেখানে-সেখানে সে খুঁজে নেয় রাত কাটানোর ডেরা। শানু জানে, ইদানিং সে গাঁয়ের বাইরে নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতর পোড়ো-মসজিদটাকেই ডেরা করে ফেলেছে। এখানে নির্জনে পড়াশুনো করতে এসেই শানুর সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। শানু তাকে চাচা বলে ডাকে। শানু যতক্ষণ পড়াশুনো করে আবদুল থাকলে তাকে এতটুকুও বিরক্ত করে না। কিন্তু পড়া শেষ হলে শানু 'আবদুলচাচা' বলে ডাকলেই সে হাসিমুখে বেরিয়ে আসে মসজিদ থেকে। শানুর পাশে বসে পড়ে। তারপর সে তার গল্পের ঝুলি খোলে। কত অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্পই না জানে আবদুল! শানু অবাক হয়ে শোনে। কতদিন তার সাধ জাগে, এই নিঝুম পুরনো নবাবি মসজিদে আবদুলচাচার সঙ্গে সে রাত কাটাবে, আর দেখতে পাবে জ্যোৎস্না-রাতে ছায়ামূর্তিগুলো এসে সার বেঁধে নমাজ পড়ছে। তাদের মধ্যে আছেন ইতিহাসের বইতে পড়া সেই সব সুলতান, উজির, আমির-ওমরার আত্মারা! ভাবতেই শানুর গা শিউরে ওঠে।

আবদুলের পরনে খাটো ছেঁড়াখোঁড়া একটা নীলচে লুঙ্গি। খালি গা। তার মুখে

খোঁচা-খোঁচা একরাশ গোঁফদাড়ি। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। মুখে হাসিটি সবসময় লেগেই আছে। শুধু তার বড়-বড় চোখদুটি কেমন যেন রহস্যময় মনে হয় শানুর। তবে আবদুলের শরীরখানি বেশ তাগড়াই। জোরও কম নেই। একসময় শানুদের জমিতেও সে মজুর খেটেছে।

শানু তার বাবার কাছে শুনেছে, শানুর তখন তিন বছর বয়স, সে ছিল এক ভয়ঙ্কর বন্যার বছর। নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ উলুকাশের জঙ্গল বন্যার জলে সেবার অথৈ সাগর হয়ে উঠেছিল। সেখানে একটা হিজল-গাছের ডগা থেকে চিৎকার শুনে রিলিফের নৌকোর লোকেরা গিয়ে দ্যাখে, একটা লোক গাছের ডালে বসে আছে। তারা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। সেই এই আবদুল। তারপর থেকে সে এই নবাবগঞ্জেই থেকে গেল।...

শানু অবাক হয়ে দেখছিল, আবদুল মরা সাপটির লেজ ধরে মাথার ওপর চরকির মতো বারকতক পাক খাইয়ে ছুঁড়ে ফেলল ঝোপের ওদিকে। তারপর হাসিমুখে শানুর সামনে দাঁড়াল। বলল, 'ভয় পেয়েছিলে, মালিক? হুঁ, গোখরো বলে কথা! তবে কিনা, মানুষের মধ্যেও কিছু-কিছু গোখরো আছে।'

শানু চমকে উঠে বলল, 'কেন ও কথা বলছ আবদুলচাচা?'

আবদুল সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। বলল, 'যাও, যাও। লেখাপড়া করো গে। আমি ততক্ষণ নদীর ওপারটা ঘুরে আসি।'

শানু এবার ঘাসের ভেতর সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাঁটতে থাকল। আবদুল ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে চলে গেল। গম্বুজওয়ালা মসজিদটির দশা জীর্ণ। এদিকে-সেদিকে কিছু-কিছু ধ্বংসস্তূপ আছে। সেগুলিতে জঙ্গল গজিয়েছে। বোঝা যায়, প্রাচীন সময়ে এখানেই বসতি ছিল। কিংবদন্তি আছে, এখানে নাকি ছিল কোনও এক সুলতানের রাজধানী। এখনও জঙ্গল আর চাষের জমিতে কিছু চিহ্ন চোখে পড়ে। এক-টুকরো কারুকার্য করা পাথর, কিংবা একটা স্তূপ। কোথাও বা একটা শ্যাওলা-ধরা ফটকের একাংশ।...

পোড়ো-মসজিদের উঁচু চত্বরটি পাথরের। কোথাও-কোথাও ফাটল ধরেছে। গজিয়ে উঠেছে কোনও উদ্ভিদ। ভেতরে রাজ্যের চামচিকের আস্তানা। একদিন একটা শেয়ালকেও বেরিয়ে আসতে দেখেছিল শানু। শেয়ালটা যেন ভারি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। যেন মনে-মনে বলছিল, 'এ ছেলেটা আবার কে রে বাবা— এখানে পড়াশুনো করতে আসে?' শানু সেই ভেবেই শেয়ালটাকে দেখে হেসে ফেলেছিল। অমনি শেয়ালটা একলাফে চত্বর থেকে নেমে উধাও।

একসময় নাকি এইসব জঙ্গলে বাঘও থাকত। শানুর ঠাকমা বলেন, কত রাতে বাঘের ডাকও নাকি শুনেছেন। শানুর বাবা বলেন, 'ওই পোড়ো-মসজিদের ভেতরই তো বাঘের ডেরা ছিল। ওখানেই তো শেষ বাঘটাকে গুলি করে মেরেছিলেন মির্জাসায়েব। মির্জাসাহেব তখন এ জেলার নামকরা শিকারি।'

এ সব গল্প শোনার পর শানু বড্ড ভয় পেত এখানে আসতে। একটু শব্দ হলেই চমকে উঠত, এই বুঝি বাঘ এসে হালুম করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু আবদুলকে এখানে দেখার পর থেকে তার সে-ভয় ঘুচে যায়।

তবে আবদুলের মুখে এই পোড়ো-মসজিদের ভূত-পেরেতের গল্প শোনার পর থেকে তার গা ছম-ছম করেও বটে! তাছাড়া শুধু কী ভূত-পেরেত? আকাশ থেকে নাকি জিন-পরিরাও এখানে আসে। কিন্তু আবদুল এও বলেছে, 'সে তো সবই রাতের বেলায়। দিন-দুপুরে মানুষের কাছে ঘেঁসে, এমন সাধ্যি ওদের নেই। ভূত-পেরেত বলো, জিন-পরি বলো, সব্বাই মানুষকে বড় ভয় পায়। এ দুনিয়ায় মানুষের চেয়ে ভয়ানক জীব আর কিছু নেই রে সোনা।'

চত্বরে বসে শানু আজ আনমনা। মাঝে-মাঝে আবদুলচাচা কতরকম অদ্ভুত কথা বলে বটে; কিন্তু 'মানুষ' কথাটা কেন অমন করে বলে সে? আবদুলের কথাটা তার মনে প্রতিধ্বনি তুলছিল, 'মানুষের মধ্যেও কিছু-কিছু গোখরা আছে!'

আজ ছুটির দিনের দুপুরবেলা। সবে শীত পড়েছে। শেষ হেমন্তের রোদ্দুর এখনও ঝকমকে। তবে গাছপালা, ঝোপঝাড় আর ঘাসের সেই গাঢ় সবুজ রঙের চেকনাই ভাবটি ক্ষয়ে গেছে। চত্বরে বসে শানু দেখতে পাচ্ছিল, নদীর ওপারে সাদা ফুলে-ভরা কাশবনের ভেতর একা হেঁটে চলেছে আবদুলচাচা। কিন্তু কোথায় চলেছে সে?

গোখরো সাপ দেখার পর থেকে আজ কিছুতেই পড়ায় মন বসছিল না শানুর। মাঝে-মাঝে মুখ তুলে এদিক-ওদিক দেখে নিচ্ছিল। তার ভয় হচ্ছিল, আবদুলচাচা তো মরা ভেবে গোখরো সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলল। সেটা যদি সত্যি না মারা পড়ে থাকে? গাঁয়ের লোকে বিষাক্ত সাপ মেরে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। তাদের বিশ্বাস, তা না করলে সাপটা আবার বেঁচে উঠবে এবং যে তাকে মেরেছে তাকে ছোবল মারার জন্য ওত পেতে বেড়াবে। বেড়ালের নাকি ন'টা প্রাণ। আর সাপের নাকি একশ নটা!

কিন্তু আবদুল এমন উদ্ভুট্টে লোক যে, সে-কথা বিশ্বাসই করে না দেখা যাচ্ছে।

শানুর ভয় হচ্ছিল, সাপটা হয়তো বেঁচে উঠেছে এতক্ষণে এবং আবদুলের সঙ্গে তাকেও দোষী সাব্যস্ত করেছে। কারণ, আবদুল তো আসলে শানুকে বাঁচানোর জন্যই সাপটার মাথায় ইট ছুড়ে মেরেছিল।

শানু এই ভেবে ঘাসজমিটার দিকে তাকাচ্ছে, কখনও নদীর ওপর কাশবনের ভেতর আবদুলকে লক্ষ করছে, এমন সময় টুপ করে একটুকরো ঢিল এসে পড়ল চত্বরে। অমনি শানু আঁতকে উঠল। তত ভিতু ছেলে সে নয়। কিন্তু এখন সে অবস্থাটাই অন্যরকম। টুপ-টুপ করে আবার কয়েকটা ঢিল এসে পড়তেই শানু বই গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অমনি মসজিদের ওপাশ থেকে হি-হি হাসি শোনা গেল। তারপর শানু দেখল, ভূত-টুত নয়, মির্জাবাড়ির ছেলে, শানুরই সহপাঠী ও বন্ধু সেলিম হাসতে-হাসতে এগিয়ে আসছে।

সেলিম চোখ নাচিয়ে বলল, 'কী রে? খুব যে বড়াই করিস, ভূতের ভয় নাকি তোর নেই?'

শানু অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'ভ্যাট্! আমি কি ভয় পেয়েছিলাম নাকি?'

সেলিম ভেংচি কেটে বলল, 'না! তাইতো বই গুটিয়ে শ্রীমান ফার্স্টবয় উঠে দাঁড়িয়েছিল? হাতে আমার ক্যামেরাটা থাকলে তোর পোজখানা তুলে রাখতাম, আর ক্লাসসুদ্ধু সবাইকে দেখাতাম!'

শানু হার মেনে বলল, 'হঠাৎ অমন করে এমন জায়গায় ঢিল পড়লে তুই কেন, আবদুলচাচাও আঁতকে উঠত।'

সেলিম হঠাৎ শানুর হাত ধরে বলল, 'শানু! দ্যাখ, দ্যাখ! আবদুলচাচা দৌড়ে আসছে কেন?'

নদীর ওপারে আবদুলকে দৌড়ে আসতে দেখে শানুর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। তা হলে কী সত্যিই মরা গোখরোটা জ্যান্ত হয়ে ওকে তাড়া করে গেছে এবং ছোবল দিয়েছে? শানু ঝটপট সেলিমকে একটু-আগের ঘটনাটা শুনিয়ে দিল। ততক্ষণে আবদুল এসে নদীতে নেমেছে।

নদীটা ছোট্ট। হেমন্তের শেষে তার বুকে এখন হাঁটুজল। এখানে-সেখানে বালির চড়া জমেছে। আবদুল জল ভেঙে এপারে পৌঁছল। তারপর একটা হাত কপালে রেখে সূর্যকে আড়াল করে পুবের ওই কাশবনে যেন কী দেখতে থাকল।

তখন উদ্বিগ্ন শানু চেঁচিয়ে তাকে ডাকল, 'আবদুলচাচা, আবদুলচাচা! কী হয়েছে?'

শানুর ডাক শুনে আবদুল এদিকে ঘুরল। কিন্তু তার মুখে হাসি দেখা গেল। সে লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে এক লাফে পোড়ো-মসজিদের চত্বরে উঠল। তারপর সেলিমকে দেখে বলল, 'তুমিও আছ দেখছি গো! শানুর জন্যে পাকা বুনোকুল আনতে গিয়েছিলাম ওপারে। এই দ্যাখো, কী রসালো কুল ধরেছিল কুলের জঙ্গলে! নাও, দুই বন্ধুতে মিলে খাও!'

সে কোঁচড় থেকে একরাশ সোনালি কুল ঢেলে দিল চত্বরে। সেলিম ঝাঁপিয়ে পড়ল। শানু তবু আবদুলের দিকে তাকিয়ে আছে। আবদুল বলল, 'এই মলো! হাঁ করে কী দেখছ তুমি?'

শানু বলল, 'তুমি অমন করে দৌড়ে এলে! তারপর—'

তার কথা কেড়ে আবদুল বলল, 'ও কিছু না। তুমি কুল খাও দিকি! ওই দ্যাখো, বুড়ো মির্জার নাতি একাই সব সাবাড় করে ফেলল!'

শানু দেখল সত্যিই বটে। সেলিম টপাটপ কুলকুলো মুখে পুরছে আর যেন আঁটিসুদ্ধু চিবিয়ে খাচ্ছে। শানুও এবার ভাগ বসাল। কাড়াকাড়ি করে দুই বন্ধুতে কুল খেতে লাগল। একটু পরে শানু দেখল, আবদুল তেমনি দাঁড়িয়ে নদীর ওপারটা দেখছে। ব্যাপারটা সেলিমও লক্ষ করেছিল। এবার বলল, 'আবদুলচাচা, ব্যাপারটা খুলে না বললে আমরা আর তোমার কুল খাব না। এমনকী, তোমার সঙ্গে কথাও বলব না।'

আবদুল ঘুরে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল এ বার তার মুখটা কেমন যেন গম্ভীর। পরমুহূর্তে সে একটু হাসল। বলল, 'তাহলে একটু খুলেই বলি, সোনারা!'

দুজনে একগলায় বলে উঠল, 'বলো আবদুলচাচা!'

চত্বরে ভেঙেপড়া দেয়ালের একটা পাথরের চাঙড়ে বসে আবদুল বলল, 'তোমাদের তো জিন-পরির কত গল্প শুনিয়েছি। জিনরা হল আসমানের মানুষ। তাদের ডানা আছে! তো তাদের মধ্যে দু'রকম জিন আছে। সাদা জিন আর কালো জিন। সাদা জিন মানুষের উবকার করে। কালো জিন মানুষের ক্ষেতি করে। তা আজ অনেকদিন পরে একটা কালো জিনের পাল্লায় পড়েছিলাম বাবারা।'

দুই বন্ধু একগলায় বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি', আবদুল একটু করুণ হাসল, 'বারো বছর আগে ওই কালো জিন একবার আমার পিছু নিয়েছিল। কিন্তু সে আমাকে কাবু করতে পারেনি। এতকাল পরে আবার তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে এলাম, সোনারা!'

শানু ও সেলিম পরস্পর তাকাতাকি করল। তারপর শানু বলল, 'যাঃ! তোমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আবদুলচাচা! তুমিই না বলো, জিন-পরি দিনেরবেলা আকাশ থেকে নামে না, মানুষকে দেখাও দেয় না!'

আবদুল গুম হয়ে বলল, 'সে তো সাদা জিন। এ যে কালো জিন! মানুষের চেহারায় দেখা দেয়। বাগে পেলে মানুষকে জানসুদ্ধু খতম করে দেয়। বাবারা, মানিকরা! আর এখানে থেকো না। শিগগির বাড়ি চলে যাও। এই দ্যাখো, আমিও লুকুতে চললাম মসজিদের ভেতর।' এই বলে সে সত্যি পোড়ো-মসজিদের ভেতর ঢুকে গেল।

সেলিম খি-খি করে হেসে বলল, 'এই জন্যই লোকে ওকে আবদুল-খ্যাপা বলে! মুরুক কে, আয় শানু! আর বই-টই নয়। কর্নেলদাদু ক'টা প্রজাপতি ধরলেন দেখি।'

শানু অবাক হয়ে বলল, 'কর্নেলদাদু! সে আবার কে রে?'

সেলিম বলল, 'ও! তুই তো চিনিসনে ওঁকে। কাল কলকাতা থেকে এসেছেন। আমার দাদুর বন্ধু! নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আবদুলচাচার চাইতেও অদ্ভুত লোক রে! মুখে একরাশ সাদা দাড়ি, মাথায় ইয়াব্বড় টাক! যেন ক্রিসমাসের সান্তাক্লজ', বলেই সেলিম নড়ে উঠল, 'তুই কী রে শানু! ফার্স্ট বয় হলে কি স্কুলের বই ছাড়া কিছু পড়তে নেই? পড়িসনি কর্নেলের অ্যাডভেঞ্চারের কোনও বই?'

শানু একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়েছি মনে হচ্ছে,' বলে সেও চঞ্চল হয়ে উঠল, 'মনে পড়েছে! কর্নেল আর তার সঙ্গী সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর একটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পড়েছি। কী আশ্চর্য!'

সেলিম বলল, 'কর্নেল কিন্তু একা এসেছেন। আয়, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

দুই বন্ধু প্রায় দৌড়ে জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলল। শানু এত অবাক যে, সাপের ভয়টা একেবারে কেটে গেছে মন থেকে। কালো জিনের কথাও সে ভুলে গেছে। এমন সব সাঙ্ঘাতিক অ্যাডভেঞ্চারের নায়ককে সে সশরীরে শুধু দেখতেই পাবে না, তার সঙ্গে আলাপও হবে, এ তো অকল্পনীয়।

একটু এগিয়ে গিয়ে সেলিম থমকে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল, 'ওই দ্যাখ!'

শানু দেখল, একটা ধ্বংসস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। মাথায় টুপি। পরনে ছাইরঙা জ্যাকেট আর প্যান্ট। কাঁধে ঝুলছে একটা ক্যামেরা। (চোখে বাইনোকুলার রেখে তিনি পাখি দেখছেন হয়তো। সেলিম চেঁচিয়ে উঠল,'কর্নেলদাদু!') তখন কর্নেল ঘুরলেন। শানু হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে সেলিম তাকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। বলল, 'কর্নেলদাদু! এর নাম শানু। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়।'

কর্নেল সস্নেহে শানুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমার ডাক নাম তো শানু! আসল নাম কী?'

শানু আস্তে বলল, 'সন্দীপন।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পোড়ো-মসজিদের দিক থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে এল। কর্নেল চমকে উঠেছিলেন। সেলিম চমক খাওয়া গলায় বলল, 'আবদুলচাচার গলা বলে মনে হল!'

শানু বলে উঠল, 'সর্বনাশ! আবদুলচাচাকে কালো জিনটা অ্যাটাক করেনি তো?'

'কালো জিন,' কর্নেল অবাক হয়ে বললেন। তারপর পা বাড়িয়ে ডাকলেন দুই বন্ধুকে, 'এসো তো, কী ব্যাপার দেখি।'

পোড়ো-মসজিদের কাছে পৌঁছতেই চোখে পড়ল চত্বরে পড়ে আবদুল ছটফট করছে যন্ত্রণায়। কর্নেল এক লাফে চত্বরে উঠে আবদুলের কাছে গেলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'কী হয়েছে তোমার?'

আবদুল অতি কষ্টে ঠোঁট ফাঁক করে বলল, 'সা—সা—' তারপর তার লম্বা-চওড়া শরীরটা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। তার ঠোঁটের পাশে চাপচাপ ফেনা আর রক্ত।

শানু আর্তনাদের সুরে বলল উঠল, 'সাপ! সাপ! সেই সাপটা!'...

॥ দুই ॥

ব্রেকফাস্ট টেবিলে মুখোমুখি বসে কর্নেল আর মির্জা গোলাম হায়দার কথা বলছিলেন। কর্নেল বললেন, 'বিষাক্ত সাপের প্রতিশোধ নেওয়ার অনেক গল্প আমিও শুনেছি। কাগজেও খবর বেরিয়েছিল সে-বার।'

মির্জাসায়েব বললেন, 'গ্রামাঞ্চলে লোকেরা এটা বিশ্বাস করে বলেই বিষাক্ত সাপ মেরে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। কিন্তু সেলিম বলল, কিছুক্ষণ আগে নাকি আবদুল বলেছিল, একটা কালো জিন তাকে তাড়া করেছিল—'

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বারো বছর আগেও নাকি একবার ওই কালো জিনটা তাকে তাড়া করেছিল!'

মির্জাসায়েব হেসে উঠলেন হো-হো করে। 'আবদুলখ্যাপা উদ্ভুটে সব গল্প শোনাত ছেলেপুলেকে। ভূত-প্রেত ও জিন-পরিতে আমার বিশ্বাস নেই, সে তো আপনি জানেন কর্নেল! যৌবনে একসময় শিকারের নেশায় কত জঙ্গলে একা রাত কাটিয়েছি। কখনও কোনও অশরীরীর হদিশ পাইনি, যদিও আমি শুনেছি বহু শিকারি নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। প্রখ্যাত শিকারি জিম করবেটও ভূতে বিশ্বাস করতেন।'

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে আনমনে শুধু সায় দিলেন। নবাবগঞ্জের এই অংশটায় শহরের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। বিদ্যুৎ আছে। বাজার আছে। একটি হাইওয়ে চলে গেছে গা ঘেঁসে সুদূর কলকাতার দিকে। মির্জাসায়েবের বাড়িটি বিশাল। এঁরা এখানকার বনেদি মুসলিম পরিবার। এঁরা নিজেদের সেই তুর্কি সুলতানের বংশধর বলে দাবি করেন, নদীর ধারে যাঁর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় এখনও।

মির্জাসায়েব হাসতে-হাসতে বললেন, 'সারা গাঁয়ে কিন্তু গোখরো সাপের প্রতিশোধের গল্পটাই হিড়িক তুলেছে। তবে লোকে বলছে আবদুল যে সাপটাকে মেরেছিল, সেটা ছদ্মবেশী কালো জিনও হতে পারে।'

কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, 'পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কী পাওয়া যায়, দেখা যাক।'

মির্জাসায়েব অবাক হলেন, 'কেন? আপনি কি অন্য কিছু সন্দেহ করছেন?'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'হুঁ। একটা খটকা বেধেছে।'

'কী আশ্চর্য,' মির্জাসায়েব একটু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আপনি নিজেই তো বলেছিলেন, মরার সময় বিষাক্ত সাপে-কাটা মানুষেরই স্পষ্ট লক্ষণ দেখেছেন! এমনকী আবদুল সাপ কথাটাও বলেছে। অথচ আপনিই থানায় খবর দিয়ে সদর শহরের মর্গে লাশ পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন! খটকাটা কীসের, কর্নেল?'

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, 'পোড়ো-মসজিদের ভেতর আবদুল ইদানিং ডেরা করেছিল। সেই ডেরায় ঢুকে আমি দেখেছি ওর নোংরা বিছানা তছনছ করে রেখেছে কেউ। কেউ-বা কারা যেন কিছু তন্নতন্ন করে খুঁজেছে।'

মির্জাসায়েব আবার হাসলেন, 'কেউ না। আবদুল নিজেই করে থাকতে পারে। ওর খ্যাপামির কথা কে না জানে? হঠাৎ-হঠাৎ খ্যাপামির চূড়ান্ত করে ফেলত— আমি নিজেও দেখেছি।'

কর্নেল এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যে জিনিসটা কেউ বা কারা অমন তন্নতন্ন করে খুঁজছে, সম্ভবত সেটাই আমি কোণার দিকে মেঝের ফাটলে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

মির্জাসায়েব চমকে উঠে তাকালেন কর্নেলের মুখের দিকে। তখন কর্নেল পকেট থেকে কাগজে-মোড়া একটা ছোট্ট জিনিস বের করলেন। মোড়ক খুলে টেবিলে সেটা রাখতেই মির্জাসায়েব বলে উঠলেন, 'এ কী! এটা দেখছি একটা সোনার মোহর!'

'হ্যাঁ, সোনার মোহর,' কর্নেল বললেন, 'ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপে দৈবাৎ আবদুল একটা মোহর কুড়িয়ে পেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা বাই দা বাই, আপনি তো ফার্সিভাষা জানেন। আগে দেখুন তো কী লেখা আছে এতে?

মির্জাসায়েব চশমা পরে মোহরটার একপিঠ দেখতে-দেখতে বললেন, 'হরফগুলো ক্ষয়ে গেছে তবু পড়া যাচ্ছে ঃ

খানখানান লতিফ খান, ২৮ জেলহজ্জ, হিজরি সন ৮৬৩। ...একমিনিট, বলে মির্জাসায়েব উঠে গিয়ে বুক সেলফ থেকে একটা বই টেনে বার করলেন। বইটার পাতা উলটে বললেন, 'হুঁ, ইংরেজি সন তারিখের হিসেবে ২৬ অক্টোবর, ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ। বাংলায় তখন ইলিয়াসশাহি বংশের রাজত্ব। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদশাহের আমল। রাজধানী তখন ছিল গৌড়ে, বর্তমান মালদহে।'

কর্নেল বললেন, 'এবার উলটো পিঠটা পড়ে দেখুন তো!'

মির্জাসায়েব মোহরের উলটো পিঠে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'একটা ফারসি প্রবচন লেখা আছে দেখছি! সাদামাটা বাংলায় এর মানে হল, 'সাত বৃদ্ধ যেখানে, মানিক ফলে সেখানে।' আসলে প্রাচীন পারস্য দেশে বৃদ্ধদের খুব খাতির করা হতো। কারণ পারসিকরা ভাবত, বৃদ্ধরাই সবচেয়ে জ্ঞানী। আর জ্ঞানকে তুলনা করা হতো মণি-মাণিক্যের সঙ্গে।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'ভারতেও তাই। তবে শুধু বিশেষ-বিশেষ দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই প্রাচীন যুগে বৃদ্ধদের জ্ঞানী বলে খুব সম্মান করা হতো। বাংলা প্রবচনেও তো আছে, তিন-মাথা যেখানে, বুদ্ধি নেবে সেখানে।'

মির্জাসায়েব অট্টহাসি হেসে বললেন, 'আমরা দু'জনেও বৃদ্ধ। অথচ আজকালকার ছেলেরা যেন বৃদ্ধদের সবতাতেই অস্বীকার করতে চায়।'

কর্নেল বললেন, 'সুতরাং শ্রীমান সেলিম তার দাদুকে আড়াল থেকে ভেংচি কাটতেই পারে।'

অমনি দরজার পর্দার ওধারে ধুপ-ধুপ শব্দে এবং খিল-খিল হেসে কার দৌড়ে

পালানো টের পাওয়া গেল। মির্জাসায়েব এগিয়ে গিয়ে পরদা তুলে দেখে বললেন, 'তবে রে বেওকুফ্! রোসো দেখাচ্ছি মজা! আড়িপাতা হয়েছিল এখানে! কিন্তু এখানে যে এক বাঘা গোয়েন্দা বসে আছেন, তাঁর নজর এড়ানো কি এতই সোজা?'

কর্নেল নিবে-যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, ''আচ্ছা মির্জাসায়েব, বাদশাহি মোহরে বাদশাহি গৌরব আর ঈশ্বরের মহিমার কথা লেখা থাকে, এটাই নিয়ম। কিন্তু এই মোহরে এমন প্রবচন লেখা আছে দেখে অবাক লাগছে না আপনার?'

মির্জাসায়েব গম্ভীর হয়ে বসে বললেন, 'তাই তো! আপনি ঠিকই বলেছেন। অবশ্য ব্যতিক্রম থাকতেও পারে হয়তো।'

কর্নেল বললেন, 'পুরনো মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি আছে। এই ব্যতিক্রমটা মেনে নিতে বাধছে। যাই হোক, আবদুলের মৃত্যুর ব্যাপারে আরও একটা খটকা লেগেছিল। সেটা হল, আবদুল শানু ও সেলিমকে বলেছিল, বারো বছর আগে কালো জিনটা তার পিছু নিয়েছিল। সেলিমদের কাছেই শুনলাম, বারো বছর আগেই নাকি এ অঞ্চলে ভীষণ বন্যা হয়েছিল এবং আবদুলকে গাছের ডালে পাওয়া গিয়েছিল। সেই থেকে আবদুল এই নবাবগঞ্জে এসে আছে।'

মির্জাসায়েব একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার সেই কালো জিনের কথা? জিন-টিন স্রেফ বাজে কথা!'

কর্নেল বললেন, 'এমন তো হতে পারে মির্জাসায়েব, কালো জিন বলতে আবদুল তার কোনও শত্রুকেই বুঝিয়েছিল, যার ভয়ে সে তার দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসার সময় বন্যায় ভেসে যায় এবং অনেকে কষ্টে একটা গাছে আশ্রয় নেয়?'

মির্জাসায়েব একটু থেমে বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু কোথায় ওর দেশ বা বাড়িঘর ছিল, সেটাই তো কেউ জানে না। আবদুল নিজেও কাউকে বলেছে বলে জানি না। আমিই তো ওকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রায় এক বছর হাবাগোবার মতো মনে হতো তাকে। ফাইফরমাশ খাটত। কিন্তু কথা বলত খুব কম। শেষে একদিন নিজেই আমার বাড়ি থেকে চলে গেল। শুনলাম শানুদের বাড়ি গিয়ে উঠেছে। ওদের জমিতে মজুর খাটছে।'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মোহরটা আপনি রেখে দিন। একটু সাবধানে রাখবেন। আমি বেরোচ্ছি। দেখি, আজ একটা অন্তত প্রজাপতি ধরতে পারি নাকি!'

রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে গেছেন, সেলিম এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আজ আমাকে সঙ্গে না নিয়ে বেরোচ্ছেন যে কর্নেলদাদু?'

কর্নেল হাসতে-হাসতে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'জানি, তোমাকে সঙ্গে পেয়ে যাব। তা তোমার বন্ধুটি কোথায়?'

'শানু?' সেলিম বলল, 'শানুকে ডেকেই তো আসছি। আজ সোমবারও স্কুলে ফতেহা-দোয়াজ দহমের ছুটি।'

কর্নেল বললেন, 'হুঁ, তোমাদের প্রফেটের বার্থডে।'

একটু পরে রাস্তায় শানুকে দেখা গেল। সে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কর্নেলের সঙ্গে দুই বন্ধু মোড় দিয়ে নদীর দিকে হাঁটতে থাকল। এদিকে গ্রামের শেষ প্রান্ত। বিদ্যুতের তার এদিকে আসেনি। গরিব-গুরবো মানুষের বসতি। খোড়ো ঘর। জীর্ণ দশা। পেছনেই খেলার মাঠ, তারপর জঙ্গল আর ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ নদীর ধার অবধি ছড়ানো। জঙ্গলের ভেতর পোড়ো-মসজিদের বিশাল গম্বুজটি দেখা যাচ্ছিল। গম্বুজেও ফাটল ধরেছে। গজিয়ে উঠেছে বট-অশ্বত্থের চারা।

যেতে-যেতে শানু বলল, 'কর্নেল! কাল রাত্তিরে আমাদের দোতলার ছাদ থেকে মসজিদের কাছে টর্চের আলো দেখেছি, জানেন?'

কর্নেল বললেন, 'তারপর?'

শানু বলল, 'বারকতক টর্চ জ্বেলে কে কী যেন খুঁজছে মনে হল। তারপর আর কিছু দেখিনি।'

সেলিম বলল, 'একটা কথা, কর্নেলদাদু।'

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে একটা পাখি দেখতে-দেখতে বললেন, 'বলো!'

সেলিম বলল, 'মরা গোখরো সাপটা আবার জ্যান্ত হয়ে আবদুলচাচাকে কামড়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। দাদুকে আপনি একটা মোহর—'

কর্নেল দ্রুত বললেন, 'চুপ! জানো না? বাতাসেরও কান আছে!'

সেলিম কাঁচুমাচু মুখে হাসল। শানু বলল, 'কিন্তু কাল সারা বিকেল কর্নেলদাদুর সঙ্গে আমরা সেই মরা সাপটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও তো পাইনি।'

সেলিম তর্কের সুরে বলল, 'তার মানে, তুই ওই সব গপ্পে বিশ্বাস করিস?'

শানু বলল, 'কিন্তু সাপটা গেল কোথায়? আমার সামনেই তো আবদুলচাচা সাপটার লেজ ধরে ঘোরাতে-ঘোরাতে ছুড়ে ফেলল। কোথায় গিয়ে পড়ল আমি দেখেছিলাম। অথচ সেখানে কোথাও মরা সাপ নেই!'

সেলিম বলল, 'শেয়াল বা কুকুর মুখে করে নিয়ে গেছে!'

কর্নেল বললেন, 'শেয়াল-কুকুর গোখরো সাপের মাংস সুস্বাদু বলে মনে করে না, ডার্লিং! তবে ঈগল, চিল, ময়ূর কিংবা বাজপাখির কথা আলাদা। সাপের মাংস এসব পাখির প্রিয় খাদ্য।'

সেলিম বলল, 'কর্নেলদাদু, কাক, কাকের কথা বলছেন না?

'হুঁ, কাকের অবশ্য অখাদ্য বলে কিছু নেই,' বলে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে পোড়ো-মসজিদটা দেখতে থাকলেন।

সেলিম জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল কিছু, হঠাৎ কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটতে শুরু করলেন মসজিদটার দিকে। শানু ও সেলিম তাঁর পেছন-পেছন চলল। মসজিদের চত্বরে উঠে কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, 'এসো। আমরা মসজিদের ভেতরটা একবার দেখি।'

কর্নেল পা বাড়িয়েছেন, সেলিম বলে উঠল, 'কর্নেলদাদু, কর্নেলদাদু! জুতো খুলে তবে মসজিদে ঢুকতে হয়।'

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ ডার্লিং!'

তিনজনে চত্বরে জুতো খুলে রেখে মসজিদের ভেতর ঢুকল। চার-পাঁচশ বছর ধরে এই মসজিদ পোড়ো হয়ে রয়েছে। একটা দিক ধসে পড়েছে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হয়, এখনই বুঝি হুড়মুড় করে ধসে পড়বে। গম্বুজটা বিশাল। তার তলায় ছাদ ফুঁড়ে গাছপালার শেকড় বেরিয়ে এসেছে। ফাটল দিয়ে রোদ্দুর এসে ভেতরটা স্পষ্ট করেছে বটে, কিন্তু কোণার দিকটা ভেঙে পড়ায় আবছা আঁধার জমে আছে। গা ছমছম করে ওঠে ভেতরে ঢুকলে। প্রকৃতি যে অসংখ্য নখ দিয়ে আঁচড় কেটে চলেছে একটা ঐতিহাসিক কীর্তিকে খতম করে দেবে বলেই।

একঝাঁক চামচিকে সেলিম ও শানুর ওপর আচমকা এসে পড়তেই তারা আঁতকে উঠেছিল। মেঝেয় চামচিকের নাদি, পলেস্তারা খসা বালি আর চুন-সুরকির আস্তর, দেয়ালে-দেয়ালে মাকড়সার জাল, চড়ুইপাখির বাসা ঘুলঘুলিতে। শুধু একটা কোণ বেশ পরিষ্কার। সেখানেই আবদুলের ডেরা ছিল।

কর্নেল বললেন, ''আশ্চর্য তো! কাল বিকেলে আমি এখানে আবদুলের বিছানা ছড়িয়ে থাকা দেখেছি। সেগুলো তো নেই!'

সেলিম ও শানু মুখ তাকাতাকি করল। তারাও ভারি অবাক হয়ে গেছে।

কর্নেল ঝুঁকে পড়ে মেঝেয় আতশকাচ দিয়ে কী যেন খুঁজতে ব্যস্ত হলেন। সেলিম বলল, 'কী খুঁজছেন কর্নেলদাদু?'

কর্নেল বললেন, 'কাল বিকেলে টর্চের আলোয় যা খুঁজে পাইনি, এখন পাচ্ছি।'

শানু উত্তেজিতভাবে জিগ্যেস করল, 'কী?'

কর্নেল সোজা হয়ে বললেন, 'জুতোর ছাপ।'

সেলিম মুচকি হেসে বলল, 'কাল নিশ্চয় আপনি জুতো পরে ভেতরে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ' কর্নেল স্বীকার করলেন, 'কাল আমার খেয়াল হয়নি, ধর্মস্থানে পায়ে জুতো পরে ঢুকতে নেই। তবে যে ছাপ এখন দেখলাম, তা আমার জুতোর ছাপ নয়। অন্য কারও। যে আবদুলের বিছানা তন্নতন্ন খুঁজেছিল, এ নিশ্চয় তারই জুতোর ছাপ।'

শানু চমকে উঠে তাকাল সেলিমের দিকে। সেলিম চোখের ইশারায় জানিয়ে দিল, ব্যাপারটা পরে ওকে খুলে বলবে।

কর্নেল পকেট থেকে টর্চ বের করে অন্ধকার জায়গাগুলোও পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হলেন। দুই বন্ধু অবাক চোখে প্রখ্যাত গোয়েন্দাবুড়োর কীর্তিকলাপ দেখতে থাকল।

একটু পরে কর্নেল এক-টুকরো মাটি কুড়িয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'হুঁ, লোকটা আবদুলকে ফলো করে এসেছিল নদীর ওপার থেকে। তার জুতোয় এই মাটি লেগে ছিল।'

সেলিম বলল, 'কী করে বুঝলেন কর্নেলদাদু?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'নদীর এপারটা উঁচু। প্রাচীন রাজধানী হওয়ার দরুণ এপারের মাটিতে চুনসুরকি বালি মিশে রয়েছে। কিন্তু ওপারের মাটিটা স্রেফ পলিমাটি। এই মাটির টুকরোও পলিমাটি।'

শানু ও সেলিম একগলায় বলল, 'ঠিক, ঠিক।'

কর্নেল বললেন, 'চলো। বেরোনো যাক।'

শানু ও সেলিম এখান থেকে বেরোতে পারলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তারা আগে বেরিয়ে গেল। কর্নেল আর-একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে তবে বেরোলেন।

কিন্তু তারপরই শানু ও সেলিমের উত্তেজিত চিৎকার শুনলেন। বেরিয়ে গিয়ে দেখেন, তিন জোড়া জুতোই উধাও। শানু ও সেলিম এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেলিম শাসাচ্ছে, 'ভালো হবে না বলছি। কে জুতো লুকিয়েছে, বলো! নইলে...'

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, 'লোকটি দেখছি বড়ই রসিক।'

শানু বলল, 'কে সে কর্নেলদাদু?'

কর্নেল জবাব দিলেন না। চোখে বাইনোকুলার রেখে চারপাশে সেই লোকটিকেই যেন খুঁজতে থাকলেন। ওদিকে সেলিম এক লাফে চত্বর থেকে নেমে গেল। তারপর, 'তবে রে জুতোচোর' বলে ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্নেল ডাকলেন, 'সেলিম, সেলিম!' কিন্তু সেলিম যেন শুনতেই পেল না। শানু হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর সে যেই বন্ধুকে অনুসরণের জন্য পা বাড়িয়েছে, কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, 'যেও না শানু। ও জুতোচোরকে ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। এখনই ফিরে আসবে।'

দুজনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কর্নেল আবার বাইনোকুলারে সেলিমকে খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু তাকে দেখতে পেলেন না। আর কিছুক্ষণ পরে কর্নেল বললেন, 'চলো তো দেখি। সেলিম কোনদিকে গেল?'

সেলিম জঙ্গলের ভেতর যেদিকে গেছে, সেদিকে এগিয়ে চললেন দুজনে। মাঝে-মাঝে দুজনেই সেলিমকে ডাকছিলেন। কিন্তু কোনও সাড়া পেলেন না। তখন শানুর মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। সে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'কর্নেলদাদু! সেলিম কালো জিনটার পাল্লায় পড়েনি তো?'

কর্নেলের মুখেও এতক্ষণে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। শুধু বললেন, 'এসো।'

দুজনে গোটা এলাকা সেলিমকে খুঁজে-খুঁজে হন্যে হচ্ছিলেন। কিন্তু সেলিমের পাত্তা নেই। জঙ্গলে ধ্বংসস্তূপের পরে খানিকটা চষা জমি। সেখানে লাঙল চষছিল একটা লোক। কর্নেল ও শানুকে দেখে সে লাঙল থামিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল। কর্নেলকে সে সায়েব ভেবেছিল। কর্নেল যখন বাংলায় তাকে জিগ্যেস করলেন,

তুমি কি এদিকে মির্জাসায়েবের নাতি সেলিমকে দেখেছ? তখন সে আরও অবাক হয়ে গেল। সেলাম ঠুকে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার। একটু আগেই তো দেখলাম, একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ওই দিকে চলে গেল!'

শানু বলে উঠল, 'ওদিকে মানে, সাতবুড়ুয়ার দিকে?'

চাষি লোকটি মাথা নাড়ল। কর্নেল বললেন, 'সাতবুড়ুয়া। সেটা কী?'

শানু বলল, 'ওই যে দেখছেন গাছপালার ভেতর মন্দিরগুলো। আসলে ওটা সপ্তশিবের মন্দির। ভেঙেচুরে পড়ে আছে। বুড়োশিবের মন্দির আর কী! তাই লোকে বলে সাতবুড়ুয়ার মন্দির। কিন্তু সেলিমের কাণ্ডটা শুনে রাগ হচ্ছে। অমন করে কার সঙ্গে...'

তার কথায় বাধা পড়ল। একটা লোক দৌড়ে আসছিল গ্রাম থেকে। সে এসে হাঁফাতে-হাঁফাতে সেলাম করে বলল, 'কর্নেলসায়েব! মির্জাসায়েব আপনাকে এখনই ডেকেছেন। শিগগির আসুন।'

কর্নেল ও শানু তার পেছন-পেছন ব্যস্তভাবে গ্রামের দিকে চললেন।

মির্জাসায়েব বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কী একটা ঘটেছে। কর্নেলকে দেখেই নিঃশব্দে একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন। কর্নেল ভাঁজ খুলে দেখলেন একটা চিঠি। তাতে লেখা আছে ঃ

আজ বারো ঘণ্টার মধ্যে আবদুলের মোহরটা জঙ্গলে নবাবি মসজিদের ভেতর কাগজে মুড়ে চোখেপড়ার মতো জায়গায় না রেখে এলে মির্জার নাতিকে জবাই করা হবে। যদি পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, তাহলে তাঁর নাতিকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।

॥ তিন ॥

মির্জাসায়েব বাড়ির অন্দরমহলের একটি ঘরে মির্জাসায়েব, কর্নেল, নবাবগঞ্জ থানার অফিসার ইন-চার্জ মহিউদ্দিন এবং সদর শহরের সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর জিতেন্দ্রনাথ গোপনে আলোচনা করছিলেন। বেলা প্রায় একটা বাজে। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নবাবগঞ্জ এসেছেন এবং সামান্য এক মানুষ আবদুলের মৃত্যু নিয়ে তাঁর এত উৎসাহ ও সন্দেহের কথা জেনে জিতেন্দ্রনাথ ছুটে এসেছেন সদর থেকে জিপে চেপে। মির্জাবাড়িতে গোপনে এবেলা ওঁদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। বাড়িতে কান্নাকাটি হুলুস্থুলু পড়ে গেছে সেলিমের জন্য। সেলিমের বাবা থাকেন সুদূর আবুধাবিতে। তাঁকে এখনই ট্রাংকল বা টেলিগ্রাম করে এ বিপদের কথা জানতে বারণ করেছেন কর্নেল।

আলোচনারত মুখগুলি গম্ভীর। সবাই চাপা গলায় কথা বলছেন। ও. সি. মহিউদ্দিন বললেন, 'মর্গের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিষাক্ত সাপের কামড়ে মৃত্যু। বিষাক্ত

সাপের দুটো দাঁত থাকে। আবদুলের ডান পায়ের ওপর সে-চিহ্নও দেখেছেন ডাক্তার। কিন্তু—আশ্চর্য! মির্জাসায়েবের নাতিকে—'

তাঁর কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'সে কথা পরে হবে মহিউদ্দিনসায়েব। আবদুলের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে কি না বলুন।'

মহিউদ্দিন বললেন, 'হ্যাঁ। কালই বিভিন্ন থানায় রেডিও মেসেজে জানিয়েছিলাম। আজ সকালে লালগোলা থানার রেডিও মেসেজে যা জানলাম, তা হল এই ঃ আবদুলের বাড়ি ছিল পদ্মার ধারে সাহেবগঞ্জে। ও ছিল আসলে বনেদি ফ্যামিলির লোক। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই একটু ছিটগ্রস্ত টাইপের। বছর বারো আগে আবদুলের সঙ্গে গফুর খাঁ পাঠান নামে একজন লোকের মারামারি হয়। মারামারির কারণ কেউ জানে না। গফুর একজন দাগি ক্রিমিন্যাল। বহুবার জেল খেটেছে। গফুরকে স্থানীয় লোকে বলে 'গোখরো-পাঠান'। বুঝলেন তো? ওকে সবাই বলত 'গোফরা-পাঠান'। তা থেকেই শেষে ওর নাম হয়েছিল গোখরো পাঠান। যাই হোক, তার গায়ে হাত তোলার পরিণাম সাঙ্ঘাতিক হওয়ার কথা। সম্ভবত সেই ভয়েই আবদুল গ্রাম ছেড়ে .পালিয়ে আসে।

কর্নেল মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, 'হুঁ! মনে হচ্ছে এই ঐতিহাসিক সোনার মোহর নিয়েই দু'জনের মধ্যে বিবাদ বেধেছিল।'

জিতেন্দ্রনাথ বললেন, 'গোখরো পাঠানের নামে তিনটে খুন আর একডজন ডাকাতির অভিযোগে পরোয়ানা ঝুলছে। ব্যাটাচ্ছেলে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

মহিউদ্দিন একটু হেসে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তা হলে কী গোখরো-পাঠানের পাল্লায় পড়েছিল আবদুল? অথচ তার মৃত্যু হল গোখরোর কামড়ে। অদ্ভুত যোগাযোগই বলতে হবে।'

মির্জাসাহেব বললেন, 'নবাবগঞ্জের লোকে বলছে, সাপ মেরে পুড়িয়ে দেয়নি আবদুল। সেই সাপটাই তাকে নাকি কামড়েছে। তা হলে দেখছি ব্যাপারটা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

কর্নেল বললেন, 'না, মির্জাসায়েব। মর্গের রিপোর্টে গণ্ডগোল আছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ, পরবর্তী ঘটনাগুলো বলে দিচ্ছে আবদুলের মৃত্যু সাপের কামড়ে হয়নি। বাই দা বাই, মহিউদ্দিনসায়েব, গোখরো-পাঠানের চেহারা বর্ণনা পেয়েছেন রেডিও মেসেজে?'

জিতেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাদের রেকর্ডে আছে। দেখতে চাইলে ওর ফোটোও আপনাকে এনে দিতে পারি দফতর থেকে।'

কর্নেল বললেন, 'তার গায়ের রং কালো এবং সে দেখতে কদাকার কি?'

দুজন পুলিশ অফিসারই অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' তারপর জিতেন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন, 'এ-জন্যই পুলিশমহলে কর্নেলকে 'অন্তর্যামী' বলা হয়।'

কর্নেল হাসলেন, 'না জিতেনবাবু! আমি অন্তর্যামী নই। আবদুল বলেছিল

গতকাল ওকে নদীর ওপারে একটা কালো জিন তাড়া করেছিল। বারো বছর পরে নাকি সেই কালো জিনটার সঙ্গে আবদুলের আবার দেখা। তাই আমার ধারণা হয়েছিল, আসলে সে তার শত্রুর গায়ের রং কালো ও চেহারা কদাকার, এটাই বলতে চেয়েছিল।'

দুই পুলিশ অফিসারই সপ্রশংস ভঙ্গিতে সায় দিলেন। মির্জাসায়েব বললেন, 'এবার বলুন, আমার নাতি সেলিমের কী হবে? আগের মতো গায়ের তাকত থাকলে ওই গোখরো-পাঠানকে গুলি করে মারতাম। আমি এখন বুড়ো হয়েছি।' তাঁর চোখে জল এসেছিল। হাতের চেটোয় চোখ মুছে ফের বললেন, 'কত সাংঘাতিক মানুষখেকো বাঘকে সামনাসামনি গুলি করে মেরেছি। ও তো একটা মানুষের বেশধারী শয়তান!'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'ভাববেন না মির্জাসায়েব! এ পর্যন্ত কোথাও কোনওদিন আমি হারিনি। আমার বিশ্বাস, এবারও হারব না,' বলে উনি মহিউদ্দিনের দিকে ঘুরলেন, 'মর্গের রিপোর্ট ঠিক নয় মহিউদ্দিনসায়েব। আপনি বরং—'

বাধা দিয়ে বিরক্তমুখে মহিউদ্দিন বললেন, 'কিন্তু আপনিও তো আবদুলের মৃত্যুর সময় তার মুখে 'সাপ' কথাটা শুনেছেন।'

কর্নেল বললেন, 'সাপ শুনিনি। সে অতিকষ্টে সা-সা বলেছিল। আসলে সে কী বলতে চাইছিল, আমরা এখনও জানি না,' বলে কর্নেল মির্জাসায়েবের দিকে ঘুরলেন, 'আপনি তো আমার মতো ইতিহাস প্রত্নবিদ্যার কেতাব পড়েন। আপনার কাছে স্থানীয় প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত কোনও বই আছে?'

মির্জাসায়েব গম্ভীর মুখে বললেন, আছে। রবার্ট স্মিথের লেখা 'দা ডেকাডেন্স অফ দা টার্কি সুলতানেট অব বেঙ্গল।' ওতে পুরনো নবাবগঞ্জের ডিটেলস আছে।'

কর্নেল হাসলেন, 'আপনার নাতিকে উদ্ধারের আগে ওই বইটাতে আমি একটু চোখ বুলোতে চাই।'

বাঁকা হেসে দারোগা মহিউদ্দিন বললেন, 'কর্নেল কি ওই বইয়ের ভেতর মির্জাসাহেবের নাতিকে কিডন্যাপ করার ক্লু পাবেন নাকি?'

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, 'মহিউদ্দিন সায়েব, সেই কবিতাটি নিশ্চয় জানেন : 'যেইখানে পাবে ছাই/উড়াইয়া দেখ তাই/পাইলে পাইতে পার অমূল্যরতন।' আমি তাই ছাইপাঁশ হাতড়ে দেখারই পক্ষপাতী।'

মহিউদ্দিনদারোগা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাকে এখনই থানায় ফিরতে হবে। ভাববেন না মির্জাসাহেব! এমন ফাঁদ পেতে রাখব, যাতে গোখরো-পাঠান পা না দিয়ে পারবে না।'

মির্জাসায়েব আঁতকে উঠে বললেন, 'সে যদি জানতে পারে, পুলিশকে খবর দিয়েছি, তা হলে সেলিমকে আর ফিরে পাব না। আল্লার দোহাই! আপনারা যা কিছুই করুন, যেন সেলিমকে—'

বাধা দিয়ে মহিউদ্দিন বললেন, 'না, না! আমরা যথেষ্ট সাবধানে কাজ করব।'

জিতেন্দ্রনাথও উঠলেন। দুই পুলিশ অফিসার কর্নেল ও মির্জা-সায়েবকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। সতর্কতা হিসেবে ওঁদের খিড়কির দরজা দিয়ে অন্দরমহলে নিয়ে আসা হয়েছিল। বাড়ির বিশ্বাসী ভৃত্য করিম ওঁদের গোপনীয়তার জন্য ওদিকটায় নজর রেখেছিল। করিম অবস্থা বুঝে দুই পুলিশ অফিসারকে খিড়কি দিয়ে নিয়ে গেল।

মির্জাসায়েব ও কর্নেল এসে বাইরের ঘরে বসলেন এবার। মির্জাসায়েব আলমারি থেকে স্মিথের বইটি কর্নেলকে দিয়ে বললেন 'গোখরো না গোখরো-পাঠানের গায়ের রং নাকি কালো। অথচ মকবুল লাঙল-চষার সময় সেলিমকে যার সঙ্গে যেতে দেখেছিল, তার গায়ের রং নাকি কালো নয়। আমি কিছু বুঝতে পারছি না কর্নেল!'

কর্নেল বইটার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বললেন, 'লোকটাকে মকবুল চেনে না বলেছে। কাজেই গোখরো-পাঠান নবাবগঞ্জে কোনও সঙ্গী জোটায়নি।'

'তার মানে এ লোকটা গোখরো-শয়তানের কোনও চেলা। বদমাশটা তাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছে, এই তো?' বলে মির্জাসাহেব কর্নেলের দিকে তাকালেন।

কর্নেল তখন বইটার একটা পাতায় চোখ রেখেছেন। যেন মির্জাসায়েবের কথা কানেই ঢুকছে না। তিনি হঠাৎ বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ নিঃশব্দ হাসিতে উজ্জ্বল। তারপর মির্জাসায়েবকে স্তম্ভিত করে হন্তদন্ত বেরিয়ে গেলেন। কতকটা দৌড়নোর ভঙ্গিতেই।

মির্জাসায়েব বলে উঠলেন, 'তাজ্জব!'

।। চার ।।

শানু সপ্তশিবের ভাঙা মন্দিরের ওখানে একা দাঁড়িয়ে ছিল। সেলিমের বিপদে সে চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। নবাবগঞ্জ হাইস্কুলে ক্লাস এইটে দুজনেই পড়ে। শানু ফার্স্ট বয়, সেলিম সেকেন্ড বয়। প্রতি বছর দু'জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে ফার্স্ট হওয়া নিয়ে। কিন্তু সেলিম ফার্স্ট হতে পারে না। তবু এ জন্য শানুর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা জাগে না, মুখে যতই ঠাট্টাতামাশা করুক। তারা বরাবর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পুজোয় বা ঈদের পরবে শানু বা সেলিমদের বাড়িতে পরস্পরের খাওয়াদাওয়ার ডাক পড়ে। দুটি পরিবারেও খুব হৃদ্যতার সম্পর্ক। তাই সেলিমের এই বিপদে শানু মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাকে উদ্ধারের জন্য।

চাষি মকবুল বলেছে, সেলিম একজনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সপ্তশিব বা সাতবুড়োয়ার মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। তাই শানু এখানে চলে এসেছে। দুপুরে ভালো করে খেতেও পারেনি। ছুটে গিয়েছিল সেলিমদের বাড়িতে কর্নেলের খোঁজে। কিন্তু

তখন কর্নেল দুই পুলিশ-কর্তাকে নিয়ে অন্দরমহলে গোপনে আলোচনারত। তাই শানুকে বাড়ির কেউ কর্নেলের খবর দেয়নি। করিম বলেছিল, 'কর্নেলসাহেবকে খুঁজছ? উনিও তো এক আবদুলখ্যাপা। পাখ-পাখালির পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন কোথায় দেখ গে।'

সপ্তশিবের মন্দির বলতে আর কিছু টিকে নেই। ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপ অনেকটা জায়গা জুড়ে। মধ্যিখানে বিশাল এক বটগাছ চারদিকে অজস্র ঝুরি নামিয়েছে। দিনদুপুরেই জায়গাটা নিঝুম আঁধার হয়ে থাকে। তা ছাড়া জায়গাটার এমন বদনাম যে, দিনদুপুরেও একাদোকা কেউ পারতপক্ষে এদিকে পা বাড়ায় না। কারণ শিবের চেলারা যে ভূত-পেরেত! শিবের মন্দির ধ্বংস হয়েছে; কিন্তু তাঁর চেলারা পাহারা দিচ্ছে না বুঝি? একাদোকা পা বাড়ালেই ঘাড়টি মটকে দেবে।

শানুর তাই মাঝে-মাঝে গা ছমছম করছিল। হেমন্তের বিকেলে গাছপালা জুড়ে অজস্র পাখি চেঁচামেচি করছিল। এখনই দূরের গাছপালা ঘিরে কুয়াশার নীল আস্তরণ ঘনিয়ে উঠেছে। বিকেলের হলুদ রোদ গায়ে মেখে উড়ে চলেছ বুনো হাঁসের ঝাঁক। নদীর ওপারে বিলের জলে এখনই তাদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। হাঁসের ঝাঁকটাকে শানু পেছন ফিরে মুখ তুলে দেখছিল। আবদুলচাচা তার এ অভ্যাসের মূলে। আবদুল বলত, 'রাতের বেলা জোস্না হলে হাঁসগুলোর ভেতর থেকে পরিরা আপন রূপ ধরে। কেন জানো তো? অনেক পরি যে হাঁসের রূপ ধরে দুনিয়ায় নেমে আসে। দুনিয়ার নদী-খালবিলের পানিতে সাঁতার না কাটলে আসমানের পরিদের ঘুম হয় না পরিস্তানে।' এসব কথা শোনার পর শানু হাঁসের ঝাঁক দেখলেই মুখ তুলে তাদের দেখতে-দেখতে ভাবত, কোন হাঁস পরি, আবদুলচাচা নিশ্চয় চিনতে পারে। কেন তাকে চিনিয়ে দেয় না আবদুলচাচা? আজ আর সেই আবদুলচাচা নেই। শানু দুঃখে শ্বাস ফেলল।

একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল শানু। হঠাৎ কোথাও শুকনো পাতায় মস-মস শব্দ আর কাদের চাপা গলার কথাবার্তা শুনে সে চমকে উঠল। তারপর একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। একটু পরে সে দেখল, দুটো লোক কথা বলতে-বলতে এগিয়ে আসছে!

একজনের চেহারা দেখে শানু শিউরে উঠল। ও কি মানুষ না ভূত? জীবনে অমন কালো-কুচ্ছিত চেহারার মানুষ দ্যাখেনি শানু। থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখ, মাথায় একরাশ চুল। তার পরনে নীলচে আঁটো প্যান্ট আর জ্যাকেট। কাঁধে একটা কীটব্যাগ। আকারে বেঁটে হলেও সে বেশ মজবুত গড়নের লোক। মুহূর্তে শানুর মনে হল, একেই কি আবদুলচাচা কালো জিন বলেছিল?

তার সঙ্গীটি ঢ্যাঙা গড়নের লোক। তার পরনে প্যান্ট আর গলাবন্ধ সোয়েটার। এখনও তত শীত পড়েনি। কিন্তু শানুর মনে হল, রাত কাটানোর জন্যই গায়ে সোয়েটার চড়িয়েছে লোকটা। তার নাকটা চোখে পড়ার মতো লম্বা।

হঠাৎ শানুর মনে হল, এই ঢ্যাঙা লোকটিকে কোথায় দেখেছে। মুখটা খুব চেনা। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

কালো-কুচ্ছিত লোকটা বলল, 'হুঁশিয়ার থাকবে। এখানে পুলিশ দেখলেই জানবে, মির্জাব্যাটা পুলিশকে সব জানিয়েছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে মির্জার নাতিকে জবাই করে ফেলবে।'

ঢ্যাঙা লোকটা খি-খি করে হেসে বলল, 'ছোঁড়াটা যে ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে। শ্বাসনালি কাটার কষ্টও টের পাবে না।'

কালো লোকটা ধমক দিয়ে বলল, 'পুলিশ দেখেও যদি ছোঁড়াটাকে জবাই না করো, তোমার কী হবে বুঝতে পারছ?' বলে সে জ্যাকেটের ভেতরপকেট থেকে কী একটা যন্ত্র বের করল। খুব ছোট্ট যন্ত্র।

দেখামাত্র ঢ্যাঙা লোকটা ভয় পেয়ে বলল, 'আরে, রসিকতা বোঝো না কেন? সবতাতেই ফোঁস করে ওঠো। এজন্যই লোকে তোমাকে গোখরো-পাঠান বলে!'

কালো লোকটা জিনিসটা ঢুকিয়ে রেখে বলল, 'মোহরটা যদি পাই, তাহলে আমরা দুজনেই রাজা হয়ে যাব। বুঝলে তো?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে ঢ্যাঙা লোকটা বলল, 'তা হলে যাও। গিয়ে দেখ নবাবি মসজিদের চত্বরে মোহরটা রেখে গেছে নাকি। হাতে আর মোটে কয়েক ঘণ্টা টাইম।'

কালো লোকটা বলল, 'মুশকিল হয়েছে কী জানো? মির্জার ওই কলকাতার বন্ধু কর্নেল না ফর্নেল, সে একজন ঘুঘু। আমার ধারণা, সে একজন পুলিশের গোয়েন্দা। যাই হোক, আমিও বাবা গোখরো-পাঠান। বিস্তর ঘুঘু আমি টিট করেছি। নবাবি মসজিদের ধারে-কাছে তাকে দেখলেই গোখরোর ছোবল কী জিনিস, টের পাইয়ে দেব।'

ঢ্যাঙা বলল, 'তুমিও সাবধানে থেকো কিন্তু। আর শোনো, জুতোগুলো আমি বটগাছের কোটরে লুকিয়ে রেখেছি। ওগুলো পুঁতে ফেললে ভালো হতো। পুলিশ যদি—'

ওকে বাধা দিয়ে কালো লোকটা বলল, 'পরে পুঁতে ফেলো বরং। এখন গিয়ে দ্যাখো ছোঁড়টার আবার ঘুম ভেঙে গেল নাকি। ঘুম ভেঙেছে দেখলে আর এক ডোজ ওষুধ খাইয়ে দেবে।'...

শুনতে-শুনতে শানু বারবার শিউরে উঠছিল আতঙ্কে। তার বুক এমন ঢিপ-ঢিপ করছিল যে এখনই বুঝি সে মারা পড়বে। কালো লোকটার হাতের খুদে যন্ত্রটাই বা কী, যা দেখে ঢ্যাঙা লোকটা এমন ভয় পেল, সে বুঝতে পারছিল না। তাছাড়া আরও দুটো ব্যাপার সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। চাষি মকবুল দেখেছে, সেলিম একজনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সাতবুড়ুয়ার দিকে যাচ্ছিল। সেলিম 'তবে রে জুতোচোর' বলে ছুটে গিয়ে কেন আবার সেই জুতোচোরের সঙ্গেই কথা বলতে-বলতে এদিকে আসছিল?

আর, মাত্র একটা সোনার মোহর পেয়ে এরা দুজনে রাজা হয়ে যাবে কীভাবে? একটা সোনার মোহরের আর কতই বা দাম? ঐতিহাসিক মোহরের দাম থাকতে পারে। কিন্তু তাতে কী রাজা হওয়া যায় এ যুগে? তবে বোঝা গেল, এই গোখরো-পাঠান লোকটাকেই কালো জিন বলেছিল আবদুলচাচা। গোখরো-পাঠান যাওয়ার সময় শানুর প্রায় মিটার দুই তফাত দিয়ে—বলতে গেলে নাকের ডগা দিয়েই শুকনো পাতায় জুতোর মসমস শব্দ করতে-করতে চলে গেল।

ঢ্যাঙা লোকটি হাই তুলে তুড়ি বাজাল। অনেকের এ অভ্যাস থাকে, শানু দেখেছে। ঢ্যাঙা এবার পকেট থেকে সিগারেট বের করে সিগারেট ধরাল। তারপর শিস দিয়ে একটা হিন্দি হিট গানের সুর তুলতে-তুলতে যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকে পা বাড়াল। তখন শানু সাবধানে তাকে অনুসরণ করল।

প্রাচীন যুগে এখানে একটা বড় মন্দিরকে কেন্দ্র করে ছটা মন্দির ছিল। মূল মন্দিরটা ভেঙে এই প্রকাণ্ড বটগাছ গজিয়েছে। বিশাল গুঁড়ির সঙ্গে এখনও চাপ-চাপ ইট-পাথরের চাঙড় আটকে আছে। বাকি মন্দিরগুলোর ধ্বংসস্তূপ ঘিরে ঘন জঙ্গল গজিয়েছে। একচিলতে রোদ্দুর ঢোকে না, এমন ছায়াভরা সুড়ঙ্গ পথের মতো একফালি রাস্তায় ঢ্যাঙা লোকটা এবার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে। শানু দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করছিল। মাথার ওপর দুপাশ থেকে ঝুঁকে-পড়া লতাপাতায় লোকটার মাথা ঠেকে গেলে সে রেগে গেল। চাপা গলায় বিরক্তি প্রকাশ করে সে পকেট থেকে একটা ভোজালি-গড়নের ছোরা বের করল। তারপর লতাপাতাগুলো কেটে ফেলল। তখন শানু দেখতে পেল, সামনে একটা গোলাকার স্তূপ বা মাটিতে বসে যাওয়া গম্বুজের মতো ঢিবি রয়েছে। ঢিবির সামনে দরজার মতো ফোকর।

সঙ্গে-সঙ্গে শানুর মনে পড়ে গেল, ইতিহাসের বইতে এমন গড়নের স্থাপত্য সে ছবিতে দেখেছে। এ কী তা হলে কোনও প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ? সাঁচি, ভারহুত এবং আরও বহু জায়গায় যে সব প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ আছে, এটা যেন তাদেরই একটা খুদে প্রতিরূপ।

স্তূপের ফোকরের ভেতরটা আঁধার হয়ে আছে। লোকটা টর্চ জ্বেলে ভেতরে ঢুকে গেল। সেই সুযোগে শানু পা টিপেটিপে এগিয়ে স্তূপের ফোকরের একপাশে সেঁটে রইল। ভেতরে লোকটা গুঁড়ি মেরে বসে টর্চের আলো ফেলেছে। সে এদিকে পেছন ফিরে আছে। কিন্তু টর্চের আলোয় শানু যা দেখল, তার বুক ফেটে কান্না জাগল। অতি কষ্টে সে আত্মসম্বরণ করল।

সেলিমের দুটো হাত এবং দুটো পা দড়িতে বাঁধা। সে চিত হয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো বন্ধ।

লোকটা তাকে কাতুকুতু দিয়ে পরীক্ষা করল, সে সত্যি ঘুমিয়ে আছে, নাকি ঘুমের ভান করে আছে। ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোর কথা শানু কিছুক্ষণ আগে শুনেছে। সে বুঝল, সেলিম সত্যিই ওষুধের প্রভাবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

লোকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এবার এদিকে ঘোরার সঙ্গে-সঙ্গে শানু স্তূপের অন্যপাশে ঘন আগাছা আর লতাপাতায় ঠাসা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

কিন্তু তার ফলে বেশ খানিকটা শব্দও হল। অমনি লোকটা সেদিকে তাকাল। তার চোখে সন্দেহ ঝিলিক দিচ্ছে। সে টর্চের আলো ফেলল।

ভাগ্যিস শানু লতাপাতার আড়ালে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। তাই একটুর জন্য বেঁচে গেল। লোকটা নিশ্চয় তাকে শেয়াল বা অন্য কোনও জন্তু ভেবে এদিকে খুঁজতে এল না। নইলে কী হতো, ভেবে শানুর দম আটকে যাওয়ার অবস্থা একেবারে।

লোকটা আগের মতো গুঁড়ি মেরে এবং শিস দিতে-দিতে হিট হিন্দি ফিল্মের সুর বাজাতে-বাজাতে চলে গেল। তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই শানু আড়াল থেকে বেরিয়ে স্তূপের ফোকরের সামনে এল। দেখল, লোকটা সেই সিগারেটের টুকরোটা ফেলে গেছে এবং তা থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ছায়া প্রগাঢ় বলেই আগুনটুকু জ্বলজ্বল করছে। শানু ঢুকে গেল ফোকরের মধ্য দিয়ে।

স্তূপের ভেতরটা আঁধার হয়ে আছে। ঠাহর করে পা বাড়িয়ে বেচারা সেলিমকে ছুঁয়েই বসে পড়ল। আন্দাজ করে প্রথমে সে তার পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। হাতের বাঁধনও তেমনি মজুবত। খোলা গেল না। তখন সে সেলিমকে দুহাতে ওঠানোর চেষ্টা করল।

কিন্তু সেলিম তার চেয়ে শক্তসমর্থ এবং ওজনেও ভারী। শানু রোগাটে গড়নের ছেলে। সেলিমকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। টানাটানি করে শানু তাকে ফোকরের বাইরে আনতে পারল। কিন্তু অতি কষ্টে বাইরে আনল বটে, এবার কীভাবে ঘন লতাপাতা ভরা ঝোপের ভেতর দিকে তাকে নিয়ে যাবে ভেবে পেল না শানু। তাছাড়া ঝোপগুলো শেয়াকুল-বৈঁচি-নাটাকাঁটায় ঠাসা। শানুরই শরীরের খোলা জায়গাগুলো কাঁটায় ছড়ে রক্তারক্তি হয়ে গেছে। সেলিমকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হলে সেলিমের শরীরের কী অবস্থা হবে?

সে বুঝতে পারছিল, লোকটা নিশ্চয়ই তাদের সেই চুরি করা জুতোগুলো পুঁততে গেছে। জুতোগুলো কেন সে চুরি করেছিল, শানুর মাথায় আসছে না। তবে এ মুহূর্তে শানুর তা নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসতও নেই। সে সেলিমকে কীভাবে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তাই নিয়ে ভেবে আকুল।

হঠাৎ তার চোখ গেল জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটার দিকে।

প্রচুর শুকনো পাতা পড়ে আছে সুড়ঙ্গের মতো রাস্তাটাতে। শানু একরাশ শুকনো পাতা কুড়িয়ে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোর ওপর রেখে জোরে ফুঁ দিতে থাকল। কয়েকবার ফুঁ দেওয়ার পর আগুন ধরল পাতাগুলোতে। তখন সে শুকনো কয়েকটা ডাল কুড়িয়ে ধরিয়ে নিল আগুনে। তারপর সেলিমের পা দুটোর মাঝখানের দড়িতে সাবধানে আগুন ধরাল।

দড়িতে আগুন জ্বলতেই ঝটপট নিভিয়ে ফেলল শানু। এর ফলে সেলিমের দুটো পা মুক্ত হল। তবে প্রত্যেকটা পায়ে খানিকটা দড়ি জড়ানো থেকে গেল।

কিন্তু হাত দুটো পেটের কাছে বাঁধা অবস্থায় আছে। সেলিমকে কাত করে একইভাবে ওর হাতের বাঁধন পোড়োনার চেষ্টা করল শানু।

ততক্ষণে আর এক কাণ্ড ঘটে গেছে। শুকনো পাতার আগুন ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে গেছে এবং ঝোপঝাড় জ্বলতে শুরু করেছে। ধোঁয়ায় দম আটকে যাচ্ছে। শানু কাশতে শুরু করল। সেলিম আর সে দু'জনেই যে এবার ধোঁয়ায় দম আটকে শুধু নয়, আগুনেও জ্যান্ত পুড়ে মরবে।

সেলিমের হাতের বাঁধন পোড়াতে গিয়ে শানুর ততক্ষণে নিজের প্রাণ বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। আগুন থেকে বাঁচার জন্য সে মরিয়া হয়ে কাঁটাঝোপের যে দিকটায় তখনও আগুন ধরেনি, সেদিকটায় সেলিমকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। কাঁটায় দুজনেরই শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

কিন্তু সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছতেই হঠাৎ তাদের ওপর এক ঝলক টর্চের আলো এসে পড়ল। অমনি শানু আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার পায়ের কাছে সেলিম পড়ে রইল। আর প্রতি মুহূর্তে শানু অপেক্ষা করতে থাকল একটা ধারালো ছোরা এসে তার গলায় বসবে এবং...

শানু চোখ বুজে ফেলল।...

॥ পাঁচ ॥

তারপর শানুর কানে এল, কেউ বলছে, 'ব্রেভো ডার্লিং! এই তো চাই!'

শানু চোখ খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। টর্চের আলো নিভে গেছে। কিন্তু জঙ্গলের ছায়ার ভেতর হেমন্তের দিন শেষের কুয়াশা ভরা ধূসরতায় তার সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় টুপি, পরনে জ্যাকেট আর প্যান্ট, কাঁধে ঝুলন্ত ক্যামেরা এবং বুকে ঝুলন্ত বাইনোকুলার।

শানু বিশ্বাস করতে পারল না নিজের চোখকে। সে স্বপ্ন দেখছে না তো? সে তেমনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

তখন কর্নেল এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলেন, 'শানু! শানু!'

শানুর হুঁশ ফিরল। সে কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলে উঠল 'কনের্ল! আপনি?'

কর্নেল বললেন, 'এখন আর কোনও কথা নয়। চলে এসো এখানে থেকে,' বলে শানুর হাতে টর্চটা গুঁজে দিলেন। তারপর সেলিমকে অনায়াসে দুহাতে তুলে কাঁধে চাপিয়ে পা বাড়ালেন।

ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে অনেকটা চলার পর সেই বটগাছের তলার পৌঁছে কর্নেল ডাকলেন, 'করিম! করিম!'

করিমের সাড়া পাওয়া গেল গুঁড়ির আড়াল থেকে, 'আছি স্যার!'

কর্নেল বললেন, 'তোমার আসামিকে নিয়ে এখানে এসো।'

শানু অবাক হয়ে দেখল, করিম সেই ঢ্যাঙা লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে তার সোয়েটারের কলার খামচে ধরে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে আসছে। করিমের হাতে লোকটার সেই ভোজালি গড়নের ছোরা।

কর্নেল বললেন, 'আসামিকে আমার জিম্মায় রেখে তুমি এখনই সেলিমকে সোজা হেলথ-সেন্টারে নিয়ে যাও। তারপর বাড়িতে খবর দেবে। যাও, দেরি কোরো না।'

করিম ছোরাটা শানুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'নাও বাপধন! বেগতিক দেখলেই এই পাজি গদাইচন্দরের পেটে দেবে গোটাকতক খোঁচা মেরে। কেমন?' বলে সে সেলিমকে কর্নেলের কাঁধ থেকে নিজের কাঁধে নিল। তারপর দ্রুত এগিয়ে চলল গ্রামের হেলথ-সেন্টারের দিকে।

কর্নেল চেঁচিয়ে তাকে বলে দিলেন, 'দরকার হলে হেলথ-সেন্টার থেকে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে সদরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বুঝলে তো করিম?'

করিম চেঁচিয়ে জবাবা দিল, 'বুঝেছি স্যা-অ্যা-অ্যার!'

এবার কর্নেল ঢ্যাঙা লোকটা অর্থাৎ গদাইচন্দ্রের সোয়েটারের কলার ধরে বললেন, 'চলো হে গদাইচন্দর, দেখি, নবাবি মসজিদে তোমার স্যাঙাতের কী অবস্থা হল।'

গদাই হাউমাউ করে কেঁদে বলল, 'আমার কোনও দোষ নেই স্যার! গোখরো-পাঠানই আমাকে লোভ দেখিয়ে—'

কর্নেল তার গালে থাপ্পড় কষে বললেন, 'চুপ। যা বলার থানায় বলবে।'

খোলা জায়গায় পৌঁছে কর্নেল বললেন, 'শানু! বলো, কীভাবে তুমি সেলিমের খোঁজ পেলে।'

শানু সংক্ষেপে সবটা বলল। তারপর জিগ্যেস করল, 'আপনি বলুন এবার।'

কর্নেল বললেন, 'জঙ্গলের ভেতর ধোঁয়া দেখে আমি ছুটে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছ আর সেলিম তোমার পায়ের কাছে পড়ে আছে।'

শানু বলল, 'তার আগের ব্যাপারটা বলুন, কর্নেল!'

কর্নেল গদাইকে নিয়ে যেতে-যেতে বললেন, মকবুল হচ্ছে করিমের পিসতুতো দাদা। করিম খুব চালাক লোক। মকবুলের কাছে এই লোকটার চেহারার বিবরণ শুনেই বুঝতে পেরেছিল, লোকটা কে। সেলিম গদাইকে চিনত বলেই তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। তবে মকবুল একে চেনে না।'

শানু অবাক হয়ে বল, 'সেলিমের কাণ্ড দেখে অবাক লাগছে। কেন সে—'

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'সেলিম সুস্থ হলে সেটা জানা যাবে তার মুখ থেকে। তবে গদাইকে তোমারও চেনা উচিত।'

শানু দিন শেষের ধূসর আলোয় ঢ্যাঙা লোকটার মুখের দিকে তাকাল। তারপরই সে লাফিয়ে উঠল। 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে কর্নেল! এ তো সেই গদাই-চোর। রায়বাবুদের বাড়িতে থাকত। টাকা চুরি করে নিপাত্তা হয়েছিল। সম্পর্কে নাকি নুটু রায়মশাইয়ের ভাগ্নে। একবার আমাদের বাড়িও চুরি করতে ঢুকেছিল। ধরা পড়ে—'

বাধা দিয়ে গদাই বলল, 'বাজে কথা বোলো না। আমি গিয়েছিলাম তোমার বাবার কাছে একটা কাজে। খামোকা সন্দেহ করে আমাকে চোর বলে মেরেছিলে তোমরা।'

শানু ভেংচি কেটে বলল, 'শাট আপ! রাত দুটোয় পাঁচিল ডিঙিয়ে বাবার কাছে কাজে গিয়েছিলে? দেব এক খোঁচা পেটে।'

শানু সেই বাঁকা ছোরাটা বাগিয়ে খোঁচা মারার ভান করলে গদাই বলল, 'ওরে বাবা। এ যে দেখছি মহাবিচ্ছু! স্যার, স্যার! দেখছেন আমাকে স্ট্যাব করতে আসছে?'

কর্নেল বললেন, 'চুপ। একটা কথা বললে সত্যি শানু তোমার পেট ফাঁসাবে।'

শানু হাসতে-হাসতে বলল, 'আচ্ছা কর্নেল, আপনি করিমদার সঙ্গে সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলে কেন এসেছিলেন বললেন না কিন্তু!'

কর্নেল বললেন, 'আমিই একা আসছিলাম ওদিকে। হঠাৎ করিম পিছু ডাকল। ঘুরে দেখি, সে দৌড়ে আসছে। সে এসে তার মামাতো ভাই মকবুলের কাছে শোনা কথাটা বলতে এসেছিল আমাকে। যাই হোক, ওর কথা শোনার পর ভাবলাম, অচেনা জায়গায় যাচ্ছি। করিমকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভালো। সে স্থানীয় লোক।'

শানু কথার ওপর বলল, 'কিন্তু হঠাৎ সাতবুড়ুয়ায় কেন আসছিলেন?'

কর্নেল বললেন, 'তুমি যেজন্য এসেছিলে, সেজন্যও বটে, তবে তার চেয়ে জরুরি একটা কারণও ছিল। পরে জানতে পারবে। তো, আমি আর করিম বটতলায় পৌঁছে শুনি, খসখস ধুপধুপ শব্দ হচ্ছে কোথায়। দুজনে চুপি-চুপি এগিয়ে গিয়ে দেখি বটগাছটার গুঁড়ির কোটরে পিছু ফিরে এই গদাইচন্দ্র ওই ছোরাটা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। তার পাশে আমাদের সেই হারানো তিন জোড়া জুতো। বুঝলুম, জুতোগুলো লুকিয়ে ফেলতে চায়। আমি কিছু করার আগেই করিম পা টিপেটিপে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গদাইয়ের ওপর। তারপর ওর পিঠে বসে বলল, একটা দড়ি হলে ভালো হতো। আমার পকেটে নাইলনের দড়ি থাকে, যখনই জঙ্গলে যাই। গাছ থেকে অর্কিড সংগ্রহ আমার হবি। ফাঁস ছুঁড়ে অর্কিডের ঝাড় টেনে উপড়ে নামাই। এ বয়সে আর যাই পারি, গাছে চড়াটা বরদাস্ত হয় না।'

শানু হাসতে লাগল, 'বুঝেছি। করিমদা একে বেঁধে ফেলল। তারপর আপনি ধোঁয়া দেখতে পেয়ে ওদিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন।'

কথা বলতে-বলতে চষা জমি পেরিয়ে ওঁরা খেলার মাঠে পৌঁছলেন। তখন একদল ছেলে ক্রিকেট খেলে সবে চলে যাচ্ছে। আবছা আঁধার জমে উঠেছে। ছেলেগুলো এদিকে তাকাল না। তারা চলে গেলে কর্নেল গদাইকে নিয়ে খেলার মাঠের পূর্বপ্রান্তে গেলেন। শানুও গেল। তারপর কর্নেল শিস দিলেন তিনবার। অমনি জঙ্গলের দিক থেকে তিনবার শিস শোনা গেল।

তারপর একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল। শানু দেখল, আর কেউ নয়, থানার দারোগা মহিউদ্দিন। তিনি এসে টর্চের আলো জ্বেলে গদাইকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ আবার কে?'

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, 'গোখরো-পাঠানের সঙ্গী। কিন্তু আপনাদের খবর কী বলুন?'

মহিউদ্দিন বললেন, 'ও মহা ধড়িবাজ। জাল মোহরটা নবাবি মসজিদের ভেতর কাগজে মুড়ে রেখেছিলাম। গোখরো-পাঠান এল। ভেতরে ঢুকল। অমনি আমরা গিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্য! গোখরো-পাঠান যেন সত্যিই একটা সাপ। সে যেন কোনও গর্তে বা ফাটলে ঢুকে পড়েছে! তাকে আর খুঁজেই পেলাম না।'

কর্নেল বললেন, 'মসজিদের চারদিক ঘিরে রাখা উচিত ছিল।'

'রেখেছিলাম। চারদিকে ঝোপের ভেতর আর্মড কনস্টেবলরা লুকিয়ে ছিল। তারা ওকে আসতে দেখেছে। কিন্তু যেতে দেখেনি।' মহিউদ্দিন ক্ষোভের সুরে বললেন, 'বোকামি হয়ে গেছে। ওকে আসতে দেখামাত্র ঘিরে ধরাই উচিত ছিল। আসলে ভয় ছিল জঙ্গুলে জায়গা তো। সাড়া পেলেই সহজে গা-ঢাকা দেবার চান্স পাবে। কিন্তু মসজিদের ভেতর ঢুকলে তাকে সহজেই কোণঠাসা করা যাবে।'

কর্নেল বললেন, 'জিতেনবাবু কোথায়?'

মহিউদ্দিন বললেন, 'মসজিদের ভেতর সুড়ঙ্গ বা গুপ্তপথ আছে কি না খুঁজছেন।'

কর্নেল বললেন,' আপনি এক কাজ করুন। দুজন কনস্টেবলকে ডেকে এই আসামিকে থানায় লক-আপে রাখার ব্যবস্থা করুন শিগগির।'

মহিউদ্দিন হুইসল বাজালেন। কয়েকজন পুলিশ ঝোপঝাড়ের ভেতর দৌড়ে এল ধুপধুপ শব্দ তুলে। দুজনের হাতে গদাইচন্দ্রের ভার দিয়ে মহিউদ্দিন বললেন, 'তোমরা একে থানায় নিয়ে যাও। সাবধান! লকআপে ঢুকিয়ে রাখবে।'

ওরা গদাইকে নিয়ে চলে গেলে কর্নেল বললেন, 'চলুন। জিতেনবাবু কদ্দূর এগোলেন দেখা যাক।'...

পোড়ো-মসজিদের ভেতর টর্চের আলোয় জিতেন্দ্রনাথ এবং আরও দুজন পুলিশ অফিসার তখনও গোখরো-পাঠানের পালানোর পথ খুঁজে হন্যে হচ্ছেন।

কর্নেলকে দেখে জিতেন্দ্রনাথ বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেল। লোকটা যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারদিকের দেয়াল তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম একটা ফাটল পর্যন্ত নেই। দক্ষিণ দিকটা তো দেখছেন। ভেঙে পড়ে নিরেট দেওয়াল হয়ে আছে। ওপরে সামান্য ফাটল আছে, ওই দেখুন। ওখান দিয়ে ভেতরে দিনের আলো ঢোকে মনে হচ্ছে। কিন্তু ওই ফাটল দিয়ে বড়জোর একটা সাপ বা ছুঁচো ঢুকে যেতে পারে! মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয় কি?'

'হ্যাঁ, অসম্ভব। তবে—' কর্নেল থেমে গেলেন।

জিতেন্দ্রলাল বললেন, 'তবে কী কর্নেল?'

কর্নেল শানুর হাত থেকে তাঁর টর্চটা নিয়ে মাথার ওপর গম্বুজের খোঁদলে আলো ফেললেন। অমনি সবাই চমকে উঠে দেখতে পেলেন, প্রকাণ্ড একটা বাদুড়ের মতো গম্বুজের খোঁদলের একটা খাঁজে দুই পা রেখে ভেতরে ফুঁড়ে আসা একগুচ্ছের শেকড় আঁকড়ে ধরে ঠিক বাদুড়ের মতোই ঝুলে আছে একটা লোক।

দেখামাত্র শানু চেঁচিয়ে উঠল, 'গোখরো-পাঠান। গোখরো-পাঠান!'

জিতেন্দ্রনাথ রিভলভার তাক করে বললেন, 'এই পাজি! নেমে আয়। নইলে গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলব তোকে।'

মহিউদ্দিন হাসতে-হাসতে বললেন, 'ব্যাটাচ্ছেলের বুদ্ধি আছে বটে। আমরা ভাবতেই পারিনি মাথার ওপর—'

তাঁর কথা শেষ হল না। ধপাস করে প্রচণ্ড শব্দে গোখরো-পাঠান মেঝেয় পড়ে গেল। টর্চের আলোয় দেখা গেল, তার মুখের দু'পাশে গেঁজলা বেরোচ্ছে। ছটফট করতে-করতে বেঁকে গেল তার শরীর। তারপর এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল নাক-মুখ থেকে। তার শরীরটা আবদুলের মতোই স্থির হয়ে গেল। কর্নেল বললেন, 'সুইসাইড করল গফুর-পাঠান,' বলেই ঝুঁকে ওর পায়ের কাছে কী একটা কুড়িয়ে নিলেন। শানু জিনিসটা দেখেছিল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন, 'হুঁ এটা এক ধরনের ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ। এই দেখুন, দুটো সূক্ষ্ম সুচ আছে যন্ত্রটার মুখে। ভেতরে আছে মারাত্মক সাপের বিষ। আফ্রিকার জঙ্গলে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষধর সাপ ব্ল্যাক মাম্বার বিষ। ঠিক এরকম একটি সিরিঞ্জ আমি কোডো আইল্যান্ডে দেখেছিলাম। সেও ছিল এক মারাত্মক দাগি ক্রিমিনাল। তাকে সবাই বলত ব্ল্যাক মাম্বা!'

সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর জিতেন্দ্রনাথ আস্তে বললেন, 'আর একে সবাই বলত, গোখরো-পাঠান।'...

॥ ছয় ॥

পরদিন সকালে মির্জাসায়েবের ড্রইংরুমে বসে কফি খেতে-খেতে কথা বলছিলেন মির্জাসায়েব এবং কর্নেল। সেলিমকে সদর হাসপাতালে পাঠানোর দরকার হয়নি। নবাবগঞ্জ হেলথ-সেন্টারেই সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। রাত্রেই তাকে বাড়ি আনা হয়েছে।

সকালে সে আগের মতো চাঙ্গা। লনে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সে শানুর সঙ্গে গল্প করছে। তবে তার হাতের কবজি আর পায়ের গোড়ালির ওপর দড়ির দাগগুলো এখনও স্পষ্ট।

কর্নেল বললেন, 'আবদুল মরার সময় সা-সা বলেছিল। আমরা ভেবেছিলাম সে সাপের কামড়ের কথা বলছে। আসলে সে সাতবুড়ুয়ার কথাই বলতে চেয়েছিল। স্মিথের বইতে দেখলাম, ওটা সপ্তশিবের মন্দির নয়। সপ্তবুদ্ধ মন্দির। অন্তত তেরো-চোদ্দশ বছর আগে ওখানে ছিল সপ্তবুদ্ধ মন্দির। ওই সপ্তবুদ্ধ শব্দ পরবর্তী যুগে লোকের মুখে সপ্তবৃদ্ধ থেকে অপভ্রংশে সাতবুড়ো বা স্থানীয় ভাষারীতিতে সাতবুড়ুয়া হয়ে গেছে।'

মির্জাসায়েব বললেন, 'হ্যাঁ। বুদ্ধমন্দিরকে শিবমন্দির বলে পরবর্তী যুগে মনে করা হতো—ইতিহাসের কেতাবে পড়েছি। বুদ্ধমূর্তিকেও শিবমূর্তি মনে করা হয় বহু জায়গায়। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?'

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'মকবুল ও শানুর মুখে সাতবুড়ুয়া কথাটা শুনেছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়েছিল, আবদুলের এই মোহরের উলটো পিঠে ফার্সিতে লেখা আছে ঃ

'সাত বৃদ্ধ যেখানে/মানিক ফলে সেখানে।'

'তখনই সন্দেহ হয়েছিল এটা একটা সংকেতবাক্য। সাতবুড়ুয়ার ওখানেই কোথাও পনেরো শতকের ঐতিহাসিক তুর্কি আমলের শাসক খানখানান লতিফ খান বহু ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছিলেন কী? আতশকাচে মোহরটা পরীক্ষা করার সময় ফার্সি প্রবচনের নিচে সাতটা গোল চিহ্ন চোখে পড়েছিল। একটা গোল চিহ্ন কেন্দ্রে খোদাই করা। তার মধ্যে একটা ক্রসের চিহ্ন। লতিফ খান গৌড়ের বাদশাহের অধীনে শাসনকর্তা ছিলেন। পাছে বাদশাহ তার ধনরত্ন আটক করেন, সেই ভয়ে তিনি স্তূপাকৃতি সপ্তবুদ্ধস্তূপের মূল স্তূপটির তলায় সেগুলি পুঁতে রেখেছিলেন বলেই আমার ধারণা।'

মির্জাসায়েব বললেন, 'কিন্তু সেখানে তো এখন বটগাছ। স্তূপের চিহ্নই নেই।'

কর্নেল বললেন, 'কলকাতায় ফিরে কেন্দ্রীয় প্রত্ন দফতরের কর্তাদের খবরটা দেব। তাঁরা গাছটা কেটে খোঁড়াখুঁড়ি করে খুঁজে দেখুন সত্যি মাটির তলায় গুপ্তধন আছে না কি।'

মির্জাসায়েব নড়ে বসলেন, 'বুড়ো হয়ে স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে। ওখানে নাকি অনেকে মোহর কুড়িয়ে পেত শুনেছি। কিন্তু আবদুল কোথায় পেল এই মোহর?'

কর্নেল বললেন, 'এটাই মূল মোহর, যাতে লতিফ খান বংশধরদের জন্য সংকেতবাক্য আর সংকেতচিহ্ন খোদাই করেছিলেন। আমার ধারণা, আবদুল সম্ভবত লতিফ খানেরই বংশধর।'

মির্জাসায়েব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমরাই নাকি তাঁর বংশধর। আবদুল কেমন করে—উহুঁ! অসম্ভব।'

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, 'মির্জাসায়েব! একই মানুষের বংশধর কত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ। আপনি কি জানেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার মেয়ের বংশধরদের একজন ছিলেন হাওড়া রেলস্টেশনের সাধারণ কর্মী, আর একজন খাটালের গোরু-মোষের দুধ বেচতেন, অন্য একজন ঘোড়াগাড়ির কোচোয়ান ছিলেন? এ গল্প নয়, গবেষকরাই খুঁজে বের করে গেছেন। কাজেই আপনার মতো আবদুল বেচারাও খানখানান লতিফ খানের বংশধর হবে, তাতে অসম্ভব কিছু নেই।'

মির্জাসায়েব শুধু বললেন, 'আপশোস! হতভাগা আবদুল!' তাঁর চোখের কোনায় একফোঁটা জল দেখা যাচ্ছিল।

শানু বলল, 'তুই কী বোকা বল তো সেলিম! গদাইকে দেখেই তুই আমাদের কথা ভুলে, এমনকী জুতোর কথা ভুলে ওর সঙ্গে সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলি!'

সেলিম বলল, 'গদাই যে বলল জুতো চুরি করে একটু তামাশা করবে। বলল, এসো না, আমরা জুতো লুকিয়ে রাখব সাতবুড়ুয়ার। ওরা আমাদের খুঁজে হন্যে হোক না, পরে দুজনে টুকি দেব। ব্যস! লুকোচুরি খেলাটা দারুণ জমে উঠবে। তুই তো জানিস, গদাইদা আবদুলের চাইতেও মজার লোক।'

'মজার লোক', শানু বিরক্ত হয়ে বলল। 'চোর তা জানিস না?'

সেলিম বলল, 'কে জানে যে ওখানে গিয়ে হঠাৎ কালো জিনের পাল্লায় পড়ব।'

শানু হাসল, 'তুই তাহলে এতক্ষণ কী শুনলি? ও তো গোখরো-পাঠান।'

এইসময় কর্নেল বেরিয়ে এসে ডাকলেন, 'সেলিম, শানু, আজও কী তোমাদের স্কুলের ছুটি?'

সেলিম বলল, 'আজ আমাকে স্কুলে যেতে বারণ করেছেন দাদু।'

শানু বলল, 'আজ আমারও স্কুল যেতে ইচ্ছে করছে না!'

কর্নেল বললেন, 'তাহলে চলে এসো। আজ বরং সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলেই প্রজাপতি ধরতে যাই। চাই কী, গুপ্তধনও আবিষ্কার করে ফেলতে পারি। চলে এসো, ডার্লিংস!'

দুই বন্ধু কর্নেলের সঙ্গে গল্প করতে-করতে সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলের দিকে চলল।

কর্নেলের জার্নাল থেকে—১

ভোর ছটায় ছাদের শূন্যোদ্যানে গিয়ে দেখলাম, অ্যারিজোনা থেকে আনা ক্যাক্টিতে সুন্দর কিছু ফুল ফুটেছে। আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলাম। প্রায় চার মাসের সাধনার সিদ্ধি। বুড়ো না হলে ধেই-ধেই করে না হোক, ব্রেকড্যান্স শুরু করে দিতাম। এই প্রজাতির ক্যাকটাসের নাম একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনি। দেখতে কতকটা গোল কাঁঠালের মতো। গ্রীষ্মে একছিটে বৃষ্টি হলে ফুল শিগগির ফুটে ওঠে। লাল টুকটুকে পাপড়ির মধ্যে হলুদ শীষ। শীষের মাথায় কালচে টুপি। হাঁটু মুড়ে বসে আতসকাচ দিয়ে পাপড়ির কিনারা পরীক্ষা করতে থাকলাম। অ্যারিজোনার রাজধানী ফিনিক্সে হর্টিকালচার ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডাঃ মিডলটন বলেছিলেন—পাপড়ির কিনারায় যদি সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ে, তা হলে জানবেন ভাইরাস সংক্রামিত হয়েছে।

অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। মনটা আরও খুশিতে ভরে উঠল। সূর্য উঠলেই কয়েকটা ফোটো নিতে হবে। মে মাসের শেষ সপ্তাহ। সূর্য উঠলেও পুবের কয়েকটা হাইরাইজ বাড়ির জন্য রোদ্দুর পৌঁছুতে দেরি হয়। বিষদৃষ্টিতে বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় ষষ্ঠী এসে বলল,—বাবামশাই! ফোং!

বিরক্ত হয়ে বললাম,—হতভাগা! তোকে কতদিন না বলেছি, দুটো থেকে আটটার মধ্যে কেউ টেলিফোন করলে বলবি আমি বাড়ি নেই?

ষষ্ঠী কাঁচুমাচু মুখে বলল—সে ফোং নয় বাবামশাই, জয়ন্ত দাদাবাবুর ফোং।

—ওকে আসতে বলে দে। —বললাম তো। কিন্তু দাদাবাবু বললেন খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। ওঁদের কাগজের অফিসের কে নাকি মারা পড়েছেন।

এই সাতসকালে কার মৃত্যু সংবাদ দিতে জয়ন্ত ফোন করেছে? নিছক মৃত্যু হলে কেনই বা ফোন করবে। খুনখারাপি নয় তো?

ড্রয়িংরুমে নেমে এসে ফোন ধরে বললাম,—গুড মর্নিং, ডার্লিং।

—ব্যাড মর্নিং, ওল্ড বস্!

—সরি জয়ন্ত। সকালবেলাটা ব্যাড করে দিও না। তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?

—আর্মেনিয়ান চার্চের কাছে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। আপনি এখনই চলে আসুন। পুলিশ এসে গেছে। পুলিশকে এখনই বডি না নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছি—

—বডি? কার বডি?

—আমাদের কাগজের একজন ফোটোগ্রাফার ছিলেন। নাম শুনে থাকবেন। প্রচেত রায়। বয়সে খোকা বললেই চলে।

—তা খোকাটির বডি পড়ল কী করে?

—ওঃ কর্নেল। দিস ইজ সিরিয়াস। গত রাত্তিরে দশটা নাগাদ প্রচেত দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিস থেকে বের হয়। রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি। ভোরবেলা চার্চের পেছন দিকে একটা পোড়ো বাড়ির ভেতর ওকে মরে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকেরা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ওর পকেটে আইডেন্টিটি কার্ড দেখে অফিসে ফোন করে। অফিসের দারোয়ান আমাকে ফোন করে। কারণ ক্রাইম স্টোরি আমি কভার করি। তো—

প্রচেত রায়ের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে কী?

—হয়েছে। তবে প্রচেতের দাদা-বউদি ছাড়া আর কেউ নেই ও দাদার কাছে থাকত।

—জয়ন্ত, আমি গিয়ে কী করব?

—কর্নেল! আপনি এলেই বুঝতে পারবেন, ব্যাপারটা রহস্যজনক।

—একটু আভাস দাও।

—বডিতে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই।

—তা হার্ট অ্যাটাক।

—ঠিক আছে। আপনাকে আসতে হবে না।

জয়ন্ত ফোন ছেড়ে দিল। বুঝলাম, আমার ওপর চটে গেছে। কিন্তু ও তো জানে, আমি নিছক শখের গোয়েন্দা নই। যত্রতত্র কারও লাশ পড়লেই আমি নাক গলাতে যাই না। আসলে জয়ন্ত তার অফিসের লোকের এরকম হেলা-ফেলায় মৃত্যুর ঘটনা বরদাস্ত করতে পারছে না।

কিন্তু সমস্যা হল, জয়ন্তকে আমি পুত্রাধিক স্নেহ করি, যদিও আমরা পরস্পর বন্ধু। যুবকের সঙ্গে বৃদ্ধের বন্ধুত্ব হতে তো বাধা নেই। এযাবৎ অসংখ্য রহস্যময় ঘটনায় জয়ন্ত আমার সহকারীর ভূমিকা পালন করেছে। কাজটা বোধহয় ঠিক করলাম না। অন্তত আমার স্নেহ এবং বন্ধুত্বের খাতিরে ওর ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল।

দোনমনায় পড়ে গেলাম। একটু পরে না যাওয়াই সব্যস্ত করলাম। সবখানে গোয়েন্দাগিরি করার মানে হয় না। ইতিমধ্যে এদিককার খবরের কাগজগুলো এসে গেল। ষষ্ঠীকে বললাম,—ছাদে যাচ্ছি। কফি দিয়ে আসবি।

কাগজগুলো নিয়ে ছাদে গেলাম। প্রথমেই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। প্রথম পাতার একটা বড় খবরে চোখ গেল। ফ্ল্যাগ লাইনে ছাপা হয়েছে :

চন্দ্রপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচন বাতিল।
পাগলের গুলিতে নির্দল প্রার্থী হত।
আততায়ীর গুলিতে পাগলও হত।
নিজস্ব সংবাদদাতার খবর

খবরটা সংক্ষেপে এই :

শিল্পনগরী চন্দ্রপুর বিধাননগর আসনটি বিধায়ক রামহরি ব্যানার্জির মৃত্যুতে খালি হয়েছিল। তাই উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোট গ্রহণের তারিখ দোসরা জুন। নির্দল প্রার্থী পরমেশ চক্রবর্তী গতকাল বিকেলে চৌমাথায় জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। তখন হঠাৎ কারা সভায় হইহল্লা শুরু করে। মাইকের তার কেটে দেয়। পটকা ফাটায়। এই বিশৃংখলার সময় এক বৃদ্ধ উন্মাদ ব্যক্তির রিভলভারের গুলিতে পরমেশবাবুর মৃত্যু হয়। কিন্তু তারপরই সেই উন্মাদ আততায়ীকে কেউ মাথার পিছনে গুলি করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা উন্মাদ লোকটিকে পরমেশবাবুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে

দেখেছেন। কিন্তু সেই উন্মাদের আততায়ীকে কেউ দেখেননি। তাই প্রথমে সবার ধারণা হয়েছিল, পরমেশবাবুকে মেরে উন্মাদ আততায়ী আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেউ নিজের মাথার ঠিক পেছনে এভাবে গুলি ছুড়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। ঘটনাস্থলে পরপর দুবার গুলির শব্দ শোনো গেছে।...

খবরটা পড়ে মনে হল, উন্মাদ আততায়ীকে যে মেরেছে সে পরমেশবাবুর বডিগার্ড হতেও তো পারে। কিন্তু সংবাদদাতা সে-কথা উল্লেখ করেননি। বিশেষ কোনও পয়েন্টও খবরে নেই। আসলে খবর লেখার কাজটা যেমন-তেমন দায়সারাভাবে করা হয় আমাদের দেশে।

আবার খুঁটিয়ে পড়লাম। তারপর মনে হল, পরমেশবাবুর কোনও বডিগার্ড থাকলে এতে কোনও রহস্য নেই, কিন্তু বডিগার্ড না থাকলে?

না থাকলে যে লোকটি আততায়ীকে মেরেছে, সে যদি পরমেশবাবুর শত্রুপক্ষের লোক হয়, তাহলে সে নিজেই তো পরমেশবাবুকে মারতে পারত।

হ্যাঁ, মারতে পারত। কিন্তু তার ধরা পড়ার চান্স ছিল। মঞ্চে পরমেশবাবু ভাষণ দিচ্ছিলেন। তার আততায়ী মঞ্চে ওঠেনি। নিচে থেকে গুলি করে। হইচই বেধে ছিল মঞ্চের নিচে।

উঁচু জায়গা এবং নিচু জায়গা এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। নিচের কাউকে হট্টগোলের মধ্যে ভিড়ের ভেতর মাথার পেছনে আগ্নেয়াস্ত্রের নল ঠেকিয়ে গুলি করলে দ্বিতীয় আততায়ীকে কারও দেখতে না পাওয়াই সম্ভব। এদিকে পরমেশবাবুর বডিগার্ড থাকলে সে পরমেশবাবুর কাছে মঞ্চের ওপরই থাকবে।

আর একটা কথা ঃ পরপর দুবার গুলির শব্দ এবং দুটি মৃত্যু।

এতক্ষণে হাইরাইজ বাড়ির ওপর সূর্য উঁকি দিচ্ছে। ক্যামেরায় একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনির অসামান্য সুন্দর ফুলগুলোর ছবি তুলতে মন দিলাম।...

ব্রেকফাস্টের পর ড্রয়িং রুমে বসে প্রখ্যাত মার্কিন পত্রিকা 'নেচার'-এর পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন। নমস্কার করে বললেন,—আপনিই কি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার?

বললাম,—আপনার সন্দেহের কোনও কারণ আছে?

ভদ্রলোক একটু বিব্রত হয়ে বললেন,—না-মানে, কাগজে আপনার অনেক কীর্তিকলাপ পড়েছি। তাই বলছিলাম—

তাঁর কথার ওপর হাসতে-হাসতে বললাম,—ভেবেছিলেন আমি যুবক। কিন্তু চোখে দেখছেন আমিও নেহাত বুড়োমানুষ। মুখে সাদা দাড়ি এবং মাথায় টাক। তাই ভাবছেন, এই বুড়ো লোকটি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ঠাকুর্দা!

আমার কৌতুকে ভদ্রলোক আরও বিব্রত হয়ে বললেন,—না—মানে...

—আপনার পরিচয় দিন এবার। তারপর বলুন কেন এসেছেন?

ভদ্রলোক এতক্ষণে বসলেন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। বেশ শক্তসমর্থ গড়নের মানুষ। হাতে একটা ব্রিফকেস। বললেন,—আমার নাম তারক রায়। আসছি চন্দ্রপুর থেকে।

—চন্দ্রপুর! মানে, গতকাল যেখানে ভোটের নির্দল প্রার্থী পরমেশ চক্রবর্তী খুন হয়েছেন?

তারকবাবু বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি পরমেশবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি। পরমেশবাবুর একটা ইলেকট্রিক বালব তৈরির কারখানা ছিল। কারখানাটা ভালো চলছিল না। ওঁর চন্দ্রা বালব মার্কেট পায়নি। তাই উনি রাজনীতি করতে নামেন। কিন্তু বড্ড স্পষ্টভাষী মানুষ। প্রচণ্ড নীতিবাগীশ। তাই কোনও রাজনৈতিক দলে পাত্তা পাননি। অগত্যা নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান।

কথা বাড়ছে দেখে বললাম—সংক্ষেপে বলুন, কেন এসেছেন আমার কাছে?

তারকবাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন,—ব্যাপারটা—

একটু আশ্চর্য মনে হয়েছে আমার। গতকাল বিকেলে মিটিঙে ওঁকে গুলি করে মারা হয়েছে। কাগজে খবর দেখে থাকবেন। কিন্তু গতকাল সকালে উনি আমাকে কথায়-কথায় হঠাৎ বললেন,—তারক! আমার মনে হচ্ছে, আমার কোনও সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে। কিন্তু ভোটে যখন দাঁড়িয়েছি এবং নমিনেশন প্রত্যাহারের তারিখ পেরিয়ে গেছে, তখন আর পিছু হটছি না। যা থাকে বরাতে লড়ব। তবে যদি আমার কোনও বিপদ হয়, তুমি জানবে তার জন্য দায়ী কিশান-মজদুর-পার্টির নেতা অভয় হাজরা। সে আমাকে শাসিয়েছে। তো বিকেলে পরমেশদা মারা পড়লেন। আমি পুলিশকে কথাটা বললাম। পুলিশ বলল, বিনা প্রমাণে অভয় হাজরার মতো ভি. আই. পি.-কে আসামি করতে পারব না। বুঝতেই তো পারছেন স্যার, হাজরাবাবুর প্রতিপত্তি আছে। তাই আমি আপনাব শরণাপন্ন হয়েছি।

এ পর্যন্ত শুনে আমি বললাম,—আমাকে কি প্রাইভেট গোয়েন্দা ভেবেছেন? দেখুন তারকাবাবু আমি ঠিক সে রকম গোয়েন্দা নই। তবে হ্যাঁ, রহস্যের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু আপনার এই কেসে আমি কোনও রহস্য দেখছি না।

তারকবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—রহস্য যে একেবারে নেই, তা নয়। আততায়ীর রিভলবারটা পাওয়া গেছে ঘটনাস্থলে। পুলিশ দেখেছে তাতে মোটে দুটো গুলি ভরা আছে। চারটে গুলি খরচ হয়েছে। এর মধ্যে একটা গুলি পরমেশবাবুর হার্টে বিঁধেছে। আর তিনটে গুলি কী হল?

বললাম,—টার্গেট প্র্যাকটিস করে তিনটে গুলি খরচ করে থাকতে পারে আততায়ী।

—তা পারে। কিন্তু স্যার, আততায়ী লোকটা যে একটা বদ্ধ পাগল।

—পাগল?

—হ্যাঁ স্যার! কিনু পাগলা বলে জানি ওকে। বাসটার্মিনাসে থাকত। রোগা পাঁকাটি শরীর।

—তাকেই তো লোকেরা দেখেছে গুলি ছুড়তে?

তারকবাবু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন,—হ্যাঁ। কিন্তু কিনু পাগলাকেই বা কে গুলি করে মারল?

—পরমেশবাবুর বডিগার্ড ছিল?

তারকবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—না স্যার! পরমেশদা জেদি লোক ছিলেন বটে, তবে ওঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড। নীতিবাগীশ ছিলেন তা-ও বলেছি।

—রিভলবারটা কি কিনু পাগলার হাতে বা হাতের কাছাকাছি পাওয়া গেছে?

তার হাতেই ধরা ছিল স্যার!

—হাতে ধরা ছিল?

হ্যাঁ। —তারকবাবু আস্তে বললেন : তখন সভায় হইচই বাধিয়েছিল অভয় হাজরার লোকেরা। ভিড় আর হট্টগোলের মধ্যে হঠাৎ খুনোখুনি। কাজেই—

তারকবাবু হঠাৎ চুপ করলে বললাম,—তখন সময় কটা?

—বিকেল পাঁচটা সওয়া পাঁচটা। জায়গাটা একটা চৌমাথা। এমনিতেই ভিড় থাকে সারাক্ষণ।

—মঞ্চে কে-কে ছিলেন মনে পড়ছে?

—আমি, পরমেশদা, প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার রমেশবাবু এবং জনা দুই সাংবাদিক। একজন স্থানীয়, অন্যজন কলকাতার। পরমেশদা আমাকে সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। ওঁদের যাতায়াতের ভাড়াও দিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতার কোনও কাগজ পাত্তা দেয়নি। শুধু—

দ্রুত বললাম,—দৈনিক সত্যসেবক।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা-ও যাঁর যাওয়ার কথা তিনি যাননি। গিয়েছিলেন একজন ফোটোগ্রাফার। পরমেশদা তাতেই খুশি। ছবি বেরুলে বেশি পাবলিসিটি হবে খবরের চেয়ে।

ষষ্ঠী কফি এনে দিল। বললাম,—কফি খান। আমি যাব চন্দ্রপুরে। তবে কখন যাব, তা বলতে পারছি না।

কফি খেয়ে তারকবাবু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন,—আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমার বাড়িতে থাকবেন।

উনি অনেকক্ষণ ধরে খুব সাধাসাধি করতে থাকলেন। বিরক্ত হয়ে বললাম,—সময়মতো যাব। ভাববেন না।...

দুপুরে জয়ন্তকে ফোন করলাম দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে। ফোন ধরে প্রথমে সে একচোট নিল আমাকে,—আপনার সত্যি ভীমরতি ধরেছে। আপনি এমন একটা সাংঘাতিক রহস্যের কিনারা করলেন না। আর আমার মুখ আপনি দেখতে পাবেন না। ...ইত্যাদি...।

তাকে মিষ্টি কথায় শান্ত করে বললাম,—তোমার বন্ধু প্রচেতের মর্গের রিপোর্ট পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু। ক্ষতচিহ্ন চুলের ভেতর পাওয়া গেছে। হাতুড়ির ঘা বলে সন্দেহ করা হয়েছে।

—ডার্লিং! আজ তোমাদের কাগজে চন্দ্রপুরের খুনোখুনির খবর পড়েছ?

—পড়েছি। মাই গুডনেস! প্রচেত গতকাল চন্দ্রপুরে নিউজ ফোটো আনতে গিয়েছিল। রিপোর্টার অশনির যাওয়ার কথা ছিল। যায়নি।

—অশনি আছে? ওকে ফোন দাও।

—কী ব্যাপার?

—আহা, দাও না ওকে।

একটু পরে অশনি গুপ্তের সাড়া পেলাম,—হ্যালো ওল্ড ডাভ! আমাকে ফাঁসাবেন নাকি?

—না, না। শোনো অশনি। চন্দ্রপুরে পরমেশবাবুর সভার নেমন্তন্ন মিস করলে কেন? তোমাকে তো রাহাখরচ দিয়েছিলেন ওঁর পি. এ. তারকবাবু।

—সর্বনাশ! সর্বনাশ! আপনি সত্যিই দেখছি অন্তর্যামী।

—প্লিজ আনসার মাই কোয়েশ্চন, ডার্লিং!

—আসলে শেষ মুহূর্তে চিফ রিপোর্টার আমাকে অন্য একটা অ্যাসাইনমেন্টে পাঠিয়েছিলেন। এদিকে চন্দ্রপুরে কয়েকটা কল-কারখানা বন্ধের খবর আছে। 'ক্লোজার' নামে একটা ফিচার বেরুবে সত্যসেবক পত্রিকায়। তাই চিফ রিপোর্টার প্রচেতকেই যেতে বলেছিলেন। বন্ধ কলকারখানার ছবি তুলে আনাই ওকে পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য ছিল। আপনি চিফ রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন।

—থাক। তুমি জয়ন্তকে দাও।

জয়ন্ত ফোন ধরে বলল,—বস্! আপনি হঠাৎ ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠলেন যে?

—জয়ন্ত, আমার সঙ্গে চন্দ্রপুর যেতে হবে তোমাকে।

—মাথা খারাপ? আমাকে ইভনিং ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হচ্ছে। সরি কর্নেল!

—আর কিছু ইনফরমেশন পুলিশের কাছে জেনেছ?

—আর কিছু—হ্যাঁ, প্রচেতের ক্যামেরা হারায়নি। কিন্তু ভেতরে ফিল্ম রোলটা নেই। অফিসে বলেছিল, রোলটা শেষ হয়নি।

—ফিল্ম রোল নেই?

—নাহ্। ক্যামেরা খালি। আপনাকে অত করে অনুরোধ করলাম, আপনি গেলেন না। কী মিষ্টি হেলায় হারালেন বুঝুন।

ফোনে কলকাতার সেচ দপ্তরের এক কর্তাব্যক্তিকে বলে চন্দ্রপুরে ওঁদের বাংলো বুক করেছিলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ট্রেনে পৌঁছে সাইকেল রিকশায় বাংলোয় পৌঁছলাম। খুশি হলাম দেখে যে, ট্রাংককলে চৌকিদারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি আসছি। গঙ্গার ধারে একটা খালের মুখে বাংলো। নিসর্গদৃশ্য সুন্দর। চন্দ্রপুরের বসতি এলাকার বাইরে হওয়ায় নিরিবিলি পরিবেশ। জানলা থেকে কিছুক্ষণ বাইনোকুলারে পাখি দেখলাম। গঙ্গার ধারে ঝোপেঝাড়ে প্রজাপতি খুঁজলাম। মোটে দুটো দেখা গেল। তা-ও নিছক সাধারণ প্রজাতির প্রজাপতি।

কফি খেয়ে পায়ে হেঁটে বেরোলাম। চন্দ্রপুরের বাজারে সেই চৌমাথায় পৌঁছেছি, তখনও যথেষ্ট আলো আছে দিনের। ভিড়-ভাট্টা, রকমারি যানবাহন, খুব হই-হট্টগোল।

রাস্তার ওধারে একটা ড্রেন। আবর্জনা আর পচা পাঁক থিকথিক করছে।

আমার স্বভাব হল, সব রহস্যের ক্ষেত্রে একটা থিওরি খাড়া করে নিই। তারপর তথ্য সংগ্রহে পা বাড়াই। তথ্য না পেলে থিওরিটা বাতিল করে আরেকটা থিওরি সাজাই।

আমি একটা জিনিস খুঁজছিলাম ড্রেনে। চমকে উঠে দেখলাম সেটা আছে এঁটো শালপাতার স্তূপের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। পেছন দিকে খেলার মাঠ। সেই মুহূর্তে একটা ফুটবল এসে পড়ল সেখানে। চমৎকার সুযোগ পেলাম কুড়িয়ে নেওয়ার ছেলেগুলো আসার আগেই ফুটবলটা তুলে ছুঁড়ে দিলাম ওদের দিকে। সেই ফাঁকে জিনিসটাও তুলে নিলাম।

জিনিসটা একটা খেলনার রিভলবার। শালপাতায় জড়িয়ে নিলাম। যেন পাশের মাছের বাজার থেকে মাছ কিনেছি।

এবার রিকশা করে বাংলোয় ফিরে টয় রিভলবারটা বেসিনে রগড়ে ধুয়ে ফেললাম। জানতাম, এমন একটা জিনিস ঘটনাস্থলের আশেপাশে পড়ে থাকার কথা ওটা কিটব্যাগে রেখে চৌকিদারকে কফি করতে বললাম। গঙ্গার ধারের লনের চেয়ারে বসে গঙ্গা দেখতে থাকলাম। সূর্যাস্তকালে গঙ্গার জলে শেষ আলোর খেলার কোনও তুলনা হয় না। একটু পরে চৌকিদার কফি আনল।

সে কফির পট পেয়ালাসমেত ট্রেতে বেতের টেবিলের ওপর বিনীতভাবে রাখল! তারপর একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। বললাম,—কিছু বলবে তুমি?

চৌকিদার কাঁচুমাচু হেসে বলল,—না স্যার। কফি কেমন হয়েছে দেখুন। খারাপ হলে আবার তৈরি করব।

চুমুক দিয়ে বললাম,—ফার্স্টক্লাস হয়েছে। তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে মঙ্গল।

—গতকাল নাকি চন্দ্রপুরে একটা খুনোখুনি হয়েছে?

মঙ্গল গল্পটা বলার জন্য ঘাসে বসল। সে ইনিয়েবিনিয়ে পরমেশবাবুর বোকামির কথা শোনাল। তার মতে, অভয় হাজরার দলবল আছে। তিনি ট্রেড ইউনিয়নও করেন। তিনি এখানকার কলকারখানা বন্ধের মূলে। তাঁর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ানো ঠিক হয়নি পরমেশবাবুর। ওঁর বালবের কারখানাও তো বন্ধ করতে বাধ্য করেছেন অভয় হাজরা। আসলে ভোটে জিতে অভয়বাবু মন্ত্রী হবেন সম্ভবত। তারপর সব কারখানা খোলার ব্যবস্থা করবেন। কলকাঠিটা তাঁরই হাতে! তাঁর মতো লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাধ্য কার? পুলিশও তো তাঁর কেনা।

বললাম,—শুনলাম কে এক কিনু পাগলা পরমেশবাবুকে গুলি করেছে?

মঙ্গল খিক-খিক করে হাসল,—এ স্যার পরের হাতে হুঁকো খাওয়া! পাগলা লোক। তাকে বন্দুকপিস্তল দিয়ে যাকে গুলি করতে বলবে, সে তাকেই গুলি করবে। পাগলার কি জ্ঞানবুদ্ধি আছে?

—কিন্তু কিনু পাগলাকেও কে গুলি করে মারল?

মঙ্গল এদিক-ওদিক দেখে চাপা গলায় বলল,—পাগলা মুখ ফসকে যদি বলে ফেলে কে তাকে পিস্তল দিয়েছে, তা-ই তাকেও ভিড়ের হট্টগোলের ফাঁকে মেরে ফেলেছে।

—পিস্তল না রিভলবার?

—ওই হল স্যার! মানুষ মারা কল তো বটেই।

—আচ্ছা মঙ্গল, সভায় তখন নাকি কারা হাঙ্গামা হইচই বাধিয়েছিল। ধরো, কথার কথাই বলছি, সেই সুযোগে কিনুর বদলে কিনুর খুনিই তো পরমেশবাবুকে মারতে পারত। কিনুকে খুন করার দরকারই হতো না।

মঙ্গল একটু ভেবে নিয়ে বলল,—তা ঠিক স্যার! তবে—

সে হঠাৎ চুপ করলে বললাম,—তবে?

মঙ্গল চাপাস্বরে বলল,—ফোটো তুলছিলেন এক ভদ্রলোক। ফোটোতে খুনির ছবি উঠে যেত।

—তুমি ছিলে সভায়?

—ছিলাম স্যার।

—ফোটো তুলতে দেখেছিলে?

হ্যাঁ। বারবার ঝিলিক মেরে ফটো তুলছিলেন। কিন্তু পাগলাকে পিস্তল তুলে গুলি ছুঁড়তেও দেখেছিলাম।

সন্ধ্যায় আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। মঙ্গল আলো জ্বালতে চলে গেল। আমার থিওরির সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। ফোটোতে খুনির ছবি উঠেছে, এই আশঙ্কায় ফোটোগ্রাফার প্রচেতকে ওইভাবে মারতে হয়েছে। তাকে অনুসরণ করে কলকাতা গেছে খুনি। তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। তাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। কিন্তু ক্যামেরা ছিনতাই করলেই তো হতো। কেন ক্যামেরা ছিনতাই করেনি? এদিকে চৌকিদার মঙ্গল কিনু পাগলাকে গুলি ছুঁড়তেও দেখেছি।...

চন্দ্রপুর থানার ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর অরুণ মজুমদার আমার পরিচিত। বাংলো থেকে তাঁকে টেলিফোন করলাম। অরুণবাবু বললেন,—হাই ওল্ড বস! সত্যিই কি আপনি নাকি কোনও—

—ডার্লিং! আমিই বটে।

—হাঃ-হাঃ-হাঃ। দ্যাটস রাইট। ডার্লিং সম্ভাষণ এই সসাগরা পৃথিবীতে একজনের মুখেই মানায়। তা হঠাৎ এখানে আপনি কি নিছক প্রজাপতি ধরতে ছুটে এসেছেন?

—বলতে পার। তবে এখানকার প্রজাপতি বর্ণচোরা।

—কর্নেল! আপনার কথায় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

—রহস্য একটু আছে। তুমি চলে এসো।

মিনিট পনেরো পরে অরুণের জিপের আলোয় সেচবাংলো ঝলসে উঠল। তাকে আসতে দেখে মঙ্গল চৌকিদারের মুখে বিস্ময় ও উদ্বেগ ফুটে উঠল। বললাম,—মঙ্গল। পটভর্তি কফি আনো শিগগির!

লনে বেতের চেয়ারে বসে অরুণ বলল,—বর্ণচোরা প্রজাপতির কথা শুনেই সন্দেহ হল, আপনি সম্ভবত পরমেশ চক্রবর্তীর মৃত্যুর কেস হাতে নিয়েছেন?

—নিয়েছি।

অরুণ একটু হাসল,—কিন্তু পরমেশবাবুকে গুলি করে মেরেছে এক বদ্ধ পাগল। আপনি তো জানেন, পাগল অবস্থায় লোকে খুনখারাপি করে। কাজেই পরমেশবাবুকে খুন করা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। বরং কিনু পাগলাকে ভিড়ের ভেতর কে গুলি করল সেটাই আসল রহস্য।

—তোমার থিওরি কী এ সম্পর্কে?

—খুনি ভিড়ের ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়েছে মঞ্চে পরমেশবাবুকে লক্ষ্য করে। একটা গুলিতে মৃত্যু না হতেও পারে। তাই ভেবে দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়েছে। দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে কিনু পাগলার মাথার পেছনে।

—কিন্তু লোকে কিনু পাগলাকে রিভলবার তুলে গুলি ছুঁড়তে দেখেছে।

অরুণ আবার হাসতে লাগল,—একটা গণ্ডগোল বাধলে লোকেরা তা নিয়ে নানারকম গল্প বানায়। ঘটনার আকস্মিকতায় কী দেখতে কী দেখে।

—কিনুর হাতে রিভলবারটাও তোমরা পেয়েছ, অরুণ।

—ভিড়ের গণ্ডগোলের সুযোগে ওর হাতে খুনি গুঁজে দিয়েছে।

—তোমার এই পয়েন্টটা ঠিক আছে অরুণ!

—কোন পয়েন্টটা ঠিক নেই?

একটু বসো, দেখাচ্ছি—বলে বাংলোর ভেতর গেলাম। কিটব্যাগ থেকে সেই ড্রেনে কুড়িয়ে পাওয়া খেলনা রিভলবারটা এনে অরুণকে দেখালাম।

অরুণ অবাক হয়ে বলল,—এটা তো টয় রিভলবার। কোথায় পেলেন?

বললাম,—যেখানে সভা হয়েছিল, তার কাছে ড্রেনের মধ্যে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম এমন একটা জিনিস কাছাকাছি কোথাও লোকের চোখে পড়ার বাইরে পড়ে থাকবে।

—কী অদ্ভুত। আপনি কি মন্ত্রবলে জানতে পেরেছিলেন, কর্নেল?

হাসতে-হাসতে বললাম,—নাহ্‌ ডার্লিং! সহজ বুদ্ধিতে। আসলে সত্যিকার রিভলবার চালানো কোনও পাগলের সাধ্য নয়। অটোমেটিক রিভলবারের ট্রিগার টানলে গুলি বেরুবে। কিন্তু কোনও পাগলের ট্রিগার টেনে নির্দিষ্ট স্থানে লক্ষ্যভেদ একেবারে অসম্ভব। তা ছাড়া ছটা গুলির মধ্যে তোমরা নাকি দুটো গুলি পেয়েছ রিভলবারে। তাই না?

—হ্যাঁ। চারটে খরচ হয়েছে।

—তা হলে দুটো খরচ হয়েছে গোপনে টার্গেট প্র্যাকটিসে। একটা খরচ হয়েছে পরমেশবাবুকে মারতে। আরেকটা কিনুকে মারতে। কিনু পাগলার মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে মারা হয়েছে।

অরুণ টয় রিভলবারটা দেখতে-দেখতে বলল,—কী আশ্চর্য! এটা ঠিক ওই আসল অস্ত্রটার হুবহু নকল।

—হ্যাঁ, নকল। লোকেরা এই টয় অস্ত্রটায় দেখেছে কিনু পাগলার হাতে। তার মানে, খুনি তাকে এটা দিয়ে বলেছিল, হট্টগোল বাধলে সে যেন এটা তুলে গুলি ছোড়ার ভান করে। পাগলা মানুষ। তাই খুব মজা পেয়েছিল কাজটা করতে। কিন্তু

সে জানত না, এটা একটা বিপজ্জনক ফাঁদ। খুনি তার চেনা। তাই তার মুখ বন্ধ করতে তাকে মারা হয়েছে। পয়েন্টটা তুমি বুঝে দ্যাখো অরুণ। একজন পাগলের গুলিতে পরমেশবাবু মারা পড়তে পারেন, এটা তোমরা সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না। খুঁটিয়ে তদন্ত করবে। তাই ধূর্ত খুনি পাগলকেও মেরেছে।

অরুণ গম্ভীর মুখে বলল,—হ্যাঁ। মেরে ভিড়ের সুযোগে খুনি কিনু পাগলের হাতের টয় রিভলবারটা নিয়ে আসল রিভলবারটা গুঁজে দিয়েছে। টয় রিভলবারটা ড্রেনে ফেলে দিয়েছে।

এবার দৈনিক সত্যসেবকের ফোটোগ্রাফার প্রচেত রায়ের মৃত্যুর ঘটনাটা বললাম অরুণকে। শুনে অরুণ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাকে পরমেশবাবুর পি. এ. তারকবাবুর কথাও বললাম।

মঙ্গল চৌকিদার এতক্ষণে কফি আনল। সে দাঁড়িয়ে কথা শুনবে ভাবছিল হয়তো! অরুণ তাকে ধমক দিয়ে চলে যেতে বলল। সে উদ্বিগ্ন মুখে বাংলোর কিচেনে চলে গেল।

অরুণ বলল,—আর্মেনিয়ান গির্জা আমি দেখেছি। পাশে একটা কবরখানা আছে। ওখানে প্রচেতবাবু অত রাত্রে গেলেন কেন?

—খুনি তার চেনা। খুনি তাকে কোনও অজুহাত দেখিয়ে ওই নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া কোনও ব্যাখ্যা হয় না। কারণ অচেনা লোকের সঙ্গে প্রচেত ওখানে যাবে কেন? তাছাড়া চেনা বলেই প্রচেতের ক্যামেরা ছিনতাই করতে পারেনি খুনি।

—তার মানে, খুনি চন্দ্রপুর থেকে প্রচেতবাবুর সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল।

—দ্যাটস রাইট ডার্লিং।

অরুণ কিছুক্ষণ কফিপানের পর বলল,—হাতুড়ি দিয়ে মেরে খুন করেছে প্রচেতবাবুকে?

—হ্যাঁ। সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীকে তো তুমি চেনো। সে তা-ই জানাল। মর্গের রিপোর্টে নাকি বলা হয়েছে।

অরুণ আবার বলল,—হাতুড়ি?

মাথা দোলালাম। বললাম,—কোনও সূত্র খুঁজে পাচ্ছ কী?

পাচ্ছি। —বলে অরুণ উঠে দাড়াল ঃ আমার সঙ্গে বেরুতে আপত্তি আছে?

—নাহ্।

তা হলে আসুন।...

অরুণের জিপ থানাচত্বরে ঢুকল।

অফিসার-ইন-চার্জ পুলকেশ দে-র সঙ্গে অরুণ আমার পরিচয় করিয়ে দিল। পুলকেশবাবু গোগ্রাসে এবং বিস্ময়ে বললেন,—আপনার মতো প্রখ্যাত মানুষের পায়ের ধুলো পড়বে এখানে, কল্পনাও করিনি কর্নেলসায়েব। আশা করি, পরমেশবাবুর হত্যারহস্য সমাধানে আপনার আগমন? তা যদি হয়, আপনার সঙ্গে সহযোগিতায় আমরা তৈরি।

অরুণ বলল,—মিঃ দে! আজ সকালে আমার সামনে বস্তির এক বুড়িমা একটা ডায়রি করতে এসেছিল। তাকে কোন দজ্জাল গিন্নি নাকি ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে?

পুলকেশবাবু হাসলেন,—সামান্য একটা কয়লাভাঙা হাতুড়ি হারিয়ে গণ্ডগোল। তো এই তুচ্ছ ব্যাপারে ডায়রি কী হবে? গিন্নি মহিলাকে ডেকে পাঠিয়ে একটু বকাবকি করলাম। মহিলা বললেন,—ভুল হয়েছে। মিটমাট করে দিন। বরং পঞ্চাশ টাকা ওর মাইনে। তা-ই দিচ্ছি। আমি টাকাটা দিয়ে বুড়িকে দিলাম। মিটে গেল। কিন্তু কেন—

অরুণ বলল,—কারণ আছে। গিন্নি মহিলার নাম কী?

ডায়রি বইয়ের পাতা উলটে দেখে পুলকেশবাবু বললেন,—সুপ্রভা রায়। স্টেশনের কাছে তিলেপাড়ায় বাড়ি। স্বামীর নাম—

আমি বললাম,—তারক রায় কি?

পুলকেশবাবু অবাক হয়ে বললেন,—হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

বললাম,—এখনই তারক রায়কে পরমেশবাবু এবং কিনু পাগলাকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করুন। তারপর গ্রেফতার করুন অভয় হাজরাকে। তাঁর প্ররোচনায় এই হত্যাকাণ্ড।

অরুণ উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

বলল,—পরমেশবাবুর কারখানা বন্ধ হওয়ায় তারক রায় ঠিকমতো মাইনে পাচ্ছিলেন না শুনেছি। পরমেশবাবু জনপ্রিয় লোক। অভয় হাজরাই তাঁর কারখানা বন্ধের জন্য দায়ী। তাই মরিয়া হয়ে তাঁকে টিট করতে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। বোঝা যাচ্ছে, অভয় হাজরার টাকা খেয়ে তারক রায় এই খুনখারাপি করেছেন।

অরুণ একদঙ্গল পুলিশ নিয়ে বেরিয়ে গেল। পুলকেশবাবু পুরো ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। সবই বললাম। শোনার পর উনি হাসতে-হাসতে বললেন,—কিন্তু অমন ধূর্ত তারকবাবু আপনার কাছে গিয়েই ধরা পড়ছেন। যেচে বিপদ ডাকতে গেলেন কেন বলুন তো?

চুরুট ধরিয়ে বললাম,—একটা সহজ কারণ পুলকেশবাবু। তারকবাবু ভালোমানুষ সাজতে চেয়েছিলেন এবং সেই সুযোগে আমাকে দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন, এ ব্যাপারে দৈবাৎ তাঁর ধরা পড়ার মতো কোনও সূত্র থেকে গেছে কিনা। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমি তাঁর বাড়িতে উঠি। তিনি তাহলে আমার সঙ্গে থেকে সূত্রগুলো জানতে পারবেন এবং সেগুলো ম্যানেজ করবেন। কিন্তু আমি তাঁর ফাঁদে পড়িনি। তাঁকে জানাইনি কবে আমি আসছি বা কোথায় উঠছি।

—কিন্তু ওঁকে দেখে আপনার সন্দেহ হয়েছিল কেন?

—যে একজন রহস্যভেদীর সাহায্য নিতে এসেছে, সে তাকে নিজের বাড়িতে ওঠার জন্য সাধবে কেন? তাতে তো প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যাবে। তাই তারকবাবু নিজের বাড়িতে আমাকে ওঠার জন্য বারবার সাধাসাধি করায় আমার সন্দেহ হয়েছিল, ভদ্রলোকের কোনও অন্য উদ্দেশ্য আছে।

পুলকেশবাবু বললেন,—আপনি সত্যি অনন্যসাধারণ।

কর্নেলের জার্নাল থেকে—২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে উত্তর প্রদেশের আজমগড় এলাকায় একরকম অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছিল। এই রোগের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অট্টহাস'। কোনও কারণ ঘটেনি, অথচ লোকে আচমকা হা-হা করে বিকট হাসতে শুরু করত এবং হাসির চোটে কিছুক্ষণের মধ্যে দম ফেটে মারা পড়ত।

বীভৎস রোগ বলা যায়। ভারতে তখনও ব্রিটিশ রাজত্ব। বাঘা-বাঘা বিলিতি ডাক্তারের একটা দল গিয়ে এই রোগের কারণ আবিষ্কার করতে পারেননি। কোনও রোগীকে বাঁচানো তো দূরের কথা। ওই সময় আমি সামরিক দফতর থেকে ছাঁটাই হয়েছি। যুদ্ধ থেমে আসছে। তরুণ বয়সে বেকার হয়ে বসে থাকতে মন চাইছিল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন চুঁড়ে দরখাস্ত করে যাচ্ছিলাম একনাগাড়ে। অবশেষে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। কিন্তু চাকরিটা পেলাম সেই আজমগড়ে। অর্থাৎ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

বন্ধু ও হিতৈষীরা নিষেধ করলেন। অট্টহাস রোগের ভয় দেখালেন। কিন্তু আমি কারুর কথায় কান দিলাম না। কারণ চাকরিটা ছিল আমার পক্ষে ভারি লোভনীয়। আজমগড় তখন দেশিয় রাজার স্টেট। বন, পাহাড় এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। আমার চাকরি মহারাজার গেম ওয়ার্ডেনের। মহারাজার একটি সংরক্ষিত জঙ্গল ছিল। সেখানে প্রচুর শিকারের প্রাণীর সমাবেশ। মহারাজা মাঝে-মাঝে শিকারে যেতেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। কখনও লাট-বড়লাটের শিকারের খেয়াল হতো। তাঁদেরও নিয়ে যেতেন মহারাজা প্রতাপ সিং বাহাদুর। আমার কাজ হল ওঁদের শিকারের ব্যবস্থা করা। সেইসঙ্গে এই সংরক্ষিত জঙ্গলে চোরা শিকারিরা যাতে ঢুকে জীবজন্তু না মারতে পারে, সেদিকেও কড়া নজর রাখতে হতো।

অট্টাহাস রোগ যখন শুধু মানুষকেই ধরছে, তখন মানুষের বসতির বাইরে ঘোর জঙ্গলে থাকাটা নিরাপদ ভেবেই ওই চাকরি নিতে দ্বিধা করিনি। আজমগড় শহর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে ধারি নামে সুন্দর একটা পাহাড়ি নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতরে আমার ডেরা হল। ডেরাও ভারি রোমাঞ্চকর। কাছাকাছি কয়েকটা গাছের প্রকাণ্ড সব ডালের ওপর মাটি থেকে অন্তত বিশ ফুট ওপরে একটা সবুজ রঙের কাঠের বাড়ি। দূর থেকে চোখে পড়া কঠিন ছিল। বাড়িটার ছাউনিও সবুজ রঙের করোগেট শিটের। একটু হাওয়া দিলে কিংবা বৃষ্টি হলে ভীষণ শব্দ হতো, এটাই যা বিরক্তিকর। কিন্তু ক্রমশ সেটা কানে সয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে তিনটে ঘর। একটা ড্রয়িংরুমে—মহারাজা কিংবা তাঁর অতিথি শিকারিরা এলে ওখানেই বসতেন। অন্যটা আমার বেডরুম। বাকিটা কিচেন। সে ঘরে আমার ভৃত্য ও রাঁধুনি মুহব্বত খাঁ থাকত।

॥ দুই ॥

তখন মার্চ মাস। জঙ্গলে বসন্ত এসেছে। কত রকমের বুনো ফুল ফুটেছে। সারাক্ষণ মিঠে গন্ধে জঙ্গল মউ-মউ করে। কাঁধে রাইফেল নিয়ে জঙ্গলের ভেতর চক্কর দিতে বেরোই সকাল-বিকেল দুদফা। জনাচার ফরেস্টগার্ডও ছিল। তারা পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকায় চার সীমানায় ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে চার জায়গায় থাকত। সেই ঘরগুলোও ছিল গাছের মাথায়। চোরাশিকারি দেখলে বা কিছু ঘটলে গার্ডের হুইসল বাজানোর নিয়ম ছিল। উঁচুতে হুইসল বাজালে তার তীক্ষ্ণ শিস আরেকজন শুনতে পেত। আমিও পেতাম। তখন আমার কুকুর জিমকে নিয়ে ছুটে যেতাম।

দিন পনেরো কেটে গেল। তারপর একদিন জঙ্গলের ভেতর এলোমেলো ঘুরতে-ঘুরতে ডেরায় ফিরছি, হঠাৎ কার বিকট হাসি শুনে চমকে উঠলাম। প্রথমে ভাবলাম হায়েনার ডাক। কিন্তু দিনদুপুরে হায়েনা ডাকে না। তাছাড়া হা-হা-হা-হা বিকট শব্দটা থামছে না।

শব্দ লক্ষ করে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগুতে পোশাক প্রায় ফর্দাফাঁই হবার উপক্রম। আমার প্রিয় কুকুর জিম আমার আগে-আগে যাচ্ছিল। শব্দটা থেমে গেল একটা আঁ-আঁ-আঁ আর্ত চিৎকারে। অমনি অমন সাহসী মারমুখী কুকুরটাও ভয় পেয়ে আমার দুপায়ের ফাঁকে এসে লেজ গুটিয়ে ফেলল।

তাকে ধমক দিয়েও নড়ানো যাচ্ছিল না। অগত্যা আমি পা বাড়ালাম। জিম তখন আমার পেছন-পেছন কাঁচুমাচু মুখে হাঁটতে থাকল। উঁচু গাছের একটা জটলা, তার পাশে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির মতো ন্যাড়া পাথর। সেই পাথরের নিচে ছায়ার ভেতর কী একটা পড়ে থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম।

একজন আদিবাসী চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তার হাতের পাশে একটা দিশি গাদা বন্দুক। নিশ্চয় লুকিয়ে জঙ্গলে হরিণ মারতে এসেছিল। তার মুখ থেকে গলগল করে তখনও রক্ত বেরুচ্ছে। দেখামাত্র মনে পড়ে গেল অট্টহাসের কথা। ভয়ে সারা শরীর শিউরে উঠল। তাহলে এই লোকটি জঙ্গলের ভেতর এসেও সেই মারাত্মক রোগ থেকে রেহাই পায়নি দেখছি।

হুইসল বাজিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন গার্ড এল। সে ব্যাপারটা দেখে চমকে উঠে বলল, 'সর্বনাশ—এ যে দেখছি কাঠুয়াগড়ের সেই রঙ্গলাল! গতমাসে এর দাদা আজিরলালও এভাবে মারা পড়েছে।'

বললাম, 'জঙ্গলের ভেতর নাকি?'

গার্ড বুধ সিং গম্ভীর মুখে বলল, 'না স্যার। ওদের বস্তিতে। যাই হোক, এখানে আর থাকা উচিত নয়। চলুন।'

'মড়াটার কী হবে?'

'জানোয়ারে খেয়ে ফেলবে। আর কী হবে?'

বুধ সিংয়ের নির্বিকার মনোভাব খারাপ লাগল। বললাম, 'তুমি বরং ওদের বাড়িতে খবর দিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ পাহারায় থাকছি। একজন মানুষ তো বটে!'

বুধ সিং যেন পলায়নের তালে ছিল। সে গোমড়া মুখে বলল, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু আপনি আর এখানে থাকবেন না স্যার। এ বড় ভয়ংকর রোগ। কিছু বলা যায় না।'

বলে সে লম্বা পা ফেলে হন-হন করে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। বললাম, 'কী হল, বুধ সিং?'

বুধ সিংয়ের চেহারা দেখে একটু অবাক হলাম। ওখানে ফাঁকা জায়গা বলে যথেষ্ট রোদ পড়েছে। তার মুখের রঙটা হঠাৎ কেমন যেন লাল দেখাচ্ছে। তার চোখ দুটো বড় হয়ে যাচ্ছে। তারপর মনে হল, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। চেঁচিয়ে ফের বললাম, 'কী হল বুধ সিং?'

অমনি বুধ সিং নিঝুম জঙ্গল কাঁপিয়ে হা-হা-হা-হা করে বিকট হেসে উঠল। তার হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল, তারপর দুহাত শূন্যে তুলে সে ভয়ংকর অট্টহাসি হাসতে-হাসতে ধপাস করে পড়ে গেল। সে সমানে হাসছিল আর গড়াগড়ি খাচ্ছিল ঘাসের ওপর। তারপর তার মুখে রক্ত দেখতে পেলাম!

এই বীভৎস দৃশ্য দেখার পর আর স্থির থাকতে পারলাম না। এবার আমার অট্টহাসের পালা ভেবে পড়ি কী মরি করে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটতে শুরু করলাম। জিমের কথা ভুলে গেলাম যেন। ধারি নদীর ধারে আমার ডেরায় পৌঁছে জিমের খোঁজ করলাম। দেখলাম সে আমার আগেই পৌঁছে গেছে। কুটিরের তলার আগাছা থেকে বেরিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। তাকে আদর করে মুহব্বত খাঁকে ডাকলাম সিঁড়ি নামিয়ে দিতে। কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না। বারকতক ডেকে অবাক হয়ে কুটিরের চারদিকে ঘুরে তাকে খুঁজলাম। বিশ ফুট উঁচুতে কুটির। দরজা-জানলা খোলা। অথচ মুহব্বতের পাত্তা নেই। নদীতে স্নান করতে গেলে তো কাঠের সিঁড়িটা নামানো থাকত। আশংকায় গা ছমছম করছিল। সাহস করে আরও কয়েকবার ডাকলাম। কিন্তু তবু কোনও সাড়া পেলাম না। তাই হুইসল বাজাতে শুরু করলাম। এই হুইসলগুলো মহারাজা বিদেশ থেকে বিশেষভাবে তৈরি করে আনিয়েছিলেন। এতে ফুঁ দিলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে-হতে বহু দূর অবধি শোনা যায়। প্রয়োজনে এর ক্ষমতা টের পেয়েছি। এদিকে বাকি তিনজন গার্ডের একজনেরও সাড়া মিলল না।

কুটিরে ওঠা অসম্ভব হতো না আমার পক্ষে। কিন্তু আর সে চেষ্টা না করে জিমকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধারি পেরিয়ে ছুটে চললাম আজমগড়ের উদ্দেশে। পাকা রাস্তায় কোনও মোটর গাড়ি পেয়ে যাব...।

॥ তিন ॥

হ্যাঁ, মুহব্বত খাঁও অট্টহাস রোগে মারা পড়েছিল। শুধু তাই নয়, একই দিনে বাকি তিনজন ফরেস্টগার্ডেরও একই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছিল। এরপর জঙ্গলে গিয়ে থাকার সাহস ছিল না। মহারাজা প্রতাপ সিং বাহাদুর বলেছিলেন, 'আমার জঙ্গলের প্রাণীদের চেয়ে মানুষের প্রাণ আমি বেশি মূল্যবান মনে করি। আপনি কিছুদিন প্রাসাদে বিশ্রাম করুন। অবস্থা বুঝে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।' বিশ্রাম করা আমার ধাতে নেই। প্রাসাদের বিশাল চিড়িয়াখানার তদারকিতে মন দিয়েছিলাম। কিন্তু খোঁজ রাখতাম, জঙ্গল এলাকায় আর কেউ মারা পড়েছে কি না। এদিকে মহারাজা আবার ইউরোপের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, যদি কোনও বিশেষজ্ঞ অট্টহাস রোগের কারণ আবিষ্কার ও প্রতিকার করতে পারেন, তাঁকে মোট টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

আমি ডাক্তারি পড়িনি। রোগ বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে একটা তীব্র জেদ কাজ করছিল। তাছাড়া একটা আশ্চর্য ব্যাপার আমার মাথায় এসেছিল। আদিবাসী চোরাশিকারি রঙ্গলালের অট্টহাসে মৃত্যু দেখে ফরেস্টগার্ড বুধ সিং আক্রান্ত হল সঙ্গে-সঙ্গে। অথচ আমার কোনও কিছু হল না? এমনকী মুহব্বত খাঁ এবং আমি একই সঙ্গে থেকেছি। মুহব্বত খাঁ আক্রান্ত হল, আমি হলাম না। এ কি আমার শরীরের বিশেষ ক্ষমতায়? কী ক্ষমতা? বুধ সিং আমার চেয়ে স্বাস্থ্যবান জোয়ান ছিল।

অট্টহাসে যেখানে-যেখানে প্রথমে লোক মারা পড়েছে, সেখানে গিয়ে খোঁজখবর শুরু করলাম। তখনও কোনও-কোনও গ্রামে একটা করে লোক মারা পড়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তাদের মারা পড়তে যারা দেখেছে বা দেখছে, তাদের কিন্তু কিছু হচ্ছে না। কেন?

হাতিপুরা বলে একটা গাঁয়ে সর্বশেষ যে লোকটি অট্টহাসে মারা গেল, তার বাড়ি হাজির হলাম। তার বউকে অনেক জিগ্যেস করে পয়সাকড়ি সাহায্যের লোভ দেখিয়ে একটা মূল্যবান সূত্র বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, এটাই আমার সন্দেহ হয়েছিল। লোকটা ছিল ওই জঙ্গলের নিয়মিত চোরাশিকারি। এরপর অন্তত গোটাদশেক অট্টহাসে মৃত্যুর পুরনো কেস তদন্ত করে একই সূত্র মিলে গেল। কেউ ছিল চোরাশিকারি, কেউ জঙ্গলে গিয়েছিল কাঠ ভাঙতে বা গরু চরাতে। তাহলে কি ওই জঙ্গলেই অট্টহাসের বীজাণু আছে?

কিন্তু তাহলে আমি রেহাই পেলাম কেন?

মহারাজার কাছে ফের জঙ্গলে গিয়ে থাকার অনুমতি চাইলাম। উনি আঁতকে উঠে বললেন, 'না না। জঙ্গল ফতুর হয়ে যাক। আমার ওই শখে আর কাজ নেই। আপনি যা করছেন, তাই করুন।' অগত্যা একদিন গোপনে জিমকে নিয়ে মহারাজার অগোচরে জঙ্গলের দিকে পাড়ি জমালাম।

॥ চার ॥

ফরেস্টগার্ড চতুষ্টয়, আজীরলাল এবং মুহব্বত খাঁয়ের জঙ্গলে অট্টহাসে মৃত্যু হওয়ায় ওদিকে কোনও মানুষ আর ভুলেও পা বাড়াবে না জানতাম। কাঠের কুটিরের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনি আছে দেখলাম। দুপুর পর্যন্ত বেশ কয়েক মাইল চক্কর দিয়ে এলাম। বিকেলে ধারি নদীর ধারে ঘোরাঘুরি করলাম। অনেক ভাবলাম। কোনও খেই পেলাম না।

এ রাতে জ্যোৎস্না ছিল। জঙ্গলে মাঝে-মাঝে বন্য প্রাণীর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। রাতচরা পাখি ডাকছিল। সারাক্ষণ উত্তাল বাতাসের শব্দও ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিমের গর-গর গর্জনে। উঠে দেখি, জিম জানলার তারের জালিতে মুখ ঘষে নিচে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। জানলা আস্তে খুলে নিচে একটু তাকাতে খোলামেলা জায়গায় কালো একটা মূর্তির নড়াচড়া চোখে পড়ল। চোরাশিকারি না কি? যেই হোক, সাহস তো কম নয়।

টর্চ ও রাইফেল নিয়ে চুপি-চুপি বেরুলাম। জিমকে ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম, তাকে চুপ করে থাকতে হবে। কাঠের সিঁড়ি ছায়ার ভেতর নিঃশব্দে নামিয়ে নেমে গেলাম দুজনে। তলায় প্রচুর ঘাস আর আগাছা। ঘন ছায়ায় একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম ছায়ামূর্তিটা মুখ তুলে কুটির দেখছে। একটু পরে সে ওপাশের গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল। তারপর গেছো জন্তুর দক্ষতায় ডাল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে কুটিরের দেয়াল আঁকড়ে ধরল। ওদিকে তারের জালঘেরা বারান্দা আছে। চাপা ঘষ-ঘষ শব্দ শুনতে পেলাম। সে কি তারের জালটা কাটছে?

ইচ্ছে করলে তো সে পরিত্যক্ত নির্জন কুটিরে এতদিন ঢুকতে পারত। এখন যখন ঢুকছে, তখন তার লক্ষ আমি ছাড়া আর কী হতে পারে?

জিমকে ইশারায় চুপ থাকতে বলে পা টিপেটিপে উলটো দিকে সিঁড়িতে চলে গেলাম। ওপরে উঠে টের পেলাম শ্রীমান ছায়ামূর্তি কিচেনের দিকে বারান্দায় সমানে ঘষ-ঘষ চাপা শব্দ তুলে তারের জাল কেটে চলেছে। কিচেনে নিঃশব্দে ঢুকে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।

জাল কাটা হলে সে বারান্দায় উঠল। তারপর ওপাশ ঘুরে ড্রয়িংরুমের দরজার সামনে দাঁড়াল। ওই দরজা দিয়ে আমরা দুটিতে সদ্য ঢুকেছি। খোলাই আছে। বন্ধ করার কথা খেয়াল করিনি। একটু ইতস্তত করে সে ভেতরে যেই ঢুকেছে, অমনি কিচেনের দরজা থেকে আমি টর্চ জ্বেলেছি এবং জিমও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সে এক বীভৎস কদাকার প্রাণী। কতকটা মানুষের মতো দেখতে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীর। সারা গায়ে লোম। একমাথা জটাপাকানো চুল। একরাশ জঙ্গুলে দাড়ি-গোঁফ। বিকট দুর্গন্ধ টের পেলাম এতক্ষণে।

কিন্তু তার গায়ে অসুরের মতো জোর। জিমকে দুহাতে ধরে দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। জিমের আর্তনাদে বুঝলাম মারাত্মক আঘাত পেয়েছে। আমি রাইফেল বাগিয়ে গুলি করলাম। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সেই মুহূর্তে সম্ভবত গুলির প্রচণ্ড শব্দে ভয় পেয়ে ভয়ংকর প্রাণীটা এক লাফে বেরুল এবং যে পথে এসেছিল সেই পথেই চলে গেল। দৌড়ে গিয়ে তাকে আর খুঁজে পেলাম না। নিচে ধপাস করে একটা শব্দ হল বটে, তাকে দেখতেই পেলাম না।

এখন আহত জিমের শুশ্রুষা জরুরি। তার দিকেই মন দিলাম।

॥ পাঁচ ॥

সকালে ড্রইংরুমের ভেতর এক টুকরো মধুভরা মৌচাক আবিষ্কার করে অবাক হয়েছিলাম। ওই প্রাণীটিই কী এই মৌচাক নিয়ে হানা দিয়েছিল?

ভাগ্যিস, মৌচাকটুকু থেকে মধু নিঙড়ে খাওয়ার লোভ করিনি। তাহলে এই গল্প বলার জন্য বেঁচে থাকতাম না।

কিন্তু মৌচাক উপহারের উদ্দেশ্য কী? মেঝের দিকে তাকিয়ে সেইকথা ভাবছি, সেই সময় ধারি নদীর ওদিকে জিমের শব্দ শুনলাম। বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, মহারাজা দুজন সাহেব সঙ্গে নিয়ে আসছেন। তক্ষুনি নেমে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করলাম। মহারাজা আলাপ করিয়ে দিলেন। অস্ট্রিয়ার প্রখ্যাত জীবাণু বিশেষজ্ঞ হ্যারিস বার্ডনট এবং তাঁর এক শিকারি বন্ধু ফ্রাঙ্ক জিওট্রাস। ফ্রাঙ্ক প্রাণীতত্ত্ববিদও। আমি এভাবে ফের এসেছি বলে মহারাজা একটু ভর্ৎসনা করলেন আমাকে।

হ্যারিস মৌচাকটা দেখেই চমকে উঠেছিলেন। বললেন, 'সর্বনাশ? এত এক মারাত্মক বিষাক্ত মৌমাছির মধু। অবশ্য সব মৌমাছিই বিষাক্ত! কিন্তু এ জাতের মৌমাছির মধুও বিষাক্ত। এরা আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করে। এদেশে এল কীভাবে?'

মহারাজা হাঁ করে শুনছিলেন। বললেন 'আফ্রিকার মৌমাছি? তাহলে কী...'

ওঁকে চুপ করতে দেখে বললাম, 'কী মহারাজা বাহাদুর?'

মহারাজা গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার পিসতুতো ভাই দুর্জয় সিং আফ্রিকায় ছিল। মাস ছয়েক হল সে ফিরেছে। আমার সঙ্গে তার শত্রুর সম্পর্ক। কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া সে একজন ডাক্তারও বটে।'

বললাম, 'একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে। দুর্জয় সিং এ জঙ্গলে কাউকেও ঢুকতে দিতে চান না।'

মহারাজা বললেন, 'ঠিক, ঠিক, তাই বটে। কিন্তু কেন? আমার জঙ্গলে তার এরকম খবরদারির কারণ তো বোঝা যায় না।'

ফ্রাঙ্ক বললেন, 'মৌচাক ফেলতে এসেছিল যে প্রাণীটি, বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, এ একজাতের আফ্রিকান বাঁদর। গরিলা ও বেবুনের মাঝামাঝি প্রজাতির প্রাণী। মানুষের মতো উঁচু। গড়নও সেরকম। দুপায়ে হাঁটতে পারে। কোনও কাজ শেখালে করতে পারে। আফ্রিকায় তাদের বলা হয় জুমোজুমো।

সেবেলা আমরা ফরেস্টগার্ডদের কুটির খুঁজে একটা করে শুকনো মৌচাক পেলাম। রঙ্গলালের মৃত্যু হয়েছিল যেখানে, সেখানেও একটুকরো পেলাম। মুহব্বত খাঁ যে মৌচাকটার মধু খেয়েছিল, সেটা আবিষ্কৃত হল কিচেনের আবর্জনার ঝুড়িতে।

অট্টহাস রোগের কারণ খুঁজে পাওয়া গেল তাহলে। কিন্তু দুর্জয় সিং কেন কাউকে জঙ্গলে থাকতে দিতে চান না?

সেদিনই রাতে মহারাজা খবর পাঠিয়ে একশ জন সশস্ত্র সেপাই আনালেন জঙ্গলে। নিজেও সঙ্গে রইলেন। হ্যারিস, ফ্রাঙ্ক ও আমি একদলে রইলাম। সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে রইল বাহিনী। জুমোজুমো নামে প্রাণীটি দেখামাত্র গুলি করা হবে।

তখন রাত প্রায় একটা। ফ্রাঙ্ক, আমি এবং হ্যারিস একটা টিলার ধারে বিরাট পাথরের আড়ালে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি, হঠাৎ সামনে টিলার গায়ে একখানা আলো জ্বলে উঠল। আলো লক্ষ করে পাথরের পেছনে গুঁড়ি মেরে তিনজন এগিয়ে গেলাম। একটু পরে খস-খস মাটি কোপানোর শব্দ কানে এল। আলোর কাছেই শব্দটা হচ্ছে। কাছাকাছি গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, একটা লোক লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই বিকট প্রাণী জুমোজুমো প্রকাণ্ড কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে! আমরা ওত পেতে বসে তাদের এই অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগলাম।

জুমোজুমো ক্রমাগত মাটি খুঁড়ছে। লোকটি চাপা গলায় তাকে কী নির্দেশ দিচ্ছে। একসময় আর আমি উত্তেজনা দমন করতে পারলাম না। একলাফে বেরিয়ে রাইফেল বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হ্যান্ডস আপ।'

ফ্রাঙ্ক এবং হ্যারিস সম্ভবত আমার কাণ্ড দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরাও বেরিয়ে এলেন রাইফেল তাক করে।

লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে আলো নিবিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে। ঘন অন্ধকারে কয়েক সেকেন্ড কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর ফ্রাঙ্ক ও হ্যারিসের টর্চ জ্বলে উঠল। জুমোজুমোকে দেখলাম ডিগবাজি খেয়ে পড়েছে। গুলি ছুঁড়লাম। প্রাণীটি গর্জন করে টিলার গা বেয়ে গড়াতে-গড়াতে নিচের দিকে চলে গেল।

হ্যারিস লোকটার বুকে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে বলল, 'নড়লেই মারা পড়বে!'

টিলার নিচের দিকে সেইসময় মহারাজার সেপাইদের হইহই শোনা গেল।

তারা প্রাণীটাকে দেখতে পেয়েছে। মুহুর্মুহু গুলির শব্দ আর চিৎকার চেঁচামেচিতে রাতের জঙ্গলে হুলুস্থুল হচ্ছিল। তারপর মশাল জ্বলতেও দেখলাম।

লোকটার হাত থেকে লণ্ঠন কেড়ে নিয়ে ফ্রাঙ্ক জ্বেলে দিলেন। বেশ লম্বা চওড়া লোক সে। পরনে বুশশার্ট আর ব্রিচেস। মাথায় ঘন চুল, কোমরে বাঁধা বেল্টে রিভলবার ঝুলছে চামড়ার খাপে। বললাম, 'আপনি কি মহারাজা বাহাদুরের ভাই দুর্জয় সিং?'

সে কোনও জবাব দিল না। কিন্তু পেছন থেকে মহারাজার সাড়া পাওয়া গেল। 'হ্যাঁ—ওর নামই দুর্জয় সিং। ওকে ছাড়বেন না। সারাজীবন আমাকে ও বিপদে ফেলতে চেয়েছে। তাছাড়া ওর নামে ব্রিটিশ সরকার হুলিয়া করেছেন। ওকে কালেক্টরের হাতে তুলে দিতে হবে।

দুর্জয় সিং মহারাজার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'তার আগে আমি সবার কাছে তোমার কীর্তি ফাঁস করে দেব।'

মহারাজা বাঁকা হেঁসে বললেন, 'কীর্তি ফাঁস কববে? কেউ বিশ্বাস করবে না।'

দুর্জয় সিং বললেন, 'দাদামশাই বেঁচে নেই তাই। তবে তাঁর উইল আছে ব্রিটিশ সরকারের কাছে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, বজ্রকান্ত মণি আমাকেই দিয়ে গেছেন। অথচ তুমি তা লুকিয়ে রেখে আমাকে বঞ্চনা করেছ।'

আমরা অবাক হয়ে শুনছিলাম। মহারাজা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে হাসতে-হাসতে বললেন, 'তাই উদ্ধার করার জন্য কী এখানে মাটি খুঁড়েছিলে দুর্জয়?'

দুর্জয় সিং বললেন, 'আমি জানি তুমি বজ্রকান্ত মণি এই জঙ্গলের ভেতর এনে লুকিয়ে রেখেছ। আমার ভয়ে আজমগড় প্রাসাদে রাখতেও সাহস পাওনি।' মহারাজা প্রতাপ সিং হুইসল বাজালেন। কয়েকজন দেহরক্ষী হন্তদন্ত দৌড়ে এল! তারা নিচে অপেক্ষা করছিল সম্ভবত। মহারাজা হুকুম দিলেন, 'একে বেঁধে নিয়ে এসো তোমরা। এখনই আজমগড়ে ফিরে যেতে হবে!'...

॥ ছয় ॥

পরে সব কথা জানতে পেরেছিলাম, প্রতাপ সিং আর তাঁর পিসতুতো ভাই দুর্জয় সিংয়ের মধ্যে বিবাদ বহু মূল্যবান একটা মণি নিয়ে। দুর্জয় সিং কোনও বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছিলেন, মহারাজা তাঁর সংরক্ষিত জঙ্গলের ভেতর একটা টিলায় বিশেষ চিহ্নিত স্থানে সেই মণি লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু জঙ্গলে এসে দুর্জয় সিংয়ের তা খোঁজাখুঁজি করায় বাধা ছিল। ফরেস্টগার্ডরা মহারাজার হুকুমে সবসময় নজর রেখে ঘুরত। তার ওপর আমাকে গেম ওয়ার্ডেনের চাকরি দিয়ে জঙ্গলে পাঠানো হল—যাতে আমিও নজর রাখি কেউ জঙ্গলে যেন ঢুকতে না পারে। দুর্জয় সিং

ইতিমধ্যে গোপনে জঙ্গলে এসে আস্তানা করেছেন। পোষা জুমোজুমো নামে আফ্রিকার প্রাণীটিকে দিয়ে বিষাক্ত মৌচাকের সাহায্যে জঙ্গলরক্ষীদের খতম করতে শুরু করেছেন। আমি এসে পড়ায় আমাকেও একই পদ্ধতিতে খতম করতে চেয়েছিলেন। কারণ জঙ্গলরক্ষীদের মতো আমারও দুর্জয় সিংকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা ছিল। নির্বিঘ্নে মণি অনুসন্ধানের কাজ করতে পারতেন না। যাইহোক, অট্টহাস রোগের ফাঁস হল এভাবে। দুর্জয় সিংয়ের গোপন আস্তানাও পাহাড়ের গুহায় আমরা আবিষ্কার করলাম।

গুহার ভেতর সার-সার বিষাক্ত মৌমাছির মৌচাক ছিল। গুহার মুখে শুকনো জ্বালানি ঠেসে আগুন ধরিয়ে পাথর চাপা দিলাম। আফ্রিকা থেকে দুর্জয় সিং ওই মৌমাছির একটা চাক এনেছিলেন। ক্রমশ তাদের বংশবৃদ্ধি হয়েছিল। সব পুড়ে মরল। আহত জুমোজুমোকে মৃত অবস্থায় জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল।

আর বজ্রকান্ত মণি? মহারাজা তা আবার গোপনে কোথাও লুকিয়ে ফেলেন। তার হদিশ আমার জানা নেই।